বিক্ষোভ

রাধানাথ

অনন্ত প্রকাশন
৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৭০

প্রকাশক : এইচ, রায়
অনন্ত প্রকাশন
৬৬, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর : এস. জি, এণ্ড কোম্পানী
২৫।৯, ডায়মণ্ডহারবার রোড
কলিকাতা—৮
ফোন নং ৪৫-৮৫৭৭

প্রচ্ছদ : শ্রীদীপ

একথা সমীরও অনেক ভেবেছে।

দীর্ঘ ক'বছর ধরে দেখে আসছে এই দুঃসহ ঘটনাগুলোকে। তার এসব তিকার করার কোন পথ নেই, ক্ষমতা নেই, সে অসহায়, দুর্বল—ভীরু। নইলে র প্রতিবাদ করতো। রাগে, ক্ষোভে ফেটে পড়তো খান্ খান্ হয়ে মানুষটার পর। ওর কণ্ঠনালী টিপে ধরে তিলে তিলে দমবন্ধ করে মারতো।

খুন! খুনই করতো সে। মাঝে মাঝে বলিষ্ঠ লোহা পেটানো হাত দু'টো শক্ত য় ওঠে, মাথার মধ্যে ওঠে অসহ্য যন্ত্রণা। এরই নাম বোধহয় পশুসত্বা। কিন্তু র লেখাপড়া জানা মনটা আবার শান্ত সংযত হয়ে ওঠে। বাধা দেয় তার এই র্বার জ্বালাকরা উন্মাদ চেতনাকে।

সহরে পথঘাটের ভিড় অনেক কমে এসেছে। রোদের তাপ বেড়ে উঠেছে। দিকে কারখানার টিনের লম্বা একটানা শেডে আলো পড়ে সেই জ্বালা আরও বেড়ে ঠেছে। দূরে স্টেশনের দিক থেকে একটা ইঞ্জিনের ক্লান্ত শব্দ ওঠে। অনেকপথ াড়ে এসে ও হাঁপাচ্ছে।

কঠিন ইট-কাঠ আর লোহা-লক্কড়ের জগৎ। পথটা খোয়াওঠা এবড়ো খেবড়ো। াদে ধুঁকছে দু-একটা পথের কুকুর। কোনমতে খুঁটে খেয়ে প্রাণটাকে নিয়ে তবু ঁচে আছে, কিন্তু এমনি জ্বালা ওদের সইতে হয় না। অভাব, বিপদ আর এই ঘাত—এই দুটোই আজ তাদের জীবন থেকে সব সুন্দর আর সত্যকে নিঃশেষে ছে দিয়েছে।

—কি রে সমীর, ডিউটিতে যাস্ নি? শরীর খারাপ?

সমীর বন্ধুদের দিকে চাইল, ওরা যেন হাসছে। ওদের কণ্ঠের ওই সমবেদনার রটুকু তার কাছে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বলেই মনে হয়। ওরা সবাই জানে সমীরের এই ম অপমানের কথা। ওরা আজ হাসে—মুখটিপে হাসে না হয় উপদেশের ছলে ল, 'এমনি যে হবে তা জানতাম'।

কেউ কেউ আড়ালে মন্তব্য করে—খুব যে আপ-টু-ডেট্ হতে চেয়েছিল কিনা? ীর ওদের চেনে। ওরা সমীরকে চিনতে চায় নি। বন্ধু! এই শব্দটার আজ ন অর্থ নেই, সব মানে বিকৃত হয়ে গেছে। শুধু চেনা মুখই আজ বন্ধু কথার াত্র অর্থ, এর বাইরে আর কিছু নেই।

এখনি ওরা গিয়ে ফোরম্যানকে লাগাতেও পারে সমীর সিক্ করেছে, কাজে সেনি; ওকে দেখলাম রাস্তায় ঘুরতে। ওরা কি করে জানবে সমীরের মনের

জ্বালা, সারা বাড়িটা আজ তার কাছে শূন্য। সবাই যারা টিকে আছে তা
সমীরের বোঝামাত্র, একজন শুধু আঘাত দেবার জন্যই গড়ে উঠছে। তাদের বুকে
রক্ত-জল করা পয়সায় সমীর বড় করে তুলছে আবার তারাও আঘাত দিয়ে পালাবে।

বন্ধুরা চলে গেছে, কথাটা মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে যে যার পথে হারি
গেছে। তার জবাব শোনবার মত ধৈর্য তাদের ছিল না, ছিল না কোন প্রয়োজনও
ও এমনি বাত্‌কি বাত্‌—কথার কথা। বলতে হয় কিছু তাই শুধু বলামাত্র।

এই দিকটায় এখনও নির্জনতা একটু টিকে আছে, মাটিতে মাথা তুলে
সবুজঘাস। দু-একটা কৃষ্ণচূড়া গাছে এসেছে ঘন ফুলের আভরণ। এই রঙ্গী
ফুলের সঙ্গে ওরা সেজে উঠেছে—সামনে গঙ্গা। ঘোলা জলের বুকে এসেছে ভাঁটা
টান। এখানে-ওখানে বের হয়ে পড়েছে ভদ্দর-সাজা মানুষের চকিত সেই সহজা
নোংরামির পরিচয়ের মত ক্লেদাক্ত পলিমাখা পংকিল চর। তাতে দু-একটা ব
লম্বা ঠোঁট ঠুকে পোকা-মাকড়ের সন্ধান করছে জৈবিক তাড়নায়···বার বা
চিন্তাটাকে মাথা থেকে সরাতে পারছে না। কোন ঝড়ের রাতে উদ্বেল মারমুখ
গঙ্গার তুফানে তারা দু'জনে ভাঙ্গা নৌকা থেকে লাফ দিয়ে পড়েছিল···

চারিদিকে নিরন্ধ্র অন্ধকার···দুই তীরের গাছ-গাছালি, কারখানার দীর্
আকাশ ছোঁয়া চিমনিগুলো, ওই ঘরবাড়ি,—বিজলীর চকিত আভাসে ফুটে ও
ক্ষণিকের জন্য।

একটা বিরাট দৈত্য শিকল বাঁধা অবস্থায় কালি ঢালা আকাশের এদিক-ওদি
মত্ত বিক্রমে দাপাদাপি করছে। মাঝে মাঝে ওঠে তার ক্ষুব্ধ গর্জন, তীব্র জ্বালা
চাবুকের মতো বিজলীর রেখাটা সাপটে পড়ে ওই আকাশের গায়ে। ঝলসে ও
রুদ্ররোষের অগ্নিশিখা—সব সৃষ্টিকে যেন পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

তাই ফুসছে নদীর জল।···পথ হারানো ছোট্ট নৌকাটাকে কে তুলে আবার ছিট
ফেলে দিচ্ছে—আছড়ে ওকে চুরমার করে দেবে। কালিঢালা আকাশ থেকে থে
রুদ্ধ গর্জনে ফেটে পড়ছে। নদীর জল যেন লাফিয়ে ওই শূন্যে বন্দী কোন দানব
মুক্তি দেবার চেষ্টা করছে।

প্রচণ্ড একটা আর্তনাদ ওঠে, নৌকার হালের জীর্ণ শিকলটা প্রবল টানে ছিঁ
গেছে একগাছি সুতোর মত। লাটুর মত বোঁ বোঁ করে ঘুরছে নৌকাটা। লোকগুলে
চীৎকার করছে।

চকিত বিদ্যুতের ঝলকে ওই ভীত ত্রস্ত মুখগুলো বিকৃত জানোয়ারের মতো।
নৌকাটা কাৎ হয়ে পড়েছে, জল উঠছে। নদীর ধারে বাস—সমীর ভরা বানে গঙ্গা
পারাপার করেছে বহুবার। তবু আজ কেমন ঘাবড়ে যায়।

প্রাণের একটা নিজস্ব ব্যাকুলতা আছে, সে বাঁচতে চায়। তারই তাগিদে লা
দিয়েছে সমীর ওই ফুলে ওঠা ঝড়ো গঙ্গার বুকে। শরীরের কোষে কোষে একা
দুর্বার সাড়া জাগে।

ঠাণ্ডা হিম জলের বুকে লাফ দিয়ে পড়ে দূরে তীরের দিকে এগোবার চেষ্টা করে। পায়ের কাছে একটা সবল বস্তু, নরম—তখনও উষ্ণ রয়েছে সেটা। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে সে।

—বাঁচাও!

ওর কণ্ঠস্বর জলে রুদ্ধ হয়ে আসে, স্রোতের গতিতে নীচের দিকে নামছে আবার। বিজলীর এক ঝলক আলোয় সমীর দেখে পাশেই তলিয়ে যাচ্ছে একটি মুখ। বয়স কত—দেখতে কেমন, তা অনুভব করার সময় নেই। সমীর হাত বাড়িয়ে ওর জামাটা ধরে ফেলে। ধরেছে একেবারে কলারের কাছেই।

—হাত বাড়াবে না। তাহলে ঠেলে ডুবিয়ে দোব। শুধু ভেসে থাকো চুপ করে।—রাতের অন্ধকারে সেই কথাগুলো নিষ্ঠুর আদেশের মত শোনায়। সমীর ওই স্রোতের সঙ্গে যুঝতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হাঁপাচ্ছে বন্দী জানোয়ারের মতো।

গঙ্গার তীরে দু' একটা আলো জ্বলছে, ঝড়ের তোড়ে অনেকগুলোই তার ছিঁড়ে নিভে গেছে। তবু এগিয়ে এসে সেই অর্ধচেতনাহীন দেহটাকে তীরে তুলল। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত সমীর।

সামনে দুর্বার গাং, মারমুখী গাং। কি রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছে—গর্জাচ্ছে। সেই হিমশীতল উন্মাদ-মৃত্যুর মুখ থেকে সমীর সেদিন তাকে বাঁচিয়ে এনেছে।

—কোথায় যাবে?

সমীর আবছা আলোয় দেখছে ওকে। বয়স তেমন নয়। তরুণই। শীর্ণ চেহারা, শীতে কাঁপছে। বৃষ্টি নেমেছে। জলো হাওয়া ওকে যেন জমিয়ে দেবে। এতক্ষণ যুদ্ধ করে ক্লান্ত ওরা।

ছেলেটি জবাব দেয়—যাবার জায়গা কোথাও নেই।

সমীর বলে—বেশ ডুবছিলে। একেবারে স্বর্গযাত্রা হচ্ছিল। তা এমন মড়াকান্না জুড়েছিলে কেন বাঁচার জন্যে? যত্তো সব…।

ছেলেটি চুপ করে থাকে। সমীরই বলে।

—চলো। বরাতে দুঃখ আছে নইলে এমনি করে স্বর্গবাস ফসকে যায় তোমার। কথা না বলে ছেলেটি উঠল তার সঙ্গে।

খালি হাত পা, জিনিসপত্র কিছু ছিল কিনা কে জানে? থাকলে সে সব মা গঙ্গার গর্ভেই গেছে।

সমীরের ইচ্ছে ছিল বি-এস-সি পাশ করে কলকাতায় পড়তে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হয়ে যা হোক একটা ভালো চাকরি—নয় প্রফেসারীই করবে।

হেডমাস্টার সদানন্দবাবুই তাকে এই কথা বলেছিলেন।—আরও বড় হবি তুই সমীর। জীবনে ফাঁকি কখনও দিস্ না, তুইও ফাঁকে পড়বি না। মন দিয়ে পড়াশোনা কর।

সমীর কথাটা মনে মনে বিশ্বাস করতো। সদানন্দবাবুর মত অনেক মানুষ এখনও আছে। তাই সে স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। ভালোভাবেই পাশ করেছিল তাঁরই চেষ্টায় এবং আগ্রহে।

বাবা পাটকলের সামান্য কেরানী। হরিপদবাবু তবু শত অভাবের মাঝেও ছেলেকে পড়াবার চেষ্টা করেছেন। বিরাট সংসার, ছেলেমেয়ে অনেকগুলি। বড় মেয়ে সুষমার বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে, আরও দুটি মেয়ে প্রতিমা আর নীলিমা, তবু এখনও ছোট। তাদের পার করার কথা আছে। তবে গলায় লেগেছে ওই 'সুষমা'। ছেলেদের মধ্যে বড় ওই সমীরই। কারখানার বড়বাবু গুপী সেন হরিপদবাবুকে ইতিমধ্যে বলেছেন, ছেলেতো ম্যাট্রিক পাশ করেছে, ধরোনা চার্লি সাহেবকে যদি কারখানায় একটা গতি হয়ে যায়। আমিও বলবো সাহেবকে।

হরিপদবাবু চুপ করে থাকেন। নিজে সেকালের ফোর্থ ক্লাস অবধি পড়েছিলেন। তারপর একে-তাকে ধরে পাটকলের খাতাবাবু হ'ন। পাটকলের চাকরির সুখ তিনি নিজে হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। এর পর আর ছেলেকে সেই নরকে আনতে রাজী নন। ওদিকে উইভিং মিলে চাকাগুলো ঘুরছে—বাতাসে ঘূর্ণায়মান বেল্টের শব্দ ওঠে। কয়েকজন মেয়ে মজুর হাসাহাসি করছে বাইরে। ওদের চোখে মুখে কি বীভৎস ছাপ। নিটোল শরীর দুলিয়ে ওদের মধ্যে একজন কি খেউড় গেয়ে চলেছে।

দু' চারজন মজুর এসে যোগ দেয়। সর্দার বিষ্টুচরণ ওদের দেখে চীৎকার করে ওঠে।

—এ্যাই মাগী, তুই কি পচার পাড়া পেয়েছিস যে খদ্দের বসাবি, যা কাজে যা।

হরিপদ জানে এই পরিবেশের কথা। রাতের অন্ধকারে ওই মানুষগুলো বদলে যায়। বিষ্টুচরণকেই দেখেছে বহুদিন ওই পচার পাড়ার বেশ্যাপল্লীতে, ওর চোখের চাহনি তখন আলাদা। পা দুটো মাটিতে থাকে না। এদের অনেকেই এ্যাই।

ওই বড়বাবু গুপী সেন মায় তাঁর-ঘরের উইলিয়াম সাহেব সবাই কোন্ কালো বিচিত্র অন্ধকার জগতের জীব। হরিপদবাবু তাই ছেলেকে জেনে-শুনে এই নরকে আনতে পারবেন না। সমীর সদানন্দবাবুর চেষ্টাতেই কলেজে ফ্রি-শিপ পেয়েছে। দু একটা টুইশ্যানি করে নিজের খরচ চালায়। ক'টা বছর। পাশ করে সমীর একটা ভালো জায়গায় চাকরি পাবে।

জীর্ণ শরীর, হরিপদবাবুর কাজ করবার সামর্থ্য নেই। হাঁপানির টান বাড়ে মাঝে মাঝে। হাপরের মত বুকটা ওঠানামা করে, গলায় ওঠে সাঁই সাঁই শব্দ। মনে হয় দম বন্ধ হয়ে যাবে।

টেবিলে মাথা নামিয়ে চোখ বুজে একটু বল ফিরে পাবার চেষ্টা করে। তবু অফিসে আসতে হয় তাকে। আর ক'টা বছর এমনি করে চালাতেই হবে তাকে।

সুষমার বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। বৈদ্যবাটির মিত্তিরদের বাড়িতে। ছেলেটির বয়স একটু বেশী। দোজপক্ষ। তাহোক তবু এমন কিছু বয়স নয় তার। চাকরি-

বাকিরও করছে। নিজের মাথা গোঁজার একটু আস্তানাও আছে। কথাবার্তা হয়ে গেছে প্রায়।

হরিপদবাবু তার আজীবন পরিশ্রমের সামান্য কিছু সঞ্চয় এই পাটকলের অফিসে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড-এর খাতায়। তার থেকেই ঋণ নিতে হবে। তারপর এতগুলি পোষ্যের সংসার।

তবু মাথা নুইবেন না তিনি। সমীরের মতো ভালো ছেলের ভবিষ্যৎ নিজের হাতে নষ্ট করবেন না।

ঠাণ্ডা পড়েছে। ঝড়ের রাত। আজ বৈদ্যবাটিতে সমীরকে পাঠিয়েছেন বিয়ের পাকাপাকি করে দিন ধরে আসতে। এখনও ফেরেনি সমীর।

—রাত তো অনেক হলো ?

স্বামীর কথায় কল্যাণী বলে চিন্তিত কণ্ঠে।

—তাই তো ভাবছি। যা ঝড় বৃষ্টি বোধহয় ওরা বের হতেই দেননি।

—তাই হবে হয়তো !

হরিপদবাবু ওই ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন। বাইরে তখনও মেঘলেপা আকাশটা একচোট মাতামাতির পর খানিকটা থেমেছে, তবু তার আক্রোশ যায়নি। থেকে থেকে বিজলীর ঝলক হানছে আর ফুঁসছে। হরিপদবাবু গরাদ-ভাঙ্গা জানলার বাইরের দিকে চেয়ে আছেন, ক'দিন থেকে শরীরটা ভেঙ্গে পড়েছে। জরাজীর্ণ দেহটা হাঁপানীর টানে বড় কাঁপছে, ভেবেছিল তবু চাকরিটা থাকবে। কিন্তু সেদিন সাহেবেরা অফিসে ওকে অমনি মারাত্মক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তেই কোন রকমে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে পরে জানায় তার বয়স হয়েছে—চাকরি আর করতে পারবে না। তবে তার ছেলের কথা কোম্পানী চিন্তা করবে।

হরিপদবাবু চমকে উঠেছিল প্রথমে—কল্যাণীও। এতবড় সংসারের দায়, এতগুলি প্রাণীর মুখে অন্ন যোগানোর সমস্যা রয়েছে। হরিপদবাবু গজরান। যতদিন তাগদ ছিল ততদিন ওরা খাটিয়ে নিয়ে রক্ত শুষে নিয়ে দাম দিয়েছে। আজ গতর গেছে—তাতও নাই। এই নাহলে কলিকাল বড়বৌ! ওদের নজর এইবার ছেলেটার দিকে।

কল্যাণী চুপ করে থাকে।

'এরপর কি হবে ভাবছে সে' চোখের সামনে সেদিও এমনি ঝড়ের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। কোনদিকে সে মুক্তির আশ্বাস-পথ কিছুই পায়নি।

সমস্যার সমাধান করেছিল সমীর নিজেই।

কয়েকটা দিন এ খবর জানতে পারেনি সে। কলেজ গেছে টুশানি করে ফিরেছে। অন্যদিন বাড়িতে এলেই সেই জীর্ণ বাড়িটা কলরবে ভরে ওঠে।

বাড়ির মধ্যে নগ্ন অভাবটা রাতের অন্ধকারেও চাপা পড়ে না। মাঝে মাঝে উদগ্র হয়ে ফুটে ওঠে। কল্যাণীর মুখে চোখে কি কালিমা—দারিদ্র্যের সব

আবিলতাটুকু ওর দুচোখে ফুটে উঠেছে। ছোট ভাই-বোনদের পোশাকেও সেই ছাপ। বাবার জীর্ণ শরীরটা কাঁপছে কি দুঃসহ বেদনায়, বাড়িটার গায়ে গায়ে যেন বিষাক্ত ক্ষত ঠেলে উঠেছে। চুণ পলেস্তারা খসে পড়ছে এদিকে ওদিকে। হাড় কঙ্কাল বের করা একটা বৃদ্ধ মুমূর্ষু জীব যেন ধুকছে। জানলার পাল্লাও অনেক নেই। ময়লা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে সেগুলোকে কোন মতে গৃহবাসী জীবগুলোর আব্রু রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। তবু এই বাড়িটায় সুর ওঠে।

সুষমা গান গায়। মিষ্টি সুরেলা গলায় ওর সুর ওঠে। মনে হয় শীতের কঠিন শাসনভরা মরা ডালে ডালে সব কাঠিন্যের মাঝে জীবনের সুর উঠেছে সব বেদনাকে অগ্রাহ্য করে। কল্যাণী মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়।

—গান! এরপর দিন চলবে কি করে তার ঠিক নেই, আবার গান গাস তোরা? এত আনন্দ কিসের?

—তাই বলে সব দুঃখের কাছে মাথা নুইয়ে দেবে? ও গান গাইবে—মাঝে মাঝে তবু মনে হয় মা আমরা বেঁচে আছি। এখনও মরিনি।

সমীর মায়ের ছলছল চোখের দিকে চেয়ে থাকে। ক'দিন থেকেই দেখেছে বাবার অসুখ, অসুখ তো এমন মাঝে মাঝে করে। বাবাও বলেন এ আমার সঙ্গী রে। দারিদ্র্য আর ব্যাধি আমার নিত্য সঙ্গী।

কিন্তু এবার বাড়িতে কালো একটা ছায়া নেমেছে।

ছেলের কথায় কল্যাণী জানায়।

—বাবার চাকরি আর নেই কোম্পানী জবাব দিয়েছে। বলেছে এইবার রিটায়ার করতে হবে। কি করে চলবে এইবার বাবা।

চুপ করে যায় সমীর। মুখের উপর যেন অতর্কিত একটা থাবড়া খেয়েছে।

কল্যাণী বলে কোম্পানী বলেছে তোকে ওরা চাকরি দিতে পারে।

ছেলেমেয়েরাও ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল মায়ের মুখে কথাটা শুনে। তারাও জেনে ফেলে সামনে তাদের নিশ্চিত উপবাস দুঃসহ যন্ত্রণা। বাবার চাকরি নেই। কিন্তু মায়ের কথাটা শুনে তারা উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। অন্ধকারের অতলে তবু আশার খবর শোনে। দাদাই পারে এখন তাদের এই দুঃখ ঘোচাতে। একমুষ্ঠি অন্ন সারা শরীরের সমস্ত কোষগুলোর কাছে সেই একটা মাত্র সার্থক স্বপ্ন, একান্ত প্রয়োজনীয়। শুধু বেঁচে থাকা, নিজেদের বাঁচার সামর্থ্য না হওয়া অবধি একজনের মুখ চেয়ে থাকা।

সমীর কি ভাবছে!

তার পড়াশোনা—নিজের ভবিষ্যৎ আছে। মনে মনে একটা স্বপ্নজগৎ রচনা করে রেখেছিল। বড় হবে—এ বাড়ির ওই হতভাগ্য ভাই-বোনেদের দিন বদলাবে। বাবাকে সেই-ই নিজে ওই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির চাকরি ছেড়ে দিতে বলবে। এই নোংরা বাড়িটাকে আবার সারিয়ে নতুন করে রং করবে।

কিন্তু রং তার বিবর্ণ হয়ে যায়।

ভাইবোনদের মুখে কালো, কি বেদনার পাণ্ডুর ছায়া পড়েছে, ওরা সাগ্রহে চেয়ে আছে তার দিকে। সমীরের সব ভবিষ্যৎ কল্পনা আজ ওদের পাণ্ডুর চাহনির সামনে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সমীর বলে ওঠে আচমকা।

—যদি চাকরিটা নিই?

চমকে ওঠে কল্যাণী। নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য একজনের ভবিষ্যৎ তারা নষ্ট করে দেবে এ কথাটা ভাবেনি সে। জানে চটকলের কাজের কি ভবিষ্যৎ। তাও যদি ভালো চাকরি হতো। কিন্তু সামান্য একটা চাকরি নিয়ে পচে মরবে সমীরের মতো ছেলে সারা জীবন—এটা মানতে চায় না মায়ের মন।—না, না বাবা। তা হয় না।

সমীর ভাই-বোনদের দিকে চাইল। ওদের মুখের সেই কালো ছায়াটা মুছে গেছে। ওরা তবু কোন রকমে বেঁচে থাকার আশ্বাস পায়। বলে ওঠে সমীর।

—বাবাকে বলো—আমি রাজী আছি। তবু বেঁচে থাকলে একটা পথ পাবোই। তমির প্রতিমাও তো বড় হবে।

ছোট ভাই-বোনদের মুখে হাসি ফুটেছে, মায়ের মুখে আলো ছায়ার আবেগ। কথাটা ওকে জানাতে চায়নি। সমীর তবু জেনেছে সে আজ কঠিন একটি মানুষের মন নিয়ে এই দুঃখের তুফানে বানচাল নৌকাটার হাল ধরতে চায়।

যে কোন রকমেই হোক এ দুঃখ বিপদ তারা পার হবেই। হরিপদবাবু সেইদিন থেকে ছেলেটাকে মনে মনে সমীহ না করে পারেন নি। তিনি নিজে এই চাকরি নিয়েছিলেন অন্য কোন পথ না পেয়ে। কিন্তু সমীর তার সামনের সেই পথটা ছেড়ে দিয়েই এতগুলো প্রাণীর মুখে অন্ন জোগাবার ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে।

চাকরিটা তাকে দিয়েছিল কোম্পানী। হরিপদবাবু শুনেছেন গুপী সেন সাহেবদের বলে কয়ে তাকে কেরাণীর সেই খাতা ভরানো চাকরি দেননি, তবু মেসিনশপে কাজ দিয়েছেন। বিজ্ঞানের ছাত্র তবু মেসিনশপে কাজ করে। এখানে তবু ওভার-টাইম মেলে কিছু বোনাসও আছে।

সমীর অবশ্য সেই চাকরি জীবনই মেনে নিয়েছে।

নিজের মনের অতলে একটা বেদনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে; তবু সমীর সেই চিন্তাকে মন থেকে সরিয়ে দেয়। দত্তবাড়ির মুরারিকে তার মনে পড়তো, মুরারি পড়াশোনায় তেমন নয়। সমীরের কাছে প্রায়ই আসতো অঙ্ক না হয় ক্যালকুলাস কোনদিন ফিজিক্সের বই নিয়ে। সেই মুরারিই বলে, পড়া ছেড়ে দিলি সমীর?

সমীর হাসে, ম্লান একটু হাসিতে ওই পড়াটা যেন তার কাছে কিছুই নয় এমনি করে জবাব দেয়।

—পড়ে কি হবে রে? তবু দুটো পয়সার তো মুখ দেখছি।

কথাটার আড়ালে প্রচ্ছন্ন বেদনার সুরটুকু মুরারির চোখে পড়ে না। সে বলে আমাকে যে বাড়িতে ছাড়ছে না কি করি বল?

সমীরের মনে মনে হাসি পায়। ওর ক্ষেত্রে এইটা ঠিক বিপরীত। বাড়ি ঠেলাতেই ওকে আজ এই বৃত্তি নিতে হয়েছে।

মেঘের গর্জন তখনও থামেনি। সমীর ফিরছে বাড়ির দিকে। আজ মনে হ মৃত্যুকে সে সব নিষ্ঠুরতার মাঝে প্রত্যক্ষ করেছে। সেই নিষ্ঠুর মৃত্যুও তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। শুধু নিজেকে নয় আর একজনকেও সে বাঁচিয়ে এনেছে· রাস্তার আলোগুলো দু-একটা জ্বলছে। জনহীন পথ। কোথায় টিনের চালা উড়ে গেছে। রাস্তার জল নর্দমার জলে মিশে কোন গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকেছে। ছেলেটি পিছন পিছন আসছে। অন্ধকারে ওর পায়ের শব্দ ওঠে ছপ্ ছপ্। কথাবার্তা বলে কম। ভিজে নেয়ে উঠেছে সমীর। এতক্ষণে মনে পড়ে সে একটা কাজে গিয়েছিল বৈদ্যবাটীতে। সামাজিক ব্যাপার। তার বোন সুষমার বিয়ের ব্যাপারে।

ওরা সামনের অঘ্রাণেই বিয়ের দিন দেখেছে। এখনও তিনটে মাস প্রায়। বর্ষা যাবে, শরৎ আসবে—তারপর হেমন্ত। কি যেন ঋতুগুলো ছ'টা ঋতু! সমীরের ওসব মনে রাখবার আর কোন দরকার নেই। কাঁপছে সে!

পেছনে চাইল, ছেলেটির ডাগর দু'চোখে কি একটা নীরব মিনতি ওর সুন্দর ফর্সা, রং, চোখ দুটো সুন্দর। মাথার একরাশ কোঁকড়ানো চুল ভিজে গেছে, পরনে একটা পাঞ্জাবী। সেটাও গায়ে সেটে লেগেছে।

কাঁপছে শীতে। সমীর আশ্বাসের সুরে বলে।

—এসে গেছি।

মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা এখানে জীর্ণ। খোয়াগুলো বৃষ্টির ধারায় উঠে গেছে। তখন জলের স্রোত বইছে রাস্তায়। সহরের অনেক জল এই দিকেই নিকাশ হয়। খোলা কাঁচা নর্দমার দুপাশে কচুগাছগুলো গলা অবধি ডুবে আছে। রাতের অন্ধকারে কর্কশকণ্ঠে ব্যাংগুলো ডাকছে। মেঘের বুকে তখনও বিজলীর আভাস ফুটে ওঠে।

দরজায় কড়া নাড়তেই সুষমাই প্রথমে চমকে ওঠে।

আজ এই ঝড়ের রাতে দাদার বাড়ি না ফেরার জন্য সেইই দায়ী। তাদের সংসারে দেখছে ওই একটি মানুষ কি চেষ্টায় তাদের সকলকে মানুষ করে তোলবার চেষ্টা করছে।

সুষমাকে নিজেই সে কিনে দিয়েছে একটা হারমোনিয়াম যদিও পুরোনো, তাতেই কাজ চলে। প্রতিমাকে হাইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। তিমিরকে পাশ করাবার কি তার দুর্বার আগ্রহ।

আজ জানে সুষমা দাদা কোথায় গেছে। তার বিয়ের ব্যাপারে। ইতিমধ্যে সুষমা বুঝতে পেরেছে বিয়ে বস্তুটা কি। এ বাড়ির সব অভাব দুঃখ থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে। নতুন করে নিজের ঘর পাতবে। কিন্তু বিনিময়ে তার সব

স্বাধীনতা একজন অপরিচিত লোকের কাছে বিসর্জন দিতে হবে। লোকটাকে সেদিন দেখেছিল সুষমা। কালো কালো গড়ন, গোলগাল নাড়ু গোপাল মার্কা চেহারা। বয়সও হয়েছে তার। দ্বিতীয় পক্ষ। তবে আগে ওই লোকটার জীবনে অন্য একটি নারী এসেছে, আর একজনকে সে ভালবেসেছে; কাছে—খুব কাছে, বুকের কাছে টেনে নিয়ে আদর করেছে। কেমন বিশ্রী লাগে সুষমার কথাটা ভাবতে। ও যেন কার এঁটো খাবারে মুখ দেবার মতই একটু ঘিনঘিনে ব্যাপার। তবু দাদার মুখচেয়ে কিছু বলতে পারেনি।

আজ দাদা এখনও ফেরে নি। কে জানে পথে কোন বিপদ হ'ল কিনা! মাঝে মাঝে গাছের ডাল ছিটকে পড়ে পথচারীর উপর, না হয় গঙ্গার তুফানে নৌকা ডোবে!

কথাটা ভাবতেও শিউরে ওঠে সুষমা। নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হয়। তার নিজের দিকে যতই চেয়েছে ততই মনে হয়েছে এমনি অভাব আর দারিদ্র্যের মাঝে থেকে এল এই যৌবনপ্রবাহ।

দেহের কানায়-কানায় তার উন্মাদ-অস্তিত্ব। নিটোল হাত দু'টো পূর্ণ হয়ে উঠেছে সুঠাম মাংসল আবেদনে। গুরু নিতম্বের ছন্দ সে অনুভব করে প্রতিটি পদক্ষেপে। চোখের তারায় অকারণ একটা আবেশ। মনের মাঝে একটা নবজাগরিত সত্বাকে সে আবিষ্কার করেছে।

এই বোধ হয় তার নারীত্ব। সে কামনা করে···স্বপ্ন দেখে।

প্রতিমা দিদির এই সুন্দর দেহের দিকে চেয়ে থাকে। ওর চাহনিতে বিস্ময়-আনন্দ। সুষমার কেমন বিশ্রী ঠেকে। জীর্ণ-শাড়িখানা দিয়ে বুক-গা ঢাকবার চেষ্টা করে। প্রতিমা এমনি একটু মুখফোড়, দিদিকে জড়িয়ে ধরে বলে—

—তুই কি সুন্দর হয়েছিস দিদি। সাধে কি আর সেই বৈদ্যবাটির ভদ্রলোকের মাথা ঘুরেছ?

এ্যাই! কৃত্রিম কোপে ধমকে ওঠে সুষমা।

তবু নিজের কাছে এই কথা সে চাপতে পারে না। এক এক সময় মনে হয় তার জীবনে আরও অনেক কিছু পাবার কথা ছিল। কিন্তু নিষ্ঠুরতা দেবতা তাকে বঞ্চনা করেছে।

ওই বঞ্চনাই দেখছে সে সমীরের জীবনে। দাদাটার জন্য তাই একটা নীরব ভালবাসা সমবেদনার ভাব জমে ওঠে। রাত হয়ে গেছে। আকাশটা থেকে থেকে তখনও গোঁ গোঁ করে গজরাচ্ছে। ব্যাংগুলো ডেকে চলেছে গলা ফুলিয়ে।

কড়া নড়ছে। চেনা হাতের কড়া নাড়া। হ্যারিকেনটা উস্‌কে দিয়ে সুষমা গলা তুলে সাড়া দেয়!

—দাদা!

সমীরই। কল্যাণীও জেগে উঠেছে—বার হয়ে এসেছে দালানে। দালানের ছাদটা

চালুনির মত ফুটো হয়ে গেছে। টপটপ বৃষ্টির জমা জল তখনও ঝরছে। সুষমা দরজাটা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

—একি রে? ভিজে নেয়ে উঠেছিস?

সমীরের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে সুষমা। কল্যাণীও এগিয়ে আসে।

—এসো। সমীর ডাক দেয় পিছনের ছেলেটিকে।

ছেলেটি ভেতরে ঢুকল। কালিলেপা আকাশে একটা দিক্‌জোড়া বিদ্যুৎ ঝল্‌সে ওঠে। শিরা-উপশিরা বয়ে আলোর স্রোত চলে যায় তীব্র গতিতে। সুষমা ওই নবাগতকে দেখছে।

সুন্দর চেহারা। ডাগর দু' চোখে অসহায় চাহনি, মাথায় কোঁকড়ানো চুল বয়ে জল ঝরছে। খানিকটা শুকিয়ে এসেছে তবু চুলগুলো বৃষ্টিধোয়া। সুন্দর মুখখানা দেখে বর্ষার যুঁই ফুলের কথা মনে পড়ে।

কল্যাণী ছেলের দিকে চাইল—জিজ্ঞাসার চাহনিতে। সমীর ক্লান্ত দেহ নিয়ে বারান্দার সিঁড়িতে বসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—

—নৌকা ডুবে গেল মাঝ গঙ্গায়। ও ডুবছিল। কোনরকমে টেনে তুলে আনলাম মরণের মুখ থেকে। বসো হে···কি যেন নামটা তোমার তাও তো শুধোয় নি। একটু চা কর দিকি সুষি। একেবারে 'র' চা। শীতে জমে গেলাম। আর লুঙ্গিটুঙ্গি দে—এসব ছেড়ে ফেলি। জমে গেলাম। ওর জন্যও যা হয় কিছু আন।

সুষমা ওই নবাগতের দিকে এক নজর চাইল। ছেলেটি তার দিকে চেয়ে আছে। হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় ওকে দেখে মনে হয় খুবই ক্লান্ত তাছাড়া ঠাণ্ডায় যেন কাঁপছে সে। সুষমা ঘরের ভিতরে চলে গেল শুকনো কাপড় ও লুঙ্গি আনতে।

—এলি খোকা! ওরা কি বললে? বদ্যিবাটির ওরা?

সমীর জবাব দেবার আগেই কল্যাণী বলে—ওসব কথা পরে হবে। বাছা আমার এসেছে এই ঢের। হে মা মঙ্গলচণ্ডী মা বড়কালী, সওয়া পাঁচ আনার পুজো দেব মা ঃ বস বাবা, দেখি, চা আনি।

ছেলেটি এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। কি একটা ভয় আর কঠিন আতঙ্কে তার সব চিন্তা ভাবনার ক্ষমতাও হারিয়ে গিয়েছিল। এইবার ধীরে ধীরে সে তার আচ্ছন্ন অবস্থাটা কাটিয়ে উঠছে। সে এ বাড়ির চারিদিক দেখছে, দেখছে ওই মানুষগুলোকে। কল্যাণী, ওই সুষমা, প্রতিমা ওই ছেলেমেয়েগুলোকে। সারা বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা অপরিসীম দৈন্য।

কল্যাণীর ওই মানসিকের কথা শুনে হেসে ফেলে চঞ্চল।

সমীর ওর দিকে চাইল। ওর হাসিতে সে অবাক হয়েছে। চঞ্চল সামলে নিল। ও বুঝতে পেরেছে ওদের এই আন্তরিকতাকে সে কোথায় যেন ব্যঙ্গ করে ফেলেছে ওই হাসি দিয়ে, তার অজানতেই।

ব্যাপারটা কেমন দ্রুত গতিতে ঘটে যায়। চঞ্চলও ঠিক ঠাওর করতে পারে না।

তার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে ইতিপূর্বে। প্রবহমান জীবন। এককালে বাড়ি-ঘর—বাবা মা সবই ছিল। বর্ধমানের ওদিকে—সেই সবুজ গ্রামটার ছবি এখনও ভোলে নি, তার সঙ্গে আর একটা কল্পনার জগৎ একটি কোমল মধুর বেদনাময় ছবি মিশিয়ে আছে,···সে তার মা।

বাড়ির অবস্থা মোটামুটি ভালোই। বেশ কিছু জমিজেরাত। মধ্যস্বত্ব হিসাবে ধান সাজা বন্দোবস্ত সবই ছিল। সুন্দর ছোট্ট একটি শান্তির সংসার।

মা মারা যাবার পর থেকেই সব কেমন ঘুলিয়ে গেল, বাবার স্বভাবের ঠিক পরিচয় যেন জানতো না চঞ্চল। তবে মাঝে মাঝে বাবাকে মদ্যপ অবস্থায় দেখতো, মা নিষেধ করলে তাই নিয়ে কথা বাড়তো। কোন কোন দিন দেখেছে বাবা মায়ের গায়েই হাত তোলে। মায়ের কান্না শুনতে পায় সে।

শিশুমনের অতলে একটা কঠিন সত্ত্বা জেগে ওঠে। মনে হয় বাবার এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করবে সে। তার শক্ত দুটো হাত দিয়ে ওই দৈত্যের মত লোকটার টুঁটি টিপে ধরবে। মদ ছাড়া আরও অনেক উপসর্গ জুটেছিল তার।

এমনি এক বৃষ্টির রাতেই কি ব্যাপার নিয়ে মা আর বাবার মধ্যে তুমুল হয়ে ওঠে ঝগড়াটা। আরও কে যেন সেদিন বাড়িতে এসেছিল,—আর একটি মেয়ে।

চঞ্চল তখন ব্যাপারটা কিছু কিছু বুঝতে পারে। একটা অদম্য বিকৃত কামাতুর ওই লোকটার উপর ততই যেন আক্রোশ পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

সেই রাত্রের শেষে তার মাকে দেখা যায় কড়িকাঠে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে। চঞ্চল অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিল চোখের সামনে সে দেখেছে তার একটি কোমল সত্ত্বা নিঃশেষ অপমৃত্যু, অপমৃত্যু নয়—সে শুনেছিল পরে, ওটা হত্যাই, সেই কামোন্মাদ মদ্যপ মানুষটা নিজের ব্যাভিচার আর সব বিকৃত প্রবৃত্তিগুলোর তাড়নায় অমানুষ হয়ে উঠে রাতের অন্ধকারে সেই অসহায় নারীকে হত্যা করেছিল।

জমিজায়গাও বিক্রি করে চলেছে। সেই সঙ্গে বাড়িতে এসে জুটেছে একটা মেয়েমানুষ।

চঞ্চল তখন কলেজে পড়ছে। স্কুল থেকে বের হয়ে সে কলেজ-হোস্টেলে এসে উঠেছে; এই নরকপুরীর পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়েছে সে। তবু মাঝে মাঝে বাড়ি যায়।

বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বড় একটা হয় না। বাবা যেন তুরীয় লোকে বিরাজমান। মদ খায়···আর ওই মেয়েমানুষের নেশা তাকে জারিয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে নাকি জুয়ার আসরও বসছে।

চঞ্চলের মনে হয় এখানে মুক্তির স্বাদ নেই। মাকে মনে পড়ে। সারা বাড়িটাকে ঘিরে অশরীরী কোন অমঙ্গলের আর নিঃশেষ ধ্বংসের ছায়াই ফুটে ওঠে।

বড়বাবু যে!

বাবার কণ্ঠস্বর শুনে চাইল চঞ্চল। বাবার কণ্ঠস্বর জড়িত। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা সেগুলো থেকে একটা বিজাতীয় কঠিন শব্দ ওঠে।

—এ বাড়িতে যে গেড়ে বসেছো এ্যাঁ। হঠাৎ এত মন টিকে গেল হঠাৎ?

হাসছে মানুষটা। চঞ্চল এই ইঙ্গিতটা ঠিক বুঝতে পারে না। তবু কেমন বিশ্রী লাগে। বলে ওঠে চঞ্চল—

—যাবো আজই।

—তাই যাও। মোহ বড় ভাল নয় হে। সাধে কি আর মহাপুরুষরা বলে কামিনী আর কাঞ্চন! দুই পাপ! তারা—তারা!

লোকটাকে ঘৃণা করে সে। চঞ্চলের মনে হয় ও চায় সে এ বাড়ি থেকে চলে যাক। চঞ্চল হোস্টেলেই এসেছিল।

তবু বাড়ি যেতে হয় ছুটিতে। অন্য বন্ধু-বান্ধবরা বাড়ির গল্প করে। মায়ের কথা বলে। ভাই-বোনের সম্বন্ধে আলোচনা করে। কিন্তু চঞ্চলের নিয়ে বলার কিছুই নেই। ওই মিষ্টি অনুভূতিগুলো তার স্তব্ধ। মানুষের বিকাশ ঘটে বিভিন্ন রূপে। ভাই-বোন, মা-বাবা, বন্ধু, স্ত্রী সেই বিভিন্ন মানবচেতনার এক একটি রূপায়ণ।

স্বাভাবিক অন্তনসত্বার সেই বিভিন্ন প্রকাশের আলো-অন্ধকারে তৈরি হয় মানুষের বিচিত্র বর্ণালীভরা মনের নানা রূপ, সেইখানেই সে সার্থক। চঞ্চলের জীবনের সেই বোধগুলো নেই, বিকাশগুলোও ঘটেনি। অবরুদ্ধ চেতনলোকে সে জড় একটি সত্ত্বায় পরিণত হচ্ছে। মায়ের সেই মিষ্টি স্নেহভরা রূপ শুধুমাত্র ক্ষীণ স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। বাকী সব চেতনাগুলো অবরুদ্ধ মনের অতল থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে কি বুক ভরা অতৃপ্তি নিয়ে।

সেই অতৃপ্তির নামই বোধহয় ঘৃণা। বৃথাই সে অন্বেষণ করে কি পাবার। তার শূন্য অঞ্জলি শুধু বেদনাতেই ভরে ওঠে।

পুজোর ছুটিতে হোস্টেল শূন্য। চঞ্চলের আর যাবার জায়গা নেই। তাই সে-বার বাড়িতে এসেছে। বাবা ওর দিকে অর্থপূর্ণ চাহনিতে চাইল মাত্র। চঞ্চলের মনে হয়েছিল এখানে না এলেই ছিল ভালো।

তবু নিজের ঘরে এগিয়ে আসে। এইটুকুই এ বাড়িতে স্বতন্ত্র জগৎ। স্তব্ধ-জনহীনপ্রায় বাড়িটা। মাঝে মাঝে সেই মেয়েটাকে দেখে। ওর দিকে চাইতে পারেনা চঞ্চল। কি দুঃসহ ঘৃণায় শিউরে ওঠে! ওর চাহনিতে কেমন একটা জ্বালা জ্বালা অনুভূতি।

চঞ্চল সাপকে বিশ্বাস করতো না। কিন্তু সাপের চেয়েও যে শয়তান হিংস্র প্রতিহিংসাপরায়ণ কিছু থাকতে পারে সেটা তার জানা ছিল না। সেই রাতের ঘটনা তার জীবনে একটি বিচিত্র দিক খুলে দেয়।

রাত কত জানে না···হঠাৎ ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসে তার। সারা দেহ কে যেন কঠিন নিষ্পেষণে পিষে ফেলতে চাইছে, কানের কাছে সারা মুখে পড়ছে

কার উত্তপ্ত নিশ্বাস। ওঠবার চেষ্টা করে চঞ্চল। সারা শক্তি দিয়ে কে তাকে জড়িয়ে ধরেছে · জ্বালাকরা একটা অনুভূতি···আবছা অন্ধকারে খোলা জানলা দিয়ে এক-ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে। চমকে ওঠে চঞ্চল···সেই মেয়েটাই।

এতদিন ধরে তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে, চোখের চাহনিতে কি আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আজ তাকে জোর করে সে পথের পাঁকে এনে নামাতে চায়।

ওর মাংসল দেহটা কাঁপছে···আবছা অন্ধকারে ঘৃণ্য সে জীবটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো চঞ্চল।

—বেরিয়ে যাও।

—চঞ্চল!

মেয়েটা ফিসফিসিয়ে এগিয়ে আসে। দুচোখে ওর কামনার আগুন। সেই কুৎসিত অবস্থায় প্রথম একজন নারীকে দেখেছে চঞ্চল···দেহের ভাঁজগুলো প্রকট—বুকের কাছে কোন কাপড় নেই, মেদবহুল অর্ধনগ্ন দেহটা কি বিভীষিকার আতঙ্ক আনে।

বেরিয়ে যাও!

চঞ্চল বোধহয় ওর মুখেই থাবড়াটা কসেছিল। মেয়েটার ঠোঁট কেটে গেছে রক্ত পড়ছে, ও যেন একটা মারখাওয়া জানোয়ার, দুচোখ জ্বলে ওঠে অপমানে।

মেয়েটা চীৎকার করে ওঠে। বিকট বীভৎস কণ্ঠের সেই চীৎকারে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল চঞ্চলের বাবা। মদের নেশায় দু চোখ লাল···পা দুটো টলছে। সামনে ওই মেয়েটাকে অমনি অর্ধনগ্ন অবস্থায় দেখে ওর বাবা হেসে ওঠে। কঠিন, জড়িত কণ্ঠের সেই হাসি।

—বা······সাবাশ! তাই বলি বড়বাবু কেন এ বাড়ি ছাড়ে না? তবে মেয়েটা বেশ খেলোয়াড় হে! এ্যাদ্দুর এল কি করে? এঁ্যা!

—বাবা!

চঞ্চল চমকে ওঠে!

—সব মিথ্যা! ওকেই জিজ্ঞাসা করুন—

মদ্যপমানুষটা দপ্ করে জ্বলে ওঠে—থামো! বদমাইস কুত্তির বাচ্চা!

—মায়ের নাম ধরেই গালাগাল দিতে থাকে। মায়েরও নাকি এমনি হীন স্বভাব ছিল। লোকটার কথায় চঞ্চল চমকে ওঠে।

—তোর মাও এমনি ছিল। ছেনাল! তাই তাকে গলাটিপে—

—খুনী তুমি! শয়তান! গর্জন করে ওঠে চঞ্চল,—আমার মায়ের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে খুন করে এই অনাচার চালাচ্ছো! এমনি পাপগুলোকে প্রশ্রয় দিয়েছো। তুমি অমানুষ—শয়তান—জানোয়ার!

হাতের গেলাসটাই ছুঁড়ে দেয় লোকটা তার মুখের দিকে।

সঞ্চল মুখটা সরায় নি। ওর সেই আঘাতটা এসে লাগে একেবারে চোখের নীচে। কেটে গলগল করে রক্ত পড়তে থাকে। চোখটা তবু বেঁচে গেছল সেদিন।

ঘৃণায়—লজ্জায়—রাগে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে। জীবনের কোন ঠাঁই এ আশ্রয় তার নেই। মানুষ সম্বন্ধে ধারণা তার বদলে গেছে। বাবা—

ওটা তার কাছে অপমানের কথা।—জীবনের পুঞ্জীভূত এই বেদনার মূল।

—কাপড়টা ছেড়ে নিন!

শীতে দাঁত কত্তাল বাজছে। অন্তরের সেই সুপ্ত জ্বালাটাই যেন এই বৃষ্টির রাতে জমে যাওয়া মনকে তাতিয়ে তোলে। মেয়েটির ডাকে মুখ তুলল সে···আর কিছুই জোটৌন। মেয়েটি একটা পুরানো শাড়ি এনে তার হাতে তুলে দেয়।

—কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন, ওগুলো কেচে বারান্দায় মেলে দিই 'ওমা গঙ্গার পলি-কাদায় যে মাখামাখি হয়ে গেছে সব।'

—কাল সকালেই কাচবেন। চঞ্চল জবাব দেয়।

চা-ও এসে গেছে। হাত পা ছড়িয়ে বসেছে সমীর। এই গরম চা-টা বেশ লাগছে! সারা শরীরে একটা উষ্ণ আবেশ আনে।

মা বাবাও শুনেছে খবরটা ওরা বিয়ে দেবে ক'মাস পরই এই অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম লগ্নে।

খানিকটা নিশ্চিন্ত হয় তারা। যাক্ পাকাপাকি হয়ে গেল। সুষমা চঞ্চলের দিকে চাইল। শাড়িখানায় ওকে বিচিত্র দেখাচ্ছে। সুন্দর ফর্সা রং···মাথার ঐ কোঁকড়ানো চুলগুলো পড়েছে ডাগর ডাগর চোখের ওপর।

সমীর আর সে খেতে বসেছে, সমীর বলে ওঠে।

—দে দিকি সুষি, আধখানা গঙ্গায় সাঁতার কেটে খিদে বেড়ে গেছে। ওঃ। তা চঞ্চলবাবু; সাঁতারটা শেখোনি কেন হে? এতবড় দুঃখের তুফানভরা দুনিয়ার পাড়ি জমাবে কি করে? তবে সাঁতার না জানাই ভালো হে, দুঃখে ভুগতে হয় না। সটান পাথরের মত তলিয়ে যাবে! মুক্তি পেয়ে যাবে। আর···সুষি দে, চঞ্চলকে একটু তরকারি দে।

চঞ্চল দেখেছে এদের সামান্য আয়োজন।

কয়েকখানা রুটি আর ডালের সঙ্গে দু একটুকরো কুমড়ো ঝিঙে সামান্য আলু সেদ্ধ করে তারই তরকারী। এইটুকু জোটাতেই ওদের সর্বকিছু উদ্যম দিতে হয়েছে।

চঞ্চলের এসব খাওয়া ঠিক অভ্যেস ছিল না। দেশের বাড়িতে অন্ততঃ ভালোমন্দ খাবার, দুধ মাছটা জুটতো। কিন্তু সেখানকার পরিচয় ছেড়ে দেবার পর থেকে এই জীবনে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। মাথা নাড়ে চঞ্চল।

—আর লাগবে না।

সুষমা ওর দিকে চাইল···বলে—আমরা গরীব, এই মাত্র আয়োজন ; লজ্জা করছেন না তো ?

সুষমার ব্যথাকাতর চোখের দিকে চাইল চঞ্চল। এ তার জীবনে যেন বিচিত্র একটা অনুভূতি। নতুন একটি চেতনা। এভাবে তাকে কেউ খেতে দেয়নি। সামান্য আয়োজনই কি প্রীতির স্পর্শে মধুময় হয়ে ওঠে।

সমীরের একটু নিজের আস্তানার মতো আছে। সিঁড়ির নীচে একটু জায়গা, ইঁটের আড়াল দিয়ে একটা জানলা বসিয়ে নিয়েছে সমীর। এইটুকুই তার নিজস্ব জগৎ। জীর্ণ একটা তক্তপোশ···সামান্য বিছানা পাতা।

—চঞ্চল তুমি ওতেই শোও !

চঞ্চল নিজে কেমন যেন কৃতজ্ঞবোধ করছে। এই কৃতজ্ঞতা বোধটা তার কাছে নতুন একটি চেতনা। এতদিন সে যা পেয়েছে তাতে তার নিজের দাবী আছে বলেই জানতো। কিন্তু পথে বের হয়ে দেখেছে। চিনেছে মানুষকে। কেউ চরম স্বার্থপর, কেউ বা আপন ভোলা। কেউ বা নিজের সবকিছু দিয়ে ধন্য হতে চায়, অপরের কৃতজ্ঞতাটুকু তাদের কাছে বড় সম্পদ। চঞ্চলও দেখছে সমীরকে, তার যুক্তিতে সে বিচার করে। জীবনে ভালবাসে অপরকে নিয়ে থাকা, তাদের জন্য ত্যাগ করে আনন্দ পায়···মনের রুদ্ধ দ্বারগুলো খুলে যায়···ভরে ওঠে আনন্দের আলোয়···সেই সব দিকেই সার্থক করা চেতনা চঞ্চলের নেই।

তাই বোধহয় একদিক থেকে চরম স্বার্থপর সে। চঞ্চলের মনে হয় ওই ছেলেটির প্রাপ্য ওর অন্তরের কৃতজ্ঞতা, সেইটুকুই সে তো জানিয়েছে। জানিয়েই তার কর্তব্য সেরেছে, সুতরাং দেওয়া-নেওয়ার পর্ব যখন চুকে গেছে তখন কুণ্ঠার কিছু নেই। তবু একবার শুধোয় চঞ্চল।

—আপনি কোথায় শোবেন ?

মেজেটা স্যাংসেতে। পুরোনো বাড়ি, চারিদিকের জমা জল এসে মেঝেতে জ্যাবজ্যাবে ভাব এনেছে। সমীর তবু সহজভাবেই একটা সতরঞ্জি টেনে নিয়ে পাততে পাততে বলে—

—এতেই চলে যাবে, সারাদিন চটকলে লোহা কেটেছি তারপর এই ধকল, ও ভায়া শুলেই ঘুম আসবে। নাও, শুয়ে পড়। কাল সকালেই আবার ডিউটিতে যেতে হবে। তা তোমার কথাতো কিছুই বল্লেনা ? কোথায় বাড়ি—কি করা হয়—মানে কা কম্মো—

হাসে চঞ্চল। ওসব দিক থেকে তার বলার মতো কিছুই নেই। চঞ্চল ভাবছে, বার বার শুধু মনে পড়ে শুধু মায়ের সেই ভুলে যাওয়া দুটো চোখের চাহনি।

জানলার বাইরে মেঘঢাকা আকাশে তখনও বিদ্যুতের ঝলক হানছে। ওর ভাবনার জগতে নতুন একটি মুখ আজ উদিত হয়। মিষ্টি আবেশময় সলজ্জ কৌতূহলী দুটো

চোখের চাহনি আজ তার ভাবনার জগতে ঠাঁই নিয়েছে। চঞ্চলের পরণে বোধ হয় ওই সুষমারই শাড়িখানা, ওর সুন্দর সুঠামদেহের স্পর্শ মাখানো।

সব স্বপ্নের মাঝে চঞ্চল কেমন শিউরে ওঠে। মেয়েদের সম্বন্ধে তার সামান্য একটু ধারণাই আছে। মায়ের কথা মনে পড়ে না, আর একজন নারীকে সে দেখেছিল সেই রাতের অন্ধকারে। বিশ্রী বীভৎস একটি কাম-লালসাময় নারী। জ্বালা ধরানো তীব্র একটা অনুভূতি মনকে চাবুকের ঘায়ে যেন যন্ত্রণাকাতর করে তোলে।

সেই যন্ত্রণাভরা মনটা আজ বিচিত্র একটি নারীকে দেখেছে, ওই সুষমার শান্ত স্নিগ্ধ চাহনিটুকু তার মনকে কি অপরূপ স্নিগ্ধতার আবেশে ভরে তোলে। ঘুম নামে সেই ক্লান্ত দেহে—ওর আবেশ জড়ানো দু চোখের পাতায়। নিথর ঘুম।

শরীরটায় যুৎ নেই। ক'দিন অনির্দিষ্টের মতো পথে পথে ঘুরেছে। বি-এ পাশ করেছিল চঞ্চল তবু ওই অবস্থার মধ্যে। আর কোন পথ পায়নি। দু-এক জায়গায় মাস্টারীর চেষ্টা করেছিল। শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলির, ওদিকে না হয় আরও দূরের কোন ছায়াান্ধকার দ্বারবাসিনীর কোন গ্রামে—কিন্তু টিকতে পারেনি।

বারবার বেশ বুঝেছে সে কোথায় যেন অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে সে মনের দিক থেকে। সব কিছুকে সাধারণভাবে সহনীয় করে নিতে পারেনি। তার মনোজগৎ সম্পূর্ণ নয়। কতকগুলো ভাব ভাবনাকে সে জানে না। সে বোঝেনা এই সকলকে নিয়ে বেঁচে থাকা ; সংসারের অভাব, যন্ত্রণা মুখ বুজে সয়ে থেকে মানুষ কেন চাবুক খায় বাঁধা ঘোড়ার মতো তাও জানেনা। দয়ামায়া ভালবাসা এগুলো তার বারবার মনে হয়েছে মানুষের অন্তরের দুর্বলতা। তাই ক্লাশেও কোন ছেলে পড়া না করে এলে মাঝে ক্ষেপে উঠত সে। হাতের কাছে যা পেতো, বেত, ম্যাপ-পয়েণ্টার তাই দিয়েই পিটতে সুরু করতো—সারা শরীরে কি একটা উন্মাদনা জেগে ওঠে তার। মনে হয় ওকে আরও জোরে না পিটলে তার শরীরের সব শিরা-উপশিরাগুলো খান খান হয়ে ফেটে পড়বে।

ছেলেটার পরিত্রাহী চিৎকারে সে আনন্দ পেত—নিষ্ঠুর একটা আনন্দ। হঠাৎ থেমে যেতো। কপাল কেটে গেছে—রক্ত ঝরছে ছেলেটার। নিজেও হাঁপাতো তার শরীরের সেই সদ্য জাগা পাশব-উন্মাদনা যেন ক্রমশঃ ফুরিয়ে এসেছে, ক্লান্ত সে। মানুষকে মাঝে মাঝে সইতে পারতো না। কোন স্কুলের প্রেসিডেণ্টকে দেখেই তার বাবার কথা মনে হয়েছিল। তেমনি জোড়া ভ্রূ লোকটার। কালো গায়ের রং, বিরাট মুখে একজোড়া গোঁফ ; চোখ দুটো করমচার মতো লাল টকটকে। ঘৃণায় ভরে উঠেছিল চঞ্চলের মন। লোকটা শয়তান। চাকরি করেনি চঞ্চল তার স্কুলে। শুনিয়ে দিয়েছিল—

—এখানে চাকরি করবোনা।

ভদ্রলোক অবাক হন। কেন ? কোন অসুবিধা থাকে বলুন।

আপনার এখানে কাজ করবো না। আপনি লোক ভালো নন। হতে পারেন না।

ভদ্রলোক অতি সজ্জন। চঞ্চলও শুনেছিল তার কথা। কিন্তু তাকে এমনি আঘাত না দিয়ে পারেনি। পরে নিজের কাছেই এর জন্য তার লজ্জার অবধি ছিল না।

শুধু হাউয়ের মতো বুকভরা জ্বালা নিয়েই ফিরেছে। এই জ্বালাকে ভুলে থাকার জন্য চটকল শহরের নোংরা বস্তিগুলোতে গেছে, দেখেছে রাস্তার ধারে··· আবছা আলোয় এদিক-ওদিকে মেয়েদের দাঁড়িয়ে থাকতে। বারবার সেই রাতের দেখা···সেই লালসায় উন্মাদ মেয়েটির দু'চোখ···সেই অর্ধনগ্ন দেহটা মনে পড়ে।

থমকে দাঁড়ায় চঞ্চল। রাস্তার একটু আলো পড়েছে··মেয়েটার মুখে গায়ের কাপড়টা ওকে দেখেই যেন ইচ্ছে করেই সরিয়ে দিল। জামার আড়ালে একটা মাংসল দেহ ফুটে ওঠে কি কদর্য আমন্ত্রণ নিয়ে।

চঞ্চল কি দেখছে·· ওই আমন্ত্রণ সে জানে। অতীতের একটি ঝড়ের মাতন ভরা রাতে···একজন অমনি দেহ দিয়ে তাকে ঠেসে ধরেছিল। আলোটা যেন নিভে গেছে। অন্ধকারের অতলে কে আজও তাকে টানছে।

সেদিন সেই উন্মাদনাময় অনুভূতির পথটা সে জানে নি। আজ তাকে মাতাল করে তুলেছে তার মনের সেই জৈব-উন্মাদনা।

সেই সব জ্বালাটা তার কোষে কোষে অগ্নিপ্রবাহ আনে। হাসছে মেয়েটি। নতুন এমনি মানুষগুলোর বিবেকের সঙ্গে লড়াই তারা দেখেছে। একজন টানছে··· অন্যজন ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে তাকে অতল কালো ধ্বংসের গহ্বরে। ওর মনের সেই ভাবনাগুলো টুকরো হয়ে যাবে, তা জানে মেয়েটি।

দু'চোখে তার নেশা লাগানো হাসি,

চঞ্চল আজ উন্মাদ হয়ে উঠেছে। প্রবল নিষ্পেষণে একদিন একটা লালসায় উন্মাদ নারী তাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল··সেদিন সে তার জবাব দিতে পারেনি। আজ যেন সে তার জবাব দেবে···ওর সারা দেহটাকে দুমড়ে মুচড়ে পিষে ফেলবে··· ওকে হত্যা করে সে এই দুঃসহ জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। শরীরের তন্ত্রীতে সেই পাশব উন্মাদনা।

মেয়েটা প্রায়ান্ধকার ঘরে ওর দু'চোখের সেই আগুনের রোশনীতে যেন মেতে উঠেছে। পুরুষের এই জ্বালাটাকে ওরা জ্বালিয়ে রাখতে চায়, ওরা জ্বলুক··· পুড়ুক—পুড়ে ছাই হয়ে যাক তার দেহের চিতার অনির্বাণ অগ্নিজ্বালায়।

তাই ওকে মদ খাইয়ে চুর করে দিয়েছে, ওর নিজস্ব সত্ত্বার অপমৃত্যু ঘটুক, ওর মনের সব শুভ চেতনা সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাক।

চঞ্চল অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। কোন অতলে সে তলিয়ে যাচ্ছে। কালো অতলান্ত অন্ধকার। নিজের সব জ্বালাটা তীব্র আভায় জ্বলে উঠে তাকেই পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

সে হেরে গেছে। ক্লান্ত পরাজিত-স্তব্ধ একটি হারানো মানুষ। সব প্রতিবাদ

সব বিদ্রোহ করার শক্তিটা কোন দানব তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। নিজে ভুলে গেছে। ভুলে থাকার সেই পথটাই তাকে বারবার রাতের অন্ধকারে ডাক দে দিনের আলোয় সেই পরাজিত শয়তানকে সে ঘৃণা করে। জীবনটা তার এতদি ছিল নিটোল একটি পূর্ণতা আর কাঠিন্যে ভরা। অসম্পূর্ণ সে মানুষটা দুঃসহ আঘাতে আজ পরাজিত হয়েছে।

তাই যেন সেই ধ্বংসস্তূপের মতো জীবনটাকে বয়ে বয়ে সযতনে নিজেকে লুকি লুকিয়ে পালাতে চায় সে।

রাত ভোর হয়ে আসছে। কি যেন স্বপ্ন দেখছিল চঞ্চল···কালো সেই মূর্তি গুলো তার দিকে চেয়ে হাসছে। গলার কাছে জ্বালাকর তীব্র একটা অনুভূতি।

ওদের আর সহ্য করতে পারে না সে। সব ভুলতে চায়।

মনের মাঝে তাই ঝড় ওঠে,···অতল কালো জল শুধু ফুঁসছে। ঢেউগুলো উঁ হয়ে এসে তার সামনে সশব্দে ফেটে যায়—ছিটকে ফেলে দিচ্ছে তাকে···তলিয়ে যা সে। কণ্ঠনালী ভরে যায় সেই দুর্বার জলের তোড়ে···দমবন্ধ হয়ে আসে। কত তা জানে না। তলিয়ে যাচ্ছে···সারাদেহটাকে তালগোল পাকিয়ে কোন সর্বনা রাক্ষুসী তাকে গ্রাস করে নিতে চায়। বাঁচার দুর্বার প্রচেষ্টায় একটি মানুষ সে ঝড়ের গর্জনের মাঝে কূল-তলহীন পাথারে শুধু ব্যর্থ চীৎকারের চেষ্টা করছে।

সুর ওঠে। বিচিত্র মিষ্টি একটা সুর··সেই ঝড়-কাঁপানো পৃথিবীর মা অতল থেকে জীবনের সাড়া নিয়ে জাগছে···চঞ্চলের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

না···সেই মাতন ওঠা দুঃসহ পারাবারে নয়—একটা ঘরের পরিবেশেই এ তক্তপোশে শুয়ে আছে সে। জানলার ফাঁক দিয়ে মেঘভাঙ্গা ভোরের আলোর আ ফুটে উঠেছে। কোথায় পাখী ডাকে। দিনের প্রথম পাখী। তারই সুরে সুর মিশেছে ··

চঞ্চলের জ্বালাধরানো সেই মনে ওই সুরটা ·একটা আবেশ আনে। পৃথিবী হয় সুন্দর···মানুষ তবু এত অভাব কষ্টের মাঝেও বাঁচার আনন্দ সন্ধান করে ; গান গায়···সুর ওঠে ··

সুষমা ভোর বেলাতেই গানের রেওয়াজ করতে বসে। নিষ্ঠার সঙ্গেই সে করে। ইতিমধ্যে শহরের অনেকেই তার গানের খবর জানে। শান্ত, ভদ্র মেয়েটি অতি সাধারণ বেশে সাদা-মাটা শাড়ি পরে যেতে আসতে দেখছে। গানও গায় কো অনুষ্ঠানে।

দু-দশটা পরিবারের মেয়েদের গানও শেখায়।

ভোরের আলো পড়ছে সুষমার মুখে। মিষ্টি মুখখানা···কালো কালো আ মাখা দুটো চোখ, সুরের জগতে ও যেন হারিয়ে গেছে।

মিলের বাঁশী বাজে। ভিজে মেঘলা আকাশে ওই শব্দটা একটা নিষ্ঠুর শাসন

মতো জেগে ওঠে। জীবনযাত্রার মধ্যে ওই ভোঁ-এর একটা ভূমিকা আছে। সমীর ভোরে উঠেই বের হয়ে গেছে কারখানায়। বাড়ির অনেকের ঘুম ভাঙেনি। সুষমা তবু জেগে ওঠে। দাদাকে চা করে দেয়। রাতের অবশিষ্ট দুখানা রুটি একটু গুড় দিয়ে চা খেয়ে সমীর কাজে চলে যায়।

হঠাৎ সামনে কাকে দেখে চমকে ওঠে সুষমা। এ বাড়িতে দাদা ছাড়া আর কেউ থাকতে পারে সেই কথাটা ভুলে গিয়েছিল সে।

তন্ময় হয়েই গাইছে।

মোর জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া ··

হঠাৎ সামনে চঞ্চলকে দেখে অবাক হয়! সুন্দর শান্ত একটি তরুণ, দুচোখে ওর মুগ্ধ বিস্ময়···সুষমা নিজের কাপড়-চোপড় সামলে নেয়। গানের সময় তার নিজের দিকে চাইবার খেয়ালও ছিল না। সে চঞ্চলের দুচোখের সেই শান্ত খুশীখুশী ভাবটুকু দেখেছে। কেমন যেন ভালো লাগে এইটুকু। গান থামিয়ে ওর দিকে চাইল সুষমা। তার অজান্তেই ওর মিষ্টি ঠোঁটে হাসির আভাস জাগে।

—উঠেছেন ?

চঞ্চল বলে—থামলেন কেন ? সুন্দর গাইছিলেন। বহুদিন এত ভালো গান শুনি নি।

মোর জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া
মাধুরী করেছো দান

আপন মনেই ওই গানের লাইন কটা বিড় বিড় করে আওড়ায় সে। ওই কথাগুলোর একটা অর্থ আছে। জীবনপাত্র তার কী বেদনার গ্লানিতে পরিপূর্ণ। সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। জীবনে তার শুধু বুক জোড়া গ্লানি আর কালিমাই সব ছাপিয়ে উঠেছে···কি দুঃসহ জ্বালায় সে জ্বলছে।

ওই কথাগুলো অন্য সময় শুনলে হাসতো চঞ্চল। অবিশ্বাসের হাসিতে সব উড়িয়ে দিতো। কিন্তু আজ এমনি একটা সকালের প্রথম জাগা মেঘভাঙ্গা আলোয় মনে হয় সব দুর্বার ঝড়েরও শেষ আছে। সেই রাতেই তার মৃত্যু ঘটেছিল, কিন্তু মরেনি সে।

পাখীগুলো বাড়ির সামনে আমগাছে কলকাকলি তুলেছে, খুশীতে ওরা কলরব করে। আকাশ কেমন গাঢ় লাল রং-এ ঘন হয়ে উঠেছে কি প্রাণের আবেগ নিয়ে। সুষমার মুখে পড়েছে সেই আলোর স্নিগ্ধ একটি আবেশ।

চঞ্চল একদিন যাদের দেখেছে রাতের আবছা অন্ধকারে··যাদের উন্মাদ লালসার মাঝে নিজের তৃপ্তির ব্যর্থ সন্ধান করেছে, সুষমা তাদের শ্রেণীর নয়। সকালের শিশির-ধোয়া ফুলের মতো প্রসন্নতা ওকে ঘিরে ফুটেছে শুচিতার একটি আবেশ নিয়ে।

সুষমা ওর মনের এই সদ্য জাগর একটি আবেশের খবর রাখে না ওই চাহনিতে একটু লজ্জা বোধ করে, 'আপনার চা নিয়ে আসি'।

চঞ্চল চুপ করে রইল। মনে হয় কি একটা ভুল করে বসেছে ওর দিকে অমা করে চেয়ে। ওরা সেই চাহনিকে ঠিক পছন্দ করে না হয়তো। বাড়ির পরিবে ভাই-বোন-এর সম্পর্ক সম্বন্ধে তার সঠিক ধারণা নেই। কল্যাণীও উঠে পড়ে আগেই। হরিপদবাবুর কাশির শব্দ ওঠে ঘরের মধ্যে···একটা কর্কশ ধাতব শব্দ।

ছেলেমেয়েরাও উঠে হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসেছে। চঞ্চল সকালের আলো এদের সংসারটুকুকে দেখছে।

দারিদ্র্য আর অভাব এখানে আছে। অনুমান করতে পারে একজনের রোজকারে সংসার চলে। ছোট ভাই তিমির আর প্রবীর পড়ছে। ওদিকে প্রতিমা ঘুমভাঙ চোখে নবাগত চঞ্চলের দিকে চেয়ে থাকে।

চঞ্চল এসে সমীরের ছোট্ট ঘরখানায় ঢোকে।

ওপাশের কাঠের আলমারিতে পুরোনো ইংরাজী বই, সবই বেদুইন—পেলিকা —জয়কো সিরিজের সস্তা দামে কেনা বই, দু-একটা মাসিক, সাপ্তাহিকও রয়েছে দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি···তাতে বিবর্ণ একটা মালা ঝুলছে··ফুলদানি আছে ওকোণে একটা টি-পয়ে, ফুল নেই।

সারা ঘরখানায় তবু একটা রুচির পরিচয় মেলে। চঞ্চল কি ভেবে একটা ব টেনে নেয়। কাম্যুর একটা ছোট্ট বই।

—আপনার চা!

সুষমাই চা নিয়ে আসে। একটা প্লেটে দুখানা বিস্কুট আর চা। চঞ্চলের মনে হয় এ বাড়িতে সে এদের অন্নেই ভাগ বসাচ্ছে, সে অন্ন কত কষ্টে সংগৃহীত ত অনুমান করতে পারে। কিন্তু কোথায় যাবে জানে না। একটা সুটকেসে তা জামা-কাপড় কিছু সঞ্চিত টাকাও ছিল। সবই কাল গঙ্গার গর্ভে তলিয়ে গেছে একেবারে একবস্ত্রে এখানে এসে উঠেছে। তবু বলে চঞ্চল—

—আজই চলে যাবো ভাবছি।

চঞ্চল ওর মুখের দিকে চাইল। সুষমার ঠোঁট দুটো চকিতের জন্য যেন কেঁপে গেল। একটু অবাক হয় চঞ্চল ওর এই ক্ষণিক ভাবান্তরে। পরক্ষণেই বলে সুষমা।

—চলে যাবেন? কিন্তু দাদা বলে গেছেন—আপনি থাকবেন। দাদা আসুক —কাপটা নিয়ে বের হয়ে যাবার মুখে বলে সুষমা—

—আমরা তো গরীব। অসুবিধা হচ্ছে নিশ্চয়ই···

—না, না। কথাটা অন্তর থেকেই বলে চঞ্চল··সুষমা তখন চলে গেছে।

নিজের এমনি আবেগ জড়ানো নিজের কাছেই বিচিত্র ঠেকে চঞ্চলের। এতকাল ঠকেছে, ঠকিয়েছে অপরকে। অভিনয় করেছে ভালোবাসার, তার নাম দিয়ে শুধু পশু-প্রবৃত্তিটাকেই লালন পালন করেছে।

আজ তার এই কণ্ঠস্বর তার নিজের কাছেই বিচিত্র ঠেকে—এ যেন অন্য আবেগ জড়ানো মানুষের কণ্ঠস্বর।

বোধ হয় সুষমা গানের ক্লাস নিচ্ছে বাড়িতে।

দু-দশ টাকা এতেও রোজকার হয়। গানের সুর ওঠে। কাসির শব্দ শোনা । হরিপদবাবুর। ওই জরাজীর্ণ লোকটা কোনরকমে ধীরে ধীরে হেঁটে এসে রর একদিকে রোদে বসেছে; চঞ্চল ওই জীর্ণ লোকটার দিকে চাইল। ও এখনও ত্রীর কবোষ্ণ উত্তাপস্পর্শ পেতে চায়, এত দুঃখের মাঝেও ও বাঁচতে চায়।

…হাসি আসে, এর নাম বাঁচা!

চুপ করে গেল নিজের কথা ভেবে। হরিপদবাবুর তবু সংসার আছে। ছেলে জকার করছে, বাড়িও আছে একটু। আর তার…বিতাড়িত গৃহহারা—আশাহারা টি জীব। জীবনের পাঁকই মেখেছে।

বারবার সেও কাল রাত্রে গঙ্গার বুকে মৃত্যুর সেই বীভৎস মূর্তিটা দেখে শিউরে ঠছিল। ভয় পেয়েছিল। বাঁচবার চেষ্টা করেছিল নির্লজ্জের মতো। আবার গলের আলোয় সে খুশীর আবেশও ফিরে পায়।

ওই সুষমাকে দেখে ভাল লাগে।

হাসছে চঞ্চল—বাঁচার এই কাঙ্গালপনা দেখে। উৎকর্ণ হয়ে তাই বোধ হয় ওই ন শুনছে সে।

…সমীর দুপুরে বাড়ি ফিরেছে কারখানা থেকে।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সে। কাল রাত্রির ধকলটা এখনও মুছে যায় নি শরীর থেকে। বার জন্য ফেরার পথে একটু দই নিয়ে আসে। পেট গরমের রুগী। তাছাড়া স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা-সেটা খাবার লোভও বেড়েছে, কিন্তু মাপা পয়সায় তার ই শখ সব দিন মিটাতে পারে না সমীর।

হরিপদবাবু নিজের দেহের মনের জোর হারিয়ে আজ দেবতার উপরই সব র্ভর করে বসে আছেন। জীবনে এতটা বছর কেটেছে—জ্ঞানতঃ অন্যায় করেননি। াভ যদিও হয়েছিল—সেটাকে প্রশ্রয় দেন নি। নইলে চটকলের খাতাবাবুর কিছু পরি পাওনা মেলে একটু উঞ্ছবৃত্তি করলে—সেটা করেননি তাই বোধ হয় এই ল। তবু বলেন বুঝলে সমীরের মা, অন্যায় আমি করিনি। তাই এত কষ্টেও ন ঠিক চলে যাচ্ছে। ধর্ম ঠিকই আছে।

কথাটা কানে আসতে চঞ্চল মনে মনে হেসেছিল ওদের সেকেলে ধারণায়।

বুড়ো হরিদাসবাবু তবু স্নান করে পুজো-আহ্নিক করতে বসেন।

ঠাকুর নামক কোন এক স্বর্গলোকবাসী অসীম শক্তিসম্পন্ন প্রাণীদের এটা যেন াসামুদি করারই নামান্তর।

চঞ্চলের ভালো লাগেনা বুড়োর ওই ধর্মের ভড়ংগুলো। নামাবলী গায়ে জড়িয়ে াঙ্গা গলায় ঘণ্টাখানেক স্তোত্র পাঠ করে চলেছে।

ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেছে। সুষমা আর ওর মা দুজনে কলাই বেটে বড়ি চ্ছে। ওতে বোধ হয় তরকারীর কিছুটা সাশ্রয় হয়। সুষমাকে দেখেছে স্নান

সেরে একটা আকাশী রংএর শাড়ি পরেছে, মাথার একরাশ চুল খোলা—নীল শাড়ির উপর ওই কালো চুলগুলো দেখে মনে হয় যে নীল আকাশে কালো মেঘ জমেছে··· পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ।

—কেমন আছো ভায়া! দেখলাম তো স-টান ঘুমুচ্ছো! না ডেকেই বের হয়ে গেলাম। জানো তো শ্যামের বাঁশী বাজলে চটকলের ইস্তক বাবু মজুর ফিটার চিতার থেকেও উঠে স-টান চলে আসবে মিল গেটে।

সমীর কলরব করে বাড়ি ঢুকছে।···মা ছেলের দিকে চাইল। সুষমা কলাইবাটা মাখা হাতটা ধোবার জন্য উঠে পড়ে। হাত ধুয়েই একটা পাখা নিয়ে আসে।

—দে ওটা!

সুষমা নিজেই বাতাস করতো পাখাটা ওর হাত থেকে না নিলে, সমীর পাখা করছে। সুষমা বের হয়ে যায় যন্ত্রচালিতের মতো, কাঁচের গ্লাসে পাতিলেবুর জল এনে দেয়। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল সমীরের। গ্লাসটা নিয়ে এক নিঃশ্বাসে শেষ করে একটা তৃপ্তির অস্ফুট শব্দ করে বসল।

সব ব্যাপারটাই দেখছে চঞ্চল! তাকে এমনি করে কেউ যত্ন করে নি কেউ তার পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করেনি। ঘর বাঁধার এই প্রতীক্ষা আর তৃপ্তির স্বাদটুকু সে তার সামনে আর একজনকে পেতে দেখে মনে মনে যেন হিংসা করে। সুষমার সেবাপরায়ণা শান্ত-মধুর রূপটি তার চোখে কি অপরূপ রূপে দেখা দেয়। নীরব এই রূপকে সে এর আগে দেখে নি।

সমীর চঞ্চলের মনের এই খবরটা জানে না। চঞ্চলও অবাক হয় একটা মানুষকে ঘরে এনে তুলেছে, তার পরিচয়, প্রকৃতি কোন কিছুরই খবর নেবার প্রয়োজন বোধ করে নি ওরা। এই বিশ্বাসটুকু আন্তরিক না শুধুমাত্র মুখোস তা ঠিক অনুমান করতে পারে না। তবে যে নিঃস্বার্থ সেটা বুঝেছে চঞ্চল। তার তো টাকা পয়সা কিছুই নেই।

তবু সমীরকে আরও বিস্ময় বলেই মানে চঞ্চল। খেতে বসেছে দু'জনে। হরিপদবাবু একবার এসে দাঁড়ালেন। বলেন—

—গরীবের ঘর, ঠাকুর দয়া করে যা জোটান তাই দিয়েই দিন চালাই।

সমীরই কথায় কথায় চঞ্চলের রুদ্ধমনের সেই আগলটা খুলে ফেলে। নিরাশ্রয় একটি যুবক। পথে পথেই আস্তানা। চাকরির সন্ধানে এই দিকে আসছিল—এই দিক্‌কার কোন স্কুলে চাকরি করার ঠিক হয়েছিল।

সমীর চেনে ওই স্কুলের সেক্রেটারীকে। হেডমাস্টার মশায় ওই সদানন্দবাবুও তার খুব চেনা। বলে ওঠে সমীর।

—এই কথা। ভালোই হয়েছে ব্রাদার। আমাদেরই স্কুল, ওখান থেকেই পাশ করেছিলাম। সদানন্দবাবুর কাছে চল। আজই বৈকালে।

কল্যাণীও খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়। তবু তার সংসারের একটা বোঝা কমবে।

—দুদিন একটা লোককে আজকালকার বাজারে রেখে খাওয়ানো কি মুখের
া। তবু কল্যাণী সমীরের কথা শুনে একটু অখুশী হয়। সমীর বলে—
—কোথায় আর থাকবে? কদিন এইখানে থাকো। চাকরির ঠিক হয়ে যাক
ন না হয় একটা মেসটেস-এর ব্যবস্থা করে দেব। চটকলের বাবুদের একটা মেস
ছে এই দিকেই। মন্দ হবে না।

চঞ্চল কি ভাবছে। এখানের স্কুলের চাকরিটা যদি হয়ে যায় ভালোই হবে।
·· এখানের কি যেন একটা আকর্ষণ আছে···নতুন একটা স্বপ্ন তার মনে আবেশ
য় জেগেছে।

দুপুরের গেরুয়া রোদে এই গাছ-গাছালি···ছায়াঘন পুকুরের কালো জল···ওই
জ মাঠটুকু···ভালো লাগে। এটা চোখের বাহ্যিক ভালো লাগা।

রুক্ষ জ্বালাধরা মনের অতলে একজনের একটু আবেশময় চাহনি ওই সুগঠন
হের ছন্দ কি সাড়া এনেছে, চোখের দেখা সম্পদ এ নয়, ওর মনে হয় এই সব কিছু
লয়ে নতুন শান্তির স্বাদে তার সব চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

সদানন্দবাবু বহুকাল এখানেই রয়ে গেছেন। তখন এটা ছিল গণ্ডগ্রাম। গঙ্গার
ক আসত দেশ-বিদেশের গঞ্জের নৌকা মালপত্র নিয়ে। সেইটাই ছিল আসল
াজ্যের স্থান। রেল ছিল। স্কুলটা টিমটিম করতো। তিনিই এ এলাকায় এসে
টারি সুরু করেন।

সেদিন তিনি ছিলেন আদর্শবাদী, অগ্নিমন্ত্রে বিশ্বাসী। এখানের পটভূমিকায়
ধীনতা আন্দোলনের যেটুকু সূচনা হয়েছিল তার পুরোধা ছিলেন এই
নন্দবাবুই।

ক্রমশঃ দিন বদলেছে। সদানন্দবাবুর দেহের সেই যৌবন প্রবাহ গঙ্গার স্রোতের
াই হারিয়ে গেছে। এসেছে বার্ধক্যের ছাপ। হাসি-খুশী সেই সদানন্দময়
ুষটির অন্তর বিশেষ বদলায় নি। মনে হয় মনের দিক থেকে আজ তিনি
থায় ঘা খেয়েছেন।

সদানন্দবাবু স্কুলের লাগোয়া একটা পুরানো বাড়ির দোতলায় থাকেন। একা
ুষ। তবু ক'খানা ঘর ছড়ানো আছে বই খাতা কাগজ-পত্র। তারই মধ্যে ছোট্ট
পোশে একটা সতরঞ্চির উপর চাদর পাতা, ময়লা তেলচিটকেনি বালিশটার ওয়াড়
া ছিল তা আর জানা যায় না, কোন রকমে চাদরের নীচে দিয়ে ওটাকে বালিশে
াণত করা হয় মাত্র। দড়ির আলনায় একটা গলা-বন্ধ কোট, ছাতা আর পাঞ্জাবী
াধময়লা থানধুতি ঝুলেছে।

স্কুলের দপ্তরী মুড়িরামের থাকার জায়গা নেই কোথাও। দূর গ্রামে বাড়ি,
কও ঠাঁই দিয়েছেন সদানন্দবাবু। সেই দুবেলা যা হয় রেঁধে নেয় দুজনের জন্য।

সদানন্দবাবু জানালার বাহিরে চেয়ে আছেন। একটা ট্রেন দূর থেকে এসেছে,
ছে স্টেশনে। প্লাটফর্মে দেখা যায় খাকি-পোশাক পরা পুলিস, ছাই রং-এর

জামা পরা হোমগার্ডদের ভিড়। রেশনিং এলাকা কড়া-পাহারা দিয়ে রেখেছে, চাল ঢুকতে দেবে না।

ট্রেনটা হোম-সিগন্যালের কাছে দাঁড়িয়ে গেছে। বাঁশীর শব্দ তুলে সে যেন কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করে বলছে: তাকে জোর করে থামানো হয়েছে।

ট্রেন থেকে ছেলে-মেয়েদের দল পিলপিল করে নামছে। লাইনের ওদিক থেকে একটা ইলেকট্রিক ট্রেন বাজিয়ে ছুটে আসছে। ওই ছেলেমেয়েগুলোর দিক্‌-বিদিক জ্ঞান নেই, বগলে চালের পুঁটুলি নিয়ে ওরা দৌড়চ্ছে। প্রাণ ভয়ে তাদের প্রাণের চেয়ে দামী এই চাল যেন খোয়া না যায়। এই তাদের মূলধন। বাজারে, গঞ্জে মহাজনদের ওখানে জমা পড়বে দু'শ, এক'শ মণ চাল, পয়সা নিয়ে তারা আবার পরের ট্রেনে পাড়ি জমাবে···বর্ধমান পার হয়ে খানা, গুস্‌করার দিকে।

স্কুলের অনেক ছেলেও এই কাজে নেমেছে। তাদের আর কোন ভবিষ্যৎ নেই—একটি নতুন জাত গড়ে উঠছে স্মাগ্‌লার। কেউ যায় বনগাঁর দিকে।—পাকিস্থানের থেকেও মাল আনে তারা—একটু বনেদী কারবারী, এদের শিক্ষানবিশী সুরু হয় এই চাল দিয়ে।

রাতের অন্ধকারে পথে-ঘাটে তিনি দেখেছেন পচে যাওয়া সমাজের দগ্‌দগে সেই ঘাগুলোকে। এককালে সেই নোংরামির সীমানা নির্ধারিত ছিল। সেখানে যাদের যাতায়াত ছিল তাদের দেখলেই চেনা যেত। মদ্যপ অবস্থায় চটকলের কুলি, না হয় মজুর বা নৌকার মাঝিরা—সেদিকে ভিড় জমাতো, হৈ চৈ করতো মাতাল অবস্থায়।

এখন পথে ঘাটে সেই বিশ্রী দৃশ্যগুলো চোখে পড়ে। এ নিয়ে সব সমাজেই বেসাতি সুরু হয়ে গেছে। নারীদেহ আজ পণ্যে পরিণত হয়েছে। রাতের অন্ধকারে পথে, গঙ্গার ঘাটে নির্জনে বসেছে সেই নটীহাটের ভিড়।

মানুষগুলো যেমন বদলে গেছে, বদলে যাবে আগামী দিনের সমাজ। কেমন হতাশার অন্ধকারে তার সব চিন্তাধারা আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

এই কি স্বাধীনতার পরিণতি? এমনি ছবি তাঁরা কোনদিন কল্পনা করেন নি। এমনি অবস্থায় পরিণত হবে সারা সমাজ এ বুঝতে পারলে ক্ষুদিরাম, বিনয়, বাদল, দিনেশ-এর দল হয়তো বৃথাই রক্ত ক্ষয় করতে যেতেন না—দেশত্যাগী সর্বত্যাগী হতেন না সুভাষচন্দ্র। তাদের পূর্ব-পুরুষের সব সাধনা, আত্মত্যাগকে আমরা নিঃশেষ ব্যর্থতায় পরিণত করেছি।

ট্রেনের থেকে নেমে সেই স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক দল চালের পুঁটুলি নিয়ে দৌড়চ্ছে। পিছনে তাড়া করে আসছে পুলিস হোমগার্ড-এর দল। ওরাও দৌড়চ্ছে, দু চারটি ছেলের মাল অন্যজন বয়ে নিয়ে যায়। সেই খালিহাত ছেলেগুলো একটা পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে কর্তব্যরত এই রক্ষীবাহিনীর উদ্দেশে অঙ্গভঙ্গী করে অশ্লীল ইঙ্গিত করছে, কেউবা লাইনের দু একটা খোয়া ছুঁড়ছে।

ভাবখানা ওরা এই পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দরকার হলে শহীদও হতে পারে। আগামী যুগের সর্বত্যাগী শহীদের দল হবে ওই চাল স্মাগলারের দল!

পায়ের শব্দে মুখ ফিরে চাইলেন সদানন্দবাবু। সমীর সঙ্গে একটি সুন্দর তরুণকে নিয়ে ঢুকছে।

—আসবো স্যার?

—এসো। সদানন্দবাবু চেয়ে দেখছেন ওদের দুজনকে।

সমীরকে তাঁর ভাল লাগে। ভালো ছাত্র ছিল—পড়াশোনাতেও ভালো। তেমনি চৌকস ছিল খেলাধুলোয়, আর তেমনি বিনয়ী, ভদ্র। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হয় নি। সে সংসারের চাপে লেখাপড়ায় বেশী দূর এগোতে পারে নি। বাবা, মা, ভাই-বোনদের বোঝা টানছে মুখ বুজে। নিজের ভবিষ্যতকে পর্যন্ত সে ত্যাগ করেছে অসঙ্কোচে। ও স্বার্থপর নয়। মানুষের সেই চিরন্তন গুণগুলোর কিছু অবশেষ তবুও এই ধ্বংসের মাঝে টিকে আছে। ওরা পরের জন্য দুঃখ বোধ করে।—তাই ওদের স্পর্শকাতর মন শুধু বেদনাই পাবে।

—কি ব্যাপার সমীর! ইনি?

সমীর কাল রাত্রির ঘটনাটা বর্ণনা করে।

দেখছে চঞ্চল ঐ বৃদ্ধ মানুষটিকে। একরাশ দাড়িগোঁফের আড়ালে দুটো বুদ্ধি-দৃপ্ত চোখ ওই কথাগুলো শুনে খুশিতে ঝকমক্ করে ওঠে।

সদানন্দবাবুরও ভালো লেগেছে চঞ্চলকে। শুষ্ক মুখে-চোখে একটা শাণিত দীপ্তি ফুটে ওঠে। সদানন্দবাবু বলেন—

—কালই স্কুলে এসো তুমি। প্রেসিডেণ্টকে বলে রাখবো। তবে জানতো শিক্ষকতার পথে অন্ন নেই। পারবে তো কষ্ট সহ্য করতে? আমার মনে হয় কি জানো…এই ভাঙ্গনের দিনে কিছু আদর্শ শিক্ষকেরও প্রয়োজন। বুনো রামনাথ থেকে স্যার আশুতোষ পর্যন্ত সেই ধারা এসে গেছে, তারপরই হারিয়ে গেছে। তুমি আদর্শে বিশ্বাস করো?

‥চঞ্চল ওঁর কথাগুলো শুনছে। নিজের জীবনের সব কোণ হাতড়ে আজ ওর জবাব মেলে না। আদর্শ! সে তো কই চোখের সামনে তেমন কেউ দেখে নি, চারপাশে যাদের দেখছে তারা কপট-ভণ্ড-লম্পট-মদ্যপ, নারীসঙ্গ-লোলুপ। কই সর্বত্যাগী, কল্যাণকামী কাউকে তো মনে পড়ে না! তাছাড়া আদর্শের আজ দাম কি? চারিদিকে শুধু ভাঙ্গন আর ভাঙ্গন। সমাজের সর্বস্তরে। একদিন যেটা ছিল ন্যায়, নীতি—আজ সেটা বাতিল হয়ে গেছে শুধুমাত্র বাঁচার তাগিদে।

বাইরে সেই চালওয়ালীদের কলরব ওঠে। ওরা বেড়া টপকে দল বেঁধে বাজারের মহাজনের গদীতে চলেছে। যে কারণেই হোক রেলপুলিসের সেই অভিযান ব্যর্থ হয়ে গেছে। তারা থেমে গেছে।

সদানন্দবাবু হাসেন। মলিন বিষণ্ণ হাসি।

—চাল নিয়ে এমনি সমস্যা—হাহাকার এর আগে ছিল না। তাই মানুষ সেদিন এই নিয়ে নীচতার পথে নামেন নি। আজ মুখের গ্রাস মানুষের অন্ন-বস্ত্র এমনকি দেহ পর্যন্ত বেসাতির পণ্য হয়ে উঠেছে। তাই মানুষ আজ পথে এসে দাঁড়িয়েছে। ধাপেধাপে জানোয়ারে পরিণত হতে চলেছে। মনুষ্যত্বের এতবড় বিপর্যয় কোনদিনই আসে নি চঞ্চল। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের কোথাও এই দৃশ্য চোখে পড়বে না—পড়ে নি আমার।

সমীর চুপ করে থাকে। চঞ্চল হাসছে মুখটিপে।

এ ধরনের নীতিসর্বস্ব অনেক লোককে এই পথে সে দেখেছে। ওদের করার কোন সাধ্য নেই, আছে শুধু বচন। কথা বল্লেই কথা বাড়বে। তাছাড়া চঞ্চলের আজ একটা আশ্রয়—কিছু অর্থের প্রয়োজন। একটা চাকরি তার চাই।

তাই বোধহয় চুপ করেই ওঁর কথাগুলো শোনে। সদানন্দবাবু ওকে অভয় দেন।

সমীর আর সে ফিরছে বাড়ির দিকে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নামছে গাছ-গাছালির বুকে। এদিকটা এখনও সবুজ আছে। ও-পাশে গঙ্গার দিকে মাথা তুলেছে জুটমিলের বিরাট সেড—চিমনিগুলো। কারা ঝক্‌ঝকে গাড়ি হাঁকিয়ে যাতায়াত করে···দু একটা গাড়ির ভিতরে সুন্দরী মেয়ে-মানুষও রয়েছে। ওদের উপ্‌ছে পড়া হাসির শব্দ নির্জন পথটাকে চকিতের জন্য মুখর করে তোলে। চঞ্চল ওই দিকে চেয়ে থাকে। হাসির উছল-ঝলমল জীবন।

অভাব নেই, ভোগবিলাসের প্রাচুর্য ওদের জীবনে। নিজের কথাটা মনে হয়··· আদর্শ—দেশসেবা ! কাদের সেবা করবে—কেনই বা করবে তা ঠিক করতে পারে না।

সমীর বলে—কেমন লাগলো মাস্টারমশায়কে ? আইডিয়াল লোক।

হাসে চঞ্চল। ওই ভুয়ো আদর্শবাদ আর দেশের বিপর্যয়ের কথা ভাবা আজ সেকেলে ফ্যাসান হয়ে উঠেছে। এই যুগের পথধারা—নানা ঘাত-প্রতিঘাতে একটা নিজস্ব পথেই চলবে। কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। মানুষকে বাঁচতে হলে ওই পথ এবং মতের সঙ্গে মানিয়ে তাকে চলতে হবে। তাই বলে চঞ্চল—

—বড্ড সেকেলে। তবে নিরীহ—বোকা বোকা মানুষ উনি।

চমকে ওঠে সমীর। ওর দিকে চাইল। ওর চোখের চাহনিতে একটা বিস্ময় এবং ঘৃণার আভাস জাগে। চঞ্চলও জানে ও আঘাত দিয়েছে সমীরকে। তাই বলে—

—আপনি ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করেন। আমিও করি তবে এ যুগের কথা বললেন কিনা—এই আদর্শের কথা, তাই মনে হল, আঘাত দেবার জন্য ওটা বলি নি।

সমীর চুপ করে পথ চলে। চঞ্চলের জন্য তার দুঃখ হয়। ও বোধ হয় এই মানুষটার ইতিহাসটা জানে না, ওরা ইতিহাস, পারিপার্শ্বিকের কোন দাম দেয় না —শুধু বর্তমানটুকু নিয়েই ওরা খুশী থাকে। তাই রায় দেয়। সমীর বলে—

—এ ভুল আপনার···ভাঙবে তোমার একদিন।

চঞ্চল হাসে মাত্র।

চঞ্চলের স্কুলের চাকরিটা হয়ে যায় সদানন্দবাবুর কথাতেই। চঞ্চল পায়ের নীচে আপাততঃ মাটি পেয়েছে। এই ভেসে বেড়ানো জীবনে এসেছে ক্লান্তি। কিন্তু তার সামর্থ্য নেই। নিজের একক নিঃসঙ্গ জীবনে আর রুচি নেই।

ক'দিন সমীরদের ওখানেই থাকতে হয়েছিল। সমীরের মা, হরিপদবাবুও বলেন।

—সামনের মাস থেকেই মেসে যাবে, তার আগে তো সিট পাবে না।

সমীর বলছিল—থাকলেই বা এখানে ?

চঞ্চলের মন্দ লাগে নি এই বাড়ির জীবন...তার শূন্য জ্বালাময় একক নিঃসঙ্গ জীবনের তুলনায় এখানে তবু শান্তি আছে। সুবীর প্রবীরকেও সন্ধ্যার সময় পড়াতে বসতো।

···সুষমার গানের সুর ওঠে রাতের অন্ধকারে। তারার জলসা বসেছে আকাশ কোলে··বাতাসে ভেসে আসে মাঠের দিক থেকে বুনো ফুলের সুবাস। কখনও শাসনের সুরে চটকলের ভোঁটা বেজে ওঠে। রাত নামে।

সমীরের ক'দিন নাইটে শিপ্‌টে ডিউটি পড়েছে। খেয়ে দেয়ে বের হয়ে যায়। চঞ্চল এ বাড়ির মাঝে আর একটি জায়গায় যেন কোন অদৃশ্য বাঁধনে আটকে পড়েছে।

সুষমা এমনিতে কথাবার্তা কম বলে। প্রতিমার মত এত মুখরা—হাস্যময়ী সে নয়। কালো ডাগর দুচোখে অতলান্ত মনের সংবেদনময় স্পর্শ আনা একটু চাহনি।

বাবা মায়ের কথাগুলো সে শুনেছে। চঞ্চলের চাকরি হয়ে গেছে—মেসে চলে যাবে। কয়েকদিনেই সুষমা ওই ছন্নছাড়া মানুষটিকে কেমন বিচিত্র চোখে দেখে। তার জীবনে কোথায় একটা আতঙ্ক রয়ে গেছে। বৈদ্যবাটির কালো গোলগাল টাকপড়া চেহারার মানুষটার কথাই মনে পড়ে। কেমন ভয় করে। অজানা আতঙ্ক। মনে হয় ওকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে ওরা আটকে রাখবে। তার গানের এই চর্চা এর স্পর্শ-মধুর দিনগুলো হারিয়ে যাবে নিঃশেষে।

বারবার প্রতিবাদ করতে চেয়েছে কিন্তু পারে নি। জানে তার বাবার অসুখের কথা···অসহায় একটি মানুষ। দাদা কত কষ্টে সংসার চালায়···তাদের পক্ষে তার জন্য ওই পাত্রই যোগাড় করা দায়। সুষমার মন তবু এ বিয়েতে সায় দেয় নি।

চঞ্চলকে দেখেছে। ওই সুন্দর যুবকটি তার রঙ্গীন মনে কোথায় একটা নীরব আলোড়ন এনেছে··ভয় হয় সুষমার। তাই যেন এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে। তবু মন মানে না।

বাড়িটায় স্তব্ধতা নেমেছে। রাতের অন্ধকারে স্টেশনের দিক থেকে কোন ট্রেন আসার শব্দ ওঠে। চঞ্চলের সেই চিরব্যাকুল নেশাগ্রস্থ মন ক'দিন একটা আর নতুন পরিবেশে এসে বদলে গিয়েছিল। কিন্তু চঞ্চলের মনে হয় এটা সাময়িক। এমনি

রাতের অন্ধকারে তার মনের অতলে কোন দ্বিতীয় সত্ত্বা জেগে ওঠে। সেই চাপা পড়া জানোয়ারটা অদৃশ হাতের আঁচড়ে তার অন্তর মন রক্তাক্ত করে দেয়।

শিরা উপশিরায় রক্তের স্তিমিত প্রবাহ চঞ্চল হয়ে ওঠে হঠাৎ। তবু এ সবকে ভুলে থাকায় চেষ্টা করে চঞ্চল। জীবনে স্তরে স্তরে তার সারা অন্তর-মনে চোখের দেখা, পথের দুদিকে দেখেছে—কত বিচিত্র মানুষ তাদের কামনা বাসনাকে—ওরা কি দুর্বার জ্বালায় জ্বলছে, কেউ হাউয়ের মতো আকাশকোলে ওঠে কি চকিত প্রদীপ্ত শিখায়, আবার নিভে যায়—ফুরিয়ে যায়। কেউ পুড়ে পুড়ে ছাই হয়।

একথা ভাবে নি এমনি করে চঞ্চল। সুষমাই তার মনের সেই অবচেতন কোমল একটু ঠাঁইকে ভাববার অবকাশ দিয়ে, মনের সুপ্ত সুরেলা কামনা—তার বহিঃপ্রকাশের আগে নিজেকে রূপে রসে বর্ণে—বর্ণময়, রূপময় করে তোলে। তার প্রস্তুতি জাগে মনে মনে। ফুল নিজেকে সযতনে ফুটিয়ে তোলে পথিক ভ্রমরকে আমন্ত্রণ জানাতে এ যেন সেই আমন্ত্রণেরই প্রতীক্ষা।

চঞ্চল কি খেয়ালবশেই অতীতের একটা করুণ ব্যর্থ স্মৃতির রোমন্থন করে চলেছে। লিখতে মন্দ লাগে না। মায়ের কথা—তার সেই নৃশংস বাবার কথা···সেই ফেলে আসা বাড়িটার কথাই বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই কথাগুলো—সেই অব্যক্ত বেদনাই তাকে দুর্বার যন্ত্রণায় ব্যাকুল করে তুলেছে। কথাগুলো অতিসহজেই কাগজের উপর ফুটে চলেছে, একটার পর একটা।

কি মুক্তির স্পর্শ পেয়েছে সে! নিজের অন্তরের বেদনার গুরুভার সে কমাতে পারবে, সেই অন্ধ-মাতাল করা দুর্বার একটা সত্ত্বার তাড়নেই।

সে লিখে চলেছে। বিচিত্র একটা অনুভূতি জাগে মনের অতলে, আসে তৃপ্তির স্পর্শ। কোন অপরূপা অ-ধরা প্রেয়সী তার কোমল পেলব কামনামদির দেহের কঠিন আবেদনে তাকে যেন জড়িয়ে ধরে কোন তৃপ্তিসায়রের দিকে নিয়ে চলেছে। শরীরে রোমাঞ্চ জাগে।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল চঞ্চল। সামনে দাঁড়িয়ে তার সদ্যজাগরমনের কল্পনার মূর্তরূপ। সুষমার ডাগর দুচোখে বিস্ময়।

—লিখছেন? আপনি বুঝি লেখেন?

লজ্জায় পড়ে চঞ্চল। আজ তার এই নতুন পরিচয় তার কাছে বিস্ময়ের। ওর সামনে সেই-টা ধরা পড়ে যেতে লজ্জাও পায়। তাই বলে—

—এমন কিছু নয়। বসে কি আর করবো তাই—

সুষমা নিজে গান গায়। এ গান সে সুরু করেছিল তার অন্তরের কি তাগিদে।··এত অভাব কষ্টের মাঝে ওই গানই তার মনে কি সাহস এনেছে, এই দুঃখকে সইবার।··তার বদ্ধ-জীবনে এই সুর এনেছে মুক্তির আশ্বাস।··বলে সুষমা।

—ভালো তো। দেখে মনে হয় অনেক কিছুই দুঃখ বেদনা আপনার জীবনে

আছে। অনেক দেখেছেন, চোখ আছে। সেই সব মানুষগুলোর কথাও বলুন। ও-পথ খ্যাতির পথ—সৃষ্টির পথ।

চঞ্চল ওর কথাগুলো সারা মন দিয়ে শোনে। কান পেতে শোনে। ভেবেছিল তার এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় ও হাসবে। কিন্তু সুষমার মুখে চোখে নীরব সমবেদনা আর শ্রদ্ধার স্পর্শ। ওর দু চোখের আভায় চঞ্চল যেন কি পথের সন্ধান পায়।

—পারবো? চঞ্চলের ব্যাকুল অন্তর যেন ওর কাছে আশ্বাস চাইছে, উৎসাহ।

—নিশ্চয়ই, কেন পারবেন না?

চঞ্চল মনে মনে আজ জোর পায়। অনেকখানি হালকা হয়েছে সে। নিজের মনের সেই জ্বালা সব ঝড়কে ওই লেখার মধ্যে ব্যক্ত করে সে ভার মুক্ত—আনন্দিত, সার্থক হতে চায়। চঞ্চল বলে—

—মাঝে মাঝে মনে হয় বড্ড একা। অত্যন্ত অসহায় আমি।

সুষমাও অনুভব করেছে তার শিল্পী জীবনের একাকীত্ব। এ কল্পনার রাজ্যে জেগে থাকে হাজারো মূক নির্বাক চোখ জ্বালাভরা মানুষ আর ক্লেদাক্ত সমাজের মর্মবেদনা। শিল্পী সেই জগতের মানুষ। তাই তার জীবনেও তীব্র জ্বালা, নিঃসঙ্গ—নির্বাসিত সে এই জীবন থেকে। বলে সুষমা—

—সেই একাকীত্বের মাঝেই নিজেকে খুঁজে পায় মানুষ।

—একা নিজস্ব সেই সত্ত্বাটাকে এতদিন দেখেছে চঞ্চল। সে অমানুষ বিকৃতমনা। অন্তরের মূলে সে আদিম জৈব একটি চেতনা। সেই স্বরূপটাকে সে ভয় করে। বলে সুষমা—

—মনে হয় অতীত আর বর্তমান নয় ভবিষ্যতও আছে। সব কালিমা ছাপিয়ে সাহিত্যিক সেই সার্থক সমাজে, সার্থক মানুষের ছবি আঁকবে। তাই সে স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা। তার ব্যক্তিত্বকে আজকের গ্লানি স্পর্শ করবে না। চঞ্চল স্বপ্ন দেখে—ভবিষ্যৎ! ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল!

—হ্যাঁ। দুঃখের মধ্যেও মানুষ, সমাজ শেষ হয়ে যাবে না। সে মানুষের অধিকারে সব সুন্দরকে স্পর্শ করে বাঁচবে। এই তার কাছে পরমসত্য।

চঞ্চলের কাছে কেমন ওই কথাগুলো তালগোল পাকিয়ে যায়। এমনি করে তার জীবনের সব চরিত্রগুলো—রাতের অন্ধকারে দেখা ওই পরিত্যক্ত সমাজের মেয়েদের কথা. চটকলের মজুর গঙ্গার ঘাটে মাঝি, সাধারণ মধ্যবিত্ত, সেই কেরাণী ঐ চাল চালানদের কথা সে ভাবে নি। ঘটনাগুলোকে দেখেছে মাত্র। দেখেছে স্বামীকে তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে. বাবা মেয়েকে জোর করে রাতের অন্ধকারে ঘৃণ্য বৃত্তি অবলম্বন করতে, স্ত্রী গঙ্গারঘাটে স্বামীর মৃত্যু কামনা করেছে। কেরানীর বউ ঘোমটার আড়ালে কিছু পয়সার বিনিময়ে আর কারোও সাথে রাত্রিবাস করেছে।

সব কেবল কালো কাদায় ভর্তি। কিন্তু কই তাদের তো কোনদিনই বিচার করে

নি। আজ মনে হয় একটা নীরব হতাশা আর বেদনা মানুষকে বদলে দিয়েছে। তার এতদিনের নীতিবোধকে বিসর্জন দিতে বাধ্য করিয়েছে। কিন্তু কি অপরিসীম দুঃখের অতলে মনুষ্যত্বের এই তিলতিল অপমৃত্যু ঘটে তা দেখে নি। এই সামগ্রিক অবক্ষয়ের দুস্তর ব্যথাকে সে প্রত্যক্ষ করতে চায় নি। সে মন সেই চোখ তার ছিল না।

সারা মনে আজ ভিড় করে আসে তারা। নীরব···মৌন মূক সেই জনতার ভিড়। চঞ্চল ওদের জগতের অতলে পুঞ্জীভূত সেই বেদনাকে—অভিযোগকে প্রত্যক্ষ করেছে।

সুষমা!

রাতের স্তব্ধ অন্ধকারে একফালি চাঁদ উঠেছে। তারই ম্লান-আলো জানলার ফাঁক দিয়ে ওই ছোট্ট ঘুপসী ঘরটায় এসে কি মাধুরীতে ভরে তুলেছে···এই জীবনের বেদনার মাঝে আশ্বাস আছে—পথ আছে।

সুষমার দু চোখে কি নীরব আবেদন, মিষ্টি সুন্দর মুখখানাকে আজ নতুন করে দেখছে চঞ্চল। সেই কামনার জ্বালা আর লালসার আগুন জ্বালানোর ইঙ্গিত এতে নেই।

কি মাধুর্য আর জীবনবোধের আনন্দে সে সমুজ্জ্বল। বলে চঞ্চল—'ক'টা দিন তোমাদের এখানে এসে আমার অনেক লাভ হয়েছে। সুষমা।' সুষমার চোখে সলজ্জ ব্যাকুল একটু হাসির সৌন্দর্য্য!

'—আমিও ঠকি নি।'

বের হয়ে গেল সুষমা। আরও কি বলতে চেয়েছিল সে, কিন্তু নিজের মনেই লজ্জার আবেশ জাগে। অনেক কথাই বলে চলেছে সে—চকিতের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল চঞ্চলের সান্নিধ্যে। আজ তার নারীমনও ভালবাসতে চায়—পূর্ণ হতে চায়।

মনের সেই চিরন্তন কামনার সুর অকারণেই তার অন্তরকে কি ঐশ্বর্যে ভরিয়ে দেয়।

সব কল্পনা ছাপিয়ে এই নারীর মনে আগামী দিনের একটা ছবি ফুটে ওঠে। বৈদ্যবাটির সেই টাকওয়ালা ভদ্রলোক একটা ভিন্নপরিবেশে সে হারিয়ে যাবে। এতদিন মনে হয়েছিল সেইটাই তার মুক্তি; চঞ্চলকে দেখেছে, চিনেছে।

সেই খুশি হবার স্বপ্নটা তার কাছে কেমন মিথ্যা বলেই মনে হয়েছে। কি অচ্ছেদ্য বাঁধনে সে জড়িয়ে গেল। তার মুক্তির পথ রয়ে গেল অন্যদিকে। একি এক নতুন জ্বালায় জড়িয়ে পড়েছে সুষমা তার অজানতেই। নিজের কাছেই এটা রহস্য বলে বোধ হয়।

চঞ্চল নিজের একটা আস্তানা খুঁজে নিয়েছে। খুঁজে দিয়েছে সমীরই। গঙ্গার ধারে একটু ফাঁকায় ছোট্ট বাড়িখানা এককালে কোন জমিদারের বাগান বাড়ির আউট গোছের ছিল। জমিদারের বাড়ির প্রমোদভবনটা একটু দূরে। এই ছোট বাড়িখানায় বোধ হয় বাগানের মালি বেয়ারারা থাকতো। সেটাকে কোন নতুন মালিক

কিনে সারিয়ে সুরিয়ে ভাড়া দিয়েছে। ছোট্ট একটা ঘর সামনেই বাগানের কিছুটা ধ্বংসাবশেষ। দুটো কামিনী ফুলের গাছ—এখনও অতীতের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে। এখানে ওখানে মাথা তুলেছে গাছ-গাছালি কেটে ছোট ছোট বাড়িগুলো—তবু এখানে এখনও কোলাহল কম। বাগানের এই দিকের শেষেই গঙ্গার সীমানা। ওপারে চটকলগুলোর চিমনি মাথা তুলেছে সীমারেখার ঊর্ধ্বাকাশে। বাতাস এখানে সর্বদাই প্রমত্ত পালে লাগা।

চঞ্চল এই নির্জনতার অসীমে এসে খুশি হয়। তার সদ্যজাগর সেই নতুন পরিচয়কে সে প্রতিষ্ঠিত করবে। ইতিমধ্যে কয়েকটা লেখা কলকাতার বিভিন্ন সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকায় পাঠিয়েছিল।

তার মধ্যে দু চারটে ফেরৎ এসেছে। সেগুলো তাদের মনোনীত হয় নি। দু একটার কোন জবাবই পায় নি।

চঞ্চল এই পরিবেশে কেমন একা বোধ করে। স্কুলের চাকরী সে করছে কোন-রকমে। কিন্তু তার এটা ভালো লাগে না। মনে হয় আজ শিক্ষার ধারার সঙ্গে বর্তমান সমাজের ছাত্রদের মনের কোন যোগ নেই। বই আর বই, শুধু পড়া আর মুখস্থ করা। না হলেই তিরস্কার চারিদিকে অভাব আর অবক্ষয়, এর মাঝে ওই নীতিজ্ঞান সমন্বিত নীরস পড়ার ছলনাটাকে তারা যেন সহ্য করতে পারছে না।

সদানন্দবাবু রিটায়ার করলেও স্কুলে আছেন। স্কুলের এখনও তিনি প্রায় কর্তা। তিনিই সেদিন জিজ্ঞাসা করেন।—কেমন লাগছে কাজ কর্ম ?

চঞ্চল ওঁর দিকে চাইল। মনে হয় সত্যিকথাটা বললে বোধ হয় খুশি হবে না! তাছাড়া এই সামান্য চাকরিটাও চঞ্চলের এখন দরকার। তাই চঞ্চল মনের সেই নীরব জ্বালাটাকে চেপে মিথ্যা কথাই বলে।

—ভালই।

হাসেন সদানন্দবাবু। কথাটা তাঁর ভালো লেগেছে। তাই মাথা নাড়েন—ভালো লাগবেই। এর একটা আকর্ষণ আছে, এই শিক্ষকতার। মহান কর্তব্য এটা, বুঝলে? ভবিষ্যত জাতির জন্ম হবে তোমাদের শিক্ষায়।

চঞ্চলের মনে হয়েছিল ওই লোকটির কথায় হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়বে। তবু কোনক্রমে চুপ করে ছিল।

মনে হয় একটা মিথ্যাকে এমনি করে আঁকড়ে ধরে এরা কল্পনার স্বর্গ রচনা করে চলেছে—একদিন নিষ্ঠুর আঘাতে এই তাসের মিনার ধ্বসে পড়বে খান খান হয়ে। সেই মিথ্যাটার মুখোস তার খুলে দিতে ইচ্ছা করে।

তবু এই হাসিটা সে চাপতে পারেনি। প্রাণখুলে হাসছে চঞ্চল নিজের ছোট্ট ঘরখানায়।

ইতিমধ্যে বন্ধুও দু-একটা জুটেছে। স্টেশন রোডের ধারেই গোবিন্দের চা-এর দোকানেই চা খায়। ওটা প্রায় বাইরে চুকিয়ে আসে। সেইখানেই দু-একজন তরুণ

বয়স্কের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। কেউ-বা চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের মাতব্বর—কেউ-বা চাল কলের মালিকের ডান হাত, না হয় স্টেশনের আশপাশে-ইয়ার্ডে রাতের অন্ধকারে চর-অনুচর পাঠায়; মাঝে মাঝে খবর আসে কোন মাল গাড়ি ভেঙ্গে কারা রড্ · না হয় গম চালের বস্তা, কাপড়ের গাঁট পাচার করছে।

ঠিক খবরটা জানে না চঞ্চল···তবে এটা অনুমান করেছে এখানে, রাতের অন্ধকারে বেশ-কিছু কাঁচা পয়সার আমদানি হয়। সেটা মদের গেলাসের ফেনায় উপছে ওঠে। গোবিন্দ-কেবিনের পিছনের একটা ঘরে তার ঢালাও ব্যবস্থা আছে। তিনকড়ি ঘোষকে দেখলেই বোঝা যায় রাতের অন্ধকারের কারবারে বেশ দু পয়সা হচ্ছে, বোঝা যায় চালের আড়তদার ওই নিধু সরকারের যোগ্যপুত্র শ্রীদাম সরকারকে দেখলে। তারাই আপ্যায়ন করে।

—এসো মাস্টার।

গলা নামিয়ে কথাটা জানায়—চলে টলে?

চমকে উঠেছিল চঞ্চল, ঘুপসি ওই ঘরঘানায় অল্প আলো-আঁধারিতে সে ওই চটকদার পোশাক পরা লোকগুলোকে দেখেছে, তার সেই চাপাপড়া সুপ্ত জানোয়ার-টাকে, ওরা যেন খোঁচা মেরে জাগাতে চায়।

তিনকড়ি বলে—আরে দলে নাম লেখালে চলবে না? তবে বাবা রয়ে সয়ে। কি বল হে মাস্টার?

চঞ্চল নিজের পরিচয়টাকে ভুলতে চেষ্টা করেছে। ও জানে ওই তরল উষ্ণ পানীয়ের জ্বালা-আনা উন্মাদনাটাকে; রাস্তা দিয়ে কয়েকটি মেয়ে চলেছে, বোধহয় সিনেমার শো ভেঙ্গেছে, সেই ছবির সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে ওরা যাচ্ছে। হাসকে—কলরব করছে—নিজেদের মধ্যে মনের কি খুশিতে।

শ্রীদাম ওই মেয়েদের দিকে চেয়ে থাকে। ওদের দু-এক জনের নিটোল যৌবনোচ্ছল দেহ, চলার ছন্দে কাঁপছে গুরু নিতম্ব, শাড়ির আঁচলটা যেন খসে পড়বে যে কোন মুহূর্তে। শ্রীদাম ঠোঁট দুটোয় জিব দিয়ে চাটছে। বলে ওঠে—মেয়েদের ইস্কুলে চাকরী পেলে না হে মাস্টার?

চঞ্চল হাসছে। ও পাশ থেকে গুরুদাস শোনায়।

—'আই' বুড়ো ছেলেকে দেবে কেন হে? সেদিকে সদুবুড়ো সান-শা। এমন ইস্কুল করলে যে আজন্ম বে-ই করতে হ'ল না। চেয়ে চেয়েই কেটে গেল! বুঝলা কি না?

হাসছে ওরা। চঞ্চল কথাটা ঠিক মানতে পারে না। সদানন্দবাবুর অতীত ইতিহাস সে জানে না। তবু মনে হয় এদের রুচি মতোই কথা এটা।

তিনকড়ি বলে, তা লে ওখানে মাস্টারী না নিয়েই ভালোই করেছো হ্যা। তোমাকেও জন্মোকাত্তিক হয়ে থাকতে হতো। তা এইবার বিয়ে-থা একটা করে ফেলো, ওই গঙ্গার ধারে বাদাড়ে পড়ে থাকবে কদ্দিন?

শ্রীদাম সরকার গলা নামিয়ে বলে—তা ক'নেতো হাতেই আছে হে? ওই হরিবাবুর মেয়ে ওই যে গান গায়—

চুপ করে যায় চঞ্চল। রাস্তার দিকে নজর পড়তে দেখে সমীর সাইকেলে ওই দিকে চলেছে। কি ভেবে উঠে পড়ল চঞ্চল। এ-সব আলোচনা তার ভাল লাগে না।

ওরা ততক্ষণে মদের বোতল সোডা—খানিকঠা মাংসের কষাও আনিয়ে নিয়েছে। চঞ্চল নিজেকে আজ আর হারাতে চায় না। মনের অতলের সেই জীবটা অন্ধকারের বুক থেকে মাথা তুলছে।

—তালে চললে? শ্রীদাম হতাশ হয়।

তিনকড়ি রাতের অন্ধকারে রেল গাড়িতে কারবার করে। সে হাসছে।

—ভয় পেয়েছে মাস্টার?

চঞ্চল দাঁড়াল না। পথে এসে নামল। তখন সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে। চঞ্চল নিজেকে কেমন অসহায় বোধ করে। জনকোলাহল মুখর ঠাঁইটা। বাজারের পথ।

এবং বাজার বসেছে পথে পথে। হঠাৎ সমীরকে দেখে দাঁড়াল। সমীর যেন তার অপেক্ষাতেই এখানে সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে এগিয়ে আসে।

'তুমি!'

সমীরের মুখটা কেমন গম্ভীর, থমথমে। চঞ্চল আর সে চলেছে। বাজারের ভিড়, ওই নিওন লাইটভরা রঙ্গীন জগৎ ছাড়িয়ে চটকলের ওদিকে। পথটা মিউনিসিপ্যালিটির সীমা ছাড়িয়ে পল্লীগ্রামের দিকে গেছে। মাঝে মাঝে দু-একটা বাড়ি ওদিকে দেখা যায়। উঁচু রেল লাইনটা উঠে গেছে গঙ্গার দিকে।

পিঠুলি, আশশেওড়ার জঙ্গল থেকে ডোবায় পচা পানার টক্ গন্ধ ওঠে বাতাসে। শহর নয়—গ্রাম্য পরিবেশ। ওপাশেই চটকলের একটা গেট।

সমীর বলে—ওই গোবিন্দ-কেবিনে যাতায়াত করো না চঞ্চল।

চঞ্চল একটু অবাক হয়। সমীর যেন তার স্বাধীন মতামতের পর হাত দিতে চায়। তাছাড়া সমীর ওর অতীতের সেই সত্ত্বাটাকে চেনে না। ভালো ছেলের যা সূত্র সেই সূত্র অনুযায়ী তাকে ভালো তো নয়ই—নিকৃষ্ট পর্যায়েই ফেলা যায়, তা জানে না সে। চঞ্চল সে কথা না তুলেই প্রশ্ন করে—

—কেন?

সমীর বলে, ও-জায়গাটা ভালো নয়, শহরের সব বদ-লোকগুলোর আড্ডা। তুমি ওখানে যাও সদানন্দবাবু এতে খুশী নন।

হাসে চঞ্চল—তবে কি গঙ্গার ঘাটে হরিভক্তি—প্রদায়িনী মণ্ডলের সভায় গিয়ে বসব?

সমীর ওর দিকে চাইল। এমনিতেই সে কথা কম বলে। চঞ্চল হাসছে।

—সব কিছু ভালো-মন্দকে দেখা দরকার সমীর, কোনটাকে এড়িয়ে আমি যেতে চাই না।

—তাই বলে পাঁক মাখবে? বদলোকের সঙ্গে মিশবে। মাতাল-গুণ্ডা-স্মাগলার···

হাসল চঞ্চল। ওই উগ্রপন্থী সনাতন ধর্মীদের সে কৃপার চোখেই দেখে। ওরা এ সবকে ভয়ে করে। তাই হিংসাও করে, অকারণ ঘৃণাও করে, তাই সরে থাকতে চায়, দূরে পালিয়ে গিয়ে।

যে পরাজয়—যে গ্লানি ওই চোর-মাতাল স্মাগলারদের অন্তরে জমা আছে সেইটাই দেখতে চায় চঞ্চল। ওর কথার জবাব দেয়।

—সতীমায়ের থানে সেই বাউলের গান শোন নি?

জলে নামিব জল ছিটাবো
বেণী ভিজিবে না,
আমার যেমন বেণী তেমনি রবে
চুল ভিজিবে না।

সমীর বিরক্ত হয় ওর যুক্তিতে। ওসব তার মতে স্তোকবাক্য।

সাধারণ মানুষের কাছে তা বোধগম্য, বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই বলে সমীর—কথাটা তোমার ভালোর জন্যেই বললাম।

আর দাঁড়াল না সে। ভোঁ বাজছে। রাত্রির সিপ্টের ডিউটির ভোঁ। নিস্তব্ধ অন্ধকারের বুকে শাসনের ভঙ্গীতে ওই গর্জনটা শোনা যায়।

তেল কালিমাখা প্যাণ্ট শার্ট পরণে, সমীরের মুখে পড়েছে আবছা একটু আলোর আভাস। সেই মুখটায় ফুটে উঠছে ঈষৎ কাঠিন্য।

সাইকেলে চেপে চলে গেল গেটের দিকে। দু চারজন মজুরও চলেছে। ওরই ভিড়ে হারিয়ে গেল সে।

চঞ্চল কি ভাবছে সদানন্দবাবুর যোগ্য ছাত্র। কোণঠাসা হয়েছে। বঞ্চিত হয়েছে জীবনের সব পাওয়া থেকে—সাহস নেই কোনকিছু জোর করে পাবার। তাই রাতভোর কঠিন পরিশ্রম করে সামান্য কিছু পেয়েই খুশী। তার শ্রমের বিনিময়ে ওরা পায় বঞ্চনা। তবু মুখ বুজে থাকে।

আর নিজেদের চারিদিকে দুর্বল-নীতির প্রাচীর দিয়ে নিজের ক্ষীণ মুমূর্ষু প্রাণটাকে আঁকড়ে রেখেছে।

ওই সমীর···সদানন্দবাবু···আরও অনেকে ওই দলে।

হাসি পায়, সদানন্দবাবুর কথায়। জাতিগঠনের দায়িত্ব তাদের হাতে। কে সেই দায়িত্ব দিয়েছে জানে না। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। মনগড়া একটা কল্পনায় জগৎ রচনা করে তারা সেই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়ে আছে।

রাস্তায় চোখে পড়ে দু'টি ছেলেমেয়েকে। একটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে কি যেন ধর করে দিল সেই পুরুষটি মনে হয় কয়েকটা টাকা। ছেলেটার মুখে কি লালসার ায়া।

চঞ্চল অনুমান করে নেয় ব্যাপারটা। ওরা দুজন তাকে দেখে সরে গেল ওপাশে —জাতির ভবিষ্যৎ।

রাতের অন্ধকারে কুৎসিত—লালসা আর অর্থ দিয়ে তিলে তিলে তৈরী সেই দাক্ত-ভবিষ্যৎ-এর গঠনকারী তারা। উঁচু লাইনটি দিয়ে একটা ট্রেন আসছে ূর থেকে ওর আলোটা পড়েছে গাছ-গাছালির এই দিককার দু একটা ঝুপড়ির ায়ে। ঘুমন্ত সেই কলোনী জেগে উঠেছে। চেন টেনেছে ওরা। ট্রেন থেকে নামছে ছলে মেয়ে মাঝ বয়সী, সোমত্ত বৌ, ওদের সর্বাঙ্গে চালের পুঁটলি। ছেলেমেয়ে-ুলো অন্ধকারে দৌড়চ্ছে। ওরা আজকের রোজকার সেরে ফিরছে। দিনে াঁচ টাকা।

ছেলে-মেয়েগুলো এ ওর গায়ে পড়ছে, আজ তারা বিনা বাধায় ফিরে আসতে পরেছে।

চঞ্চল ওদের অবাধ খুশিভরা চোখের দিকে চেয়ে থাকে।

সুষমা কি খেয়াল বশেই এদিকে এসে থাকে মাঝে মাঝে।

সন্ধ্যার পর গানের টুইশ্যান সেরে আজ এসেছে চঞ্চলের আস্তানার দিকে। ঞ্চল নেই। ঘরখানা খালি পড়ে আছে।

সুষমা থমকে দাঁড়াল। কেউ কোথাও নেই ফিরে যাবে কিনা ভাবছে। মনে একটা হতাশার ভাব জাগে। ক'দিন যায় নি চঞ্চল ওদের বাড়ি। কে জানে শরীর খারাপ কিনা?

তার মনের অতলে ওই মানুষটার জন্য একটা ব্যাকুলতা জাগে। চঞ্চল ও-বাড়ি থেকে চলে আসতে সুষমা একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছিল। সেদিন বলেছিল চঞ্চলকে।

– আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন তো?

চঞ্চল হেসেছিল—ছাড়তে পারলাম কই? কাছেই তো রইলাম।

জবাবে ঠিক খুশী হয় নি সুষমা।

—ছাড়তে পারলে খুশী হতেন? যদি এতই বোঝা বলে ভাবেন ছেড়ে গেলেই পারেন। তাই বোধ হয় ভাল।

শেষের কথাগুলো বলতে তার নিজের কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে এসেছিল। কথাটা জানে সুষমা।

যেতে তাকে হবেই একদিন। তবু মনে হয় এই ক'দিনের পরিচয়ে সুষমা তার অন্তরে কি অপরিসীম একটা বেদনার খবর পেয়ে গেছে সেটা এতকাল তার অজানাই ছিল।

—তুমি!

হঠাৎ যেন কি গুরুতর অন্যায় করতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়েছে চঞ্চল সুষমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

মনের মাঝে সেই অযথা চিন্তাগুলো একটা জমাট পরিণতিলাভ করছে। রাতের অন্ধকারে দিকহারা বাতাস গাছ-গাছালির বুকে কি নীরব বেদনার আভাস এনেছে গঙ্গার ঢেউগুলো তীরের ভাঙ্গা ঘাটটার গায়ে আঘাত হেনে চলেছে—সেই টুকরো শব্দগুলো…

সম্মিলিতভাবে একটি ঐকতানের অনুরণন এনেছে। আকাশে বসেছে হাজারো তারার আসর। অন্তরে নীরব বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে কি আলোকরশ্মিতে ঝরে পড়ছে, বিকীর্ণ কামনার ও যেন মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি।

চঞ্চল সুষমার দিকে চেয়ে থাকে। সুষমা লজ্জাভরা কণ্ঠে বলে, এমনি এদিকে এসেছিলাম।

চঞ্চল অনুমান করে ওর এই লজ্জার কারণ। খুশীও হয় সে। এ তার কাছে একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

—তুমি আসবে তা ভাবি নি সুষমা।

—সুষমা হাসবার চেষ্টা করে। চঞ্চল ওকে অভ্যর্থনা জানায়।

—এসো।

সুষমা জবাব দেয় রাত হয়ে গেছে। আজ চলি।

গরীবের আস্তানাটা তবু দেখে যাও একবার। চঞ্চল দরজাটা খুলে আলো জ্বালতেই দেখে মেঝেতে কয়েকখানা পত্র-পত্রিকা আর চিঠি পড়ে আছে। ওকে দেখতে না পেয়ে খোলা জানলা গলিয়ে ভিতরে ফেলে দিয়েছে।

চমকে ওঠে চঞ্চল। বাংলার নামকরা ক'টা পত্রিকায় লেখা পাঠিয়েছিল, তাতে তাতেই তার গল্প দুটো ছাপা হয়েছে। প্রথমেই বেশ বড় একটা হেডপিস—ছবিতে গল্পের একটা আভাস দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। নিজের নামটা ব্লকের মোটা হরফে দেখে মনে হয় ওই লোকটা যেন তার অচেনা।

'সুষমা!'

সুষমাও দেখেছে। তার হাত থেকে কাগজখানা যেন ছিনিয়ে নেয় সে।

দেখি! বাঃ! সুন্দর ছবিটা হয়েছে কিন্তু!

উত্তেজনায় কাড়াকাড়িতে সুষমার হাতখানা ওর হাতে এসে পড়েছে! ওর নরম দেহের উত্তপ্ত স্পর্শ লাগে মুখে, গালে…হাঁপাচ্ছে সুষমা। চঞ্চলও ওকে দেখছে।

…সুষমা কি খুশীর আবেগে বলে, চিঠিগুলো?

—কোন একটা পত্রিকা থেকে জানিয়েছে আমার লেখা তারা ছাপছে। আরও লেখা চেয়েছে সুষমা।

চঞ্চল অবাক হয়। তার লেখার মধ্যে একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে তার বাস্তব জীবনের স্পর্শ। যা লিখেছে সে তাতে ফাঁকি নেই। সে সব ঘটনা সে

। চরিত্র তার নিজের চোখে দেখা, চেনা। কত রাত্রির অন্ধকারে সে ওই নরনারীর াবনকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে। ওই মাটিকে সে চেনে। ভালবাসে।

আজ তার অন্তরে কি একটি নতুন পরিচয় বৃহত্তর জগতে স্বীকৃতি পেয়েছে। াজন্য সুষমার দাম কম নেই। সেই তার মনে জেবলেছে এই অনির্বাণ আশার ালো—চেতনার শিক্ষা।

সুষমা!

সুষমা ওর দিকে চাইল।

চঞ্চল বলে আজ তুমি আমার ঘরে পা দিয়েছো—আর সেই সঙ্গে আমার খ্যাতি তষ্ঠার শুরু হয়েছে।

চমকে ওঠে সুষমা। এরপর ওই চঞ্চল যেন আরও কি বলবে। সে কথা ানাবার জন্য যেন উৎকর্ণ হয়ে থাকে ওই নারীর সারা মন। তবু সেই কথাটা ানা আজ তার মিথ্যা। সুষমা জানে অপরের বাগদত্তা সে। তবু মনের অতলে ্যমনের কি নীরব কামনায় আজ বিস্মিত হয়ে উঠেছে সুষমা।

তাকে জোর করে চাপা দেবার জন্যই সে বলে।

তা-লে খাইয়ে দাও এবার। বেশ জোর খাওয়া—

সত্যি! চঞ্চল খুশী হয় ওর সহজ এই আবেদনে।

রাত হয়ে আসছে। সুষমার হঠাৎ খেয়াল হয় কথাটা, বাড়ি ফিরতে হবে। ক্ষণ সে সব কিছু ভুলেছিল। তার সেই প্রায়ান্ধকার বাড়িটার কথা, বাবা মা ভাই-ন সবাইকে। তার অন্তরের এই পরম স্বার্থপর নারীটির হঠাৎ অবলুপ্তি ঘটে।

চঞ্চল বলে রাত হয়েছে, চলো তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

সুষমা আর সে ফিরছে নির্জন পথ দিয়ে। চাঁদটা এতক্ষণে জ্যোৎস্নার আবেশ নছে সুপ্তিমগ্ন স্তব্ধ রাত্রির বুকে। গাছগুলোয় সেই আলো পড়েছে, নীচের টতে আলো আঁধারির বিচিত্র কাব্য করেছে। পাতা কাঁপছে হাওয়ায়।

সুষমা!

সুষমা ওর দিকে চাইল। দুচোখে সেই নীরব বিস্ময় আর চাপা একটা অনন্দ। ল বলে।

—আজ সত্যি মনে হয় এতদিন নিজেকে চিনি নি। সব ধারণা আমার ধকারে ঢাকা ছিল। তুমিই আলো দেখালে।

সুষমার কুমারী মনের অতলে একটি অজানা পুলক জাগে। কেউ তার কাছে রা জীবনের পরম পাওয়ার এমনি স্বীকৃতিটুকু অকপটে স্বীকার করে নি। এ র কি এক অভাবনীয় সম্পদ বলেই মনে হয়।

চঞ্চল বলে সেদিন তোমার কণ্ঠে শুনেছিলাম গানটা। মনে পড়ে?

আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া
মাধুরী করেছো দান

এ আমার পরম পাওয়া সুষমা। যদি লেখায় এই শিল্প-সৃষ্টিতে কোনা সার্থক হতে পারি—তার মূলে রইলে তুমি। চাঁদের আলোয় বিস্তৃত গঙ্গার ব রুপো ঝলমল আভা, দু একটা নৌকা ওই আলোর তুফানে উজান বেয়ে চলে সুপ্তিমগ্ন দিগন্তের অসীমে ওরা পথ হারিয়ে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, সে খ কেউ রাখে না।

এমনি মধুর একটি রাতের পরিবেশে দু'টি খুশীমন এই বিশ্বজো আনন্দস্রোতে কোথাও উধাও হয়ে যেতে চায়।

হরিপদবাবুর ঘুম আসে না। ঘুম তার এমনিতেই কমে গেছে।

কল্যাণীও জেগে আছে। সুষমা অন্যদিন সকাল সকাল ফেরে, দেরী হয় কে ফাংশানে গেলে, তাও বাড়িতে বলে যায়।

প্রতিমা তিমির ঘুমিয়ে পড়েছে। হরিপদবাবু কি ভাবছেন। মনে ত এখন অনেক চিন্তার জালবোনা চলেছে।

আজকাল দিন বদলেছে। তার আমলে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত ন' দশ ব বয়সে। আজকাল তার উপায় নেই। মেয়েকেও নিজের খরচটা নিজেকেই এ অর্জন করতে হচ্ছে।

—এখনও ফিরলো না সুষি?

কল্যাণী উৎকণ্ঠিত স্বামীকে তবু অভয় দেয়।

—গেছে কোথাও, কোন বন্ধুর বাড়ি। এখুনি ফিরবে।

সমীরও নেই, ডিউটিতে। কেই বা খোঁজ করতে যাবে। সোমত্ত মেয়ে অ ক'মাস পরেই বিদেয় করতে পারলে নিশ্চিন্ত হন। আর কটা মাস! দিন কাটতে চায় না।

সুষমা আর চঞ্চলকে ফিরতে দেখে খানিকটা নিশ্চিন্ত হন হরিপদবাব কল্যাণী মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে। নারীর সন্ধানী চোখের সামনে মেয়ের অফুরান খুশির খবরটা ধরা পড়ে যায়।···কল্যাণীর এটা কেমন ভালো ঠেকে ন চঞ্চল কিছু বলবার আগেই সুষমা সহজ খুশি ভরা কণ্ঠে বলে।

—এক বন্ধুর বাড়ি গেছলাম গানের জলসায়, দেরী হয়ে গেল। বের হয়েই প ওকে দেখতে পেয়ে নিয়ে এলাম।

চঞ্চল অবাক হয়ে সুষমার দিকে চাইল। মেয়েদের উপস্থিত বুদ্ধির সম্ব অনেক কথাই শুনেছিল সে। কিন্তু এতবড় ব্যাপারটাকে এমনি সহজ করে তুল পারবে নিমিষের মধ্যে তা ভাবে নি। সুষমার এই মিথ্যা কথার মূলে কোথা যেন একটা শুদ্ধ মনের ছবি ফুটে ওঠে। ও জানাতে চায় না কাউকে আজকের সে স্মৃতিটুকু। ওটা তার নিজস্ব—একান্ত করেই রাখতে চায়। কল্যাণী বলে।

খেয়েই যাও বাবা। আবার তো হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হবে।

চঞ্চল আমতা আমতা করে···দেখে, সুষমা তার দিকে সাগ্রহে চেয়ে আছে। ওর চোখে আজ নীরব আমন্ত্রণ। কল্যাণী বলে।

—ও সুষি, তুই বরং উনুনে কাঠ ধরিয়ে দুটো ভাজা করে দে। বসো বাবা।

চঞ্চল ওদের সংসারে একজনই প্রায় হয়ে গেছে। আগেকার অপরিচিতের বাধাটা আর নেই। ও এ বাড়িতে এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে।

হরিপদবাবুর জন্য মাঝে মাঝে এটা-সেটা আনে, ফল সন্দেশ না হয় কোন ওষুধ —চাকরিতে মাইনে পেয়ে কল্যাণীকে একটা শাড়ি দিয়ে প্রমাণ করে গেছে। তিমিরকেও প্যাণ্ট-সার্ট করিয়ে দিয়েছে।

ও জানে এ বাড়ির অভাবের কথা। তবু ভালো লাগে এত অভাবের মধ্যেও কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজের এই মুখ বুজে অভাব সহ্য করাটা—তার কাছে নতুন বলে ঠেকে। ভালো লাগে এই সম্মানবোধটুকু।

কল্যাণী নিতে ইতস্তঃ করে।

—আবার এসব কেন বাবা ?

চঞ্চল হাসে।—কেন ? আমার কি প্রণাম করবার দাবী নেই ?

কল্যাণী ওর দিকে চেয়ে থাকে। হরিপদবাবুর অসুস্থ শরীর মনও চঞ্চলের সামনে অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠে। কথাবার্তায় হাসিতে জীর্ণ এই বাড়ির ক'টি আশাহীন মানুষের মনে ও আনে কি নতুন আশার সংবাদ।

—চাকরি-বাকরি হল, এইবার বিয়ে থা করে ঘর বাঁধো। কল্যাণী বলে!

ঘর! চাকরী! হাসছে চঞ্চল। জবাব দেয়।

—আমার নামটা কিন্তু খুব অর্থবহ—চঞ্চল! সর্বদাই আমি চঞ্চল, তাই বোধ হয় ও দুটোর কোনটাই আমার জন্যে নয়। এ চাকরিটাই বা কদ্দিন থাকে তাই দেখুন। তারপর ঘর!

দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল সুষমা। ওর ডাগর দুটো চোখে চোখ পড়তেই সরে গেল। চঞ্চলের দিকে ও যেন কী আশাভরে চেয়েছিল। চঞ্চল চুপ করে যায়।

এ বাড়ির জীবনের সঙ্গে সে জড়িয়ে গেছে তার অজান্তেই।

হরিপদবাবুও ভালবাসেন চঞ্চলকে। বলেন।

—দেখো, ও কালে খুব বড় হবে সমীরের মা।

কিন্তু ওর অতীত পরিচয় তাদের কাছে অ-জানাই রয়ে গেছে। কল্যাণীও ভেবেছে কথাটা, কিন্তু সুষমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে ভাল ঘরেই। তাই ওদিককার সম্বন্ধে আর কিছু ভাবার নেই।

তবু মায়ের মন নিয়েই ওই চঞ্চলকে স্নেহ করে।

···রাত নামছে।

সুষমা আজ মায়ের কথায় উনুনে কাঠ দিয়ে নিজেই আলু পটল ভাজা আর

ডিমের মামলেট করে খাবার জায়গা করে দেয়। নিজের হাতে পরিবেশন করে।··· চঞ্চলের মনে একটা স্বপ্নের ছোঁয়া লাগে।

আজ তার মনে খুশির আবেশ। জীবনে অনেক কিছুই পেতে চায় সে। পাওয়ার দাবী-আশা এতদিন তার মনে ছিল না। চঞ্চল শুধু কুড়িয়ে লুট করে বেঁধেছে, আর তার সামান্য পাওয়াকে পথের ধুলোয় ফেলে আবার অন্য কিছুর সন্ধানে ফিরেছে। তৃপ্ত হয় নি। তৃপ্তির সন্ধানে সে শুধু ঘুরেছে মরীচিকার পিছনে—জীবনক্লান্ত পথিকের মতোই।

হঠাৎ সেই ঊষর পথের মাঝে সত্যিকার বাঁচার আশ্বাস পেয়েছে সে। একটি নীড় বাঁধা—একজনের মনের নিঃশেষ পাওয়া নিয়ে—সে বাঁচতে চায়—ধন্য হতে চায়।

সুষমা ওর দিকে চেয়ে বলে।

—খাও! কেন রান্না খারাপ হয়েছে বুঝি?

—না—না! হাসে চঞ্চল।

আজ তার জীবনের একটি স্মরণীয় তিথি।···তাই বোধ হয় চাঁদ ওঠে—বাতাসে জাগে বকুলের উদগ্র-সৌরভ, তার মনের স্বপ্ন-কামনার রং-এ রাত্রি মধুময়—স্বপ্নময়।

চঞ্চল ফিরে এসে আবার লিখতে বসেছে।

জীবনের এই সার্থকতার স্বপ্নই সে দেখে।

চোখের সামনে মনের অতলে ভিড় করে আসে সব চরিত্রগুলো, এই দুনিয়ার মানুষ ভালভাবেই বাঁচতে চায়—ভালবাসতে চায়।

ওই বস্তির জীবনে—চটকল মজুরের মনে—শহরের লেখাপড়া জানা মধ্যবিত্তের মনেও সেই আশা রয়ে গেছে। কিন্তু বিষিয়ে দিয়েছে আজকের সমাজ—আজকের জীবন-যন্ত্রণা তাদের মনের সব শ্রী আর সৌন্দর্যকে। তাই এত কালি আর কাদা জমেছে স্তরে স্তরে।

সেই মানুষের সেই বিপর্যয়ের কথাই বলবে সে। সকলের সামনে তুলে ধরবে চিরন্তন মানুষের জীবন-বেদ, যে এই পঙ্কিলতার মধ্যেই হারায় নি।

সমীরও খবরটা পায়। সেদিন রবিবার। স্টেশনের স্টলে খবরের কাগজটা পড়ছিল, সমীরের চোখে পড়ে চঞ্চলের গল্প ছাপা হয়েছে। খুশিতে মন ভরে ওঠে, অবাক হয়ে চেয়ে দেখে ছবিটার দিকে।

নগদ যোল পয়সাই বের করে দেয় পকেট থেকে। খবরের কাগজের সব খবরের চেয়ে ওই খবরটাই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। একটা বেঞ্চে বসে পড়তে থাকে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। এই পরিবেশ—এই জীবনযাত্রা সমীরের খুব চেনা। ওই ট্রেন লাইনটা উঁচু হয়ে উঠে গেছে—দুপাশে ছড়ানো খেজুর গাছগুলো—দু'একটা চিল উড়ছে আকাশে। টেলিগ্রাফের তারগুলোর মাঝে একটানা শব্দ ওঠে। বাতাসে

কাঁপছে কাশবন। এ ছবি সে বহুবার দেখেছে—কিন্তু সেই সামান্য পরিবেশটা যে কয়েকটা কলমের আঁচড়ে এমনি সজীব বর্ণময় হয়ে ওঠে তা ভাবতেই পারে নি। ওই গল্পের মানুষগুলোকে সে চেনে।

একটা জাত ক্রমশঃ যেন নাম পরিচয়হীন শুধু চোরা-চালানদারে পরিণত হয়ে চলেছে। শুধু বাঁচার তাগিদে জীবনের সব কিছুকে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে, পরম বেদনায় যন্ত্রণায়।

মুগ্ধ. স্তব্ধ হয়ে গেছে সমীর। প্ল্যাটফরমে তেমনি একদল ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা যাবে চাল আনতে দূর বর্ধমানের পল্লী-অঞ্চল থেকে। মেয়েগুলোর যৌবন উছলে উঠেছে—তারাও কয়েকজন আছে এই দলে। ওরা প্ল্যাটফরমে হাসি মশকরা করছে অশ্লীল ভঙ্গীতে।

…এই চোখে সমীর ওদের দেখে নি। আজ সে সমবেদনার চাহনিতে দেখছে ওদের। ওরা সকলেই চঞ্চলের পরিচিত। সমীর খুশি মনে আজ বের হয়ে যায় স্টেশন থেকে। সারাটা দিন ছুটি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে একটি স্বপ্ন দেখে। …স্টেশনের ও-পাশেই ছোট্ট বাড়িটাকে কেন্দ্র করে তার সেই স্বপ্ন। করুণাদের বাড়িতেই গিয়ে ঢুকল।

ছোট্ট বাড়িখানা। ওর মা-ই সমীরকে দেখে বলে।

—এসো বাবা। ওঃ করুণা সমীরকে একটু চা দে।

চায়ের পর্ব তখনও তাদের চোকেনি। রবিবার। তাই চটকল পল্লীতে আজ বেলা করেই সব হয়। কেমন ঢিলেঢালা আমেজ।

করুণা বের হয়ে আসে। ওকে দেখে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলে—ব্যাপার কি! সাত-সকালেই—

হাসে সমীর। ওর আজ খুশীর দিন। একটা পথহারা মানুষকে সে গঙ্গার সেই সলিল সমাধি থেকে বাঁচিয়েছে, তাকে ঠাঁই দিয়েছিল।

অপরিচিতের ভিড়ে সে হারিয়ে যায় নি। চঞ্চল তারই বন্ধু আর সেই চঞ্চলের প্রতিভাকে সে জাগিয়ে তুলেছে। নতুন এক মহান পরিচয়ে সে আজ লোকের সামনে পরিচিত হয়ে উঠেছে। হাতের কাগজখানা দেখিয়ে বলে সমীর।

—দ্যাখো!

খবরের কাগজ সম্বন্ধে করুণার ধারণা একটা বিস্ময়কর। ছাপার অক্ষরে যাদের নাম ওঠে তাদের কাউকে বড় একটা দেখে নি। অন্য জগতের লোক। তাদের ঘিরে বহু কল্পনার আমেজ মেশানো ওর মনে।

সেই খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে চঞ্চলের নাম। একটা গল্প। ব্যস্ত হয়ে কাগজখানা করুণা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পড়তে থাকে।

—ওমা, এ যে আমাদের ওই কলোনীর দিকটা! রেল লাইন…জলা পিটুলীর গাছগুলো—!

করুণা দেখেছে ওই চঞ্চলকে দু একবার সমীরের বাড়িতেই। সুন্দর শান্ত সৌম্য চেহারা। মনে সেই কল্পনার সঙ্গে লেখার এই স্বপ্নটুকু জড়িয়ে একটা বিচিত্র আকাশ গড়ে ওঠে ওর মনে।

পড়তে পড়তে হাসে করুণা। তার মুখ কেমন লাল হয়ে ওঠে···এদিক ওদিক চেয়ে গলা নামিয়ে বলে।

—তোমার বন্ধুর কিন্তু নজর সব দিকে। দ্যাখ না মেয়েটার সম্বন্ধে কি বলেছে? ধ্যাৎ! এমনি করে মেয়েদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে নিশ্চয়ই।

সমীর চায়ে চুকুম দিতে দিতে করুণাকে দেখছে। ও সুন্দর—স্বাস্থ্যবতী শাড়ির আভরণ ভেদ করে ওরা সুগঠিত দেহের সেই মাংসল রূপটাকে যেন প্রত্যক্ষ করেছে সেও। সমীর বলে।

—সাহিত্যকদের ওসব দেখতে হয়।

করুণা জবাব দেয়—তাই বলে চোখ দিয়ে চেটে চেটে দেখা যায়? ধ্যাৎ! নাঃ বন্ধু তোমরা মোটেই সুবিধার লোক নয়। আর তুমিও তার সঙ্গে থেকে থেকে এইসব শিখছ।

সমীর সবাক হয়।

—বা রে! কি করলাম আমি?

গলা নামিয়ে করণা ওর খুব কাছে এসে কি উত্তেজিত কণ্ঠে শোনায়। —করো নি, তবে অনেক দূর এগিয়েছ!

সকালের মিষ্টি আলোয় সমীরের মনে হয় এই অবচেতন কামনাটুকুকে ঘিরেই মানুষের ঘর বাঁধা। সব দুঃখ কষ্টকে সে ভুলে থাকতে চায়।

সমীর স্বপ্ন দেখে—বাড়ির দায়দায়িত্ব একটু কমলে সেও ঘর বাঁধবে। করুণাও ততদিনে পাশ করে একটা কিছু করতে পারবে। সদানন্দবাবুকে ধরে নিদেন গার্লস সেকশনে মাস্টারিও পেয়ে যাবে করুণা। সুষমার প্রতিমার বিয়ে হয়ে যাবে সুবীর প্রবীরও বড় হবে। কাজকর্ম করবে।

সুখী হবে সমীর। করুণা ওর কামনামদির মুখের সেই ভাবনাগুলো যেন পড়তে পারে। সেও জানে ও কথা।···এ নিয়ে করুণাও ভেবেছে।

সমীর বলে।

—আর ভাবতে পারি না করুণা, এ ভাবনার যেন শেষ নাই।

করুণাও জানে একথা। সামান্য সংসারের ভেলায় তারা গভীর তরঙ্গসঙ্কুল কোন এক দুরন্ত স্রোতে ভেসে চলেছে। মনের কোন সাধ কামনা নাই··· হাসে করুণা।

—একদিন চল বেড়িয়ে আসি।

সমীর চুপ করে যায়। হিসাব করতে থাকে, টাকার হিসাব। সামান্য মাইনে আর বোনাস কিছু পাবে। সামনে সুষির বিয়ে। নিজেও চায় মাবে

মাঝে মুক্তির আস্বাদ। কিন্তু পয়সার হিসাবে সে অঙ্ক মেলে না। তবু আশা করে।

—যাবো একদিন। কলকাতায় ঘুরে আসবো।

সত্যি! করুণার দুচোখে বিস্ময়।

চঞ্চলকে সেই-ই এ বাড়িতে নিয়ে আসে। চঞ্চল ধীরে ধীরে তার কল্পনার রাজ্যে ডুব দিয়েছে। তার দেখা বিচিত্র জগতে বহু মানুষের ভিড়। তার মনের ধারায় সে সেই চরিত্র আর ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করে চলেছে; সেই মানবধর্মী সংবেদনশীল লেখা ইতিমধ্যেই বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে।

প্রথম যেদিন সমীর তাকে করুণাদের ওখানে আনে তখন বোধ হয় সন্ধ্যাবেলা। বর্ষার মেঘভার আকাশ থেকে মুছে গেছে। পরিষ্কার নীল আকাশে দু একটা সাদা মেঘের আনাগোনা। তাতে আলো পড়ে লালচে হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি তবু একপশলা হয়ে যাবার পর আজ চাঁদ উঠেছে। রাতের সেই জলো ব্যতাসে ঘুমভাঙ্গা শিউলির ব্যাকুল কান্নার মতো একটা ভারি সুবাস মাখো-মাখো হয়ে গেছে।

করুণা ওই চঞ্চলকে দেখেছে।

এখন সে একজন প্রকৃত লেখক। নানা পত্র-পত্রিকায় তার লেখা ছাপা হচ্ছে। ইতিমধ্যে একটা বইও বের হয়েছে। কাগজে কাগজে তার মূল্যবান সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছে।

চঞ্চল ইতিমধ্যে টাকা পয়সার মুখও দেখেছে। অপরিচিত অবজ্ঞাত একটি মানুষ আজ ধীরে ধীরে অপরিচিতের অন্ধকার থেকে পরিচিতের জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

শহরের অনেকেই জানে তার নাম। চঞ্চল দেখেছে এতদিন সে নিজেই হারানো মানুষের জগতে বাস করেছে। জীবনের যত নোংরামি আর স্বার্থপরতার ভিড় সেখানে। অভাব আর দুঃখ থেকে ভুলে থাকার জন্যই মানুষ সেখানে তার মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে পশুতে পরিণত হয়েছে।

চঞ্চল সেই অন্ধকারময় জগতের কুশ্রী বিভীষিকার সংবাদ জানে; শুধু জানেই নয়, ও জগতকে সে-ও চিনেছে।

তার সঙ্গে এই আজকের দিনগুলোর একটা বিপরীত সম্পর্ক আছে।

মাঝে মাঝে স্কুলের কাজ থেকে কোনরকমে সময় করে কলকাতায় আসে। কর্মব্যস্ত শহরের সঙ্গে তাদের সেই ছোট শহরটার কোন মিল নেই। জীবন এখানে কলরবমুখর, কর্মব্যস্ত—দিনরাতে মানুষ শুধু এখানে ছুটছে আর ছুটছে। সেই ঢিলেঢালা ভাব এখানে নেই।

খবরের কাগজের অফিসেও দেখেছে কর্মব্যস্ততা।

ঝকঝকে অফিস, নীচে থেকে বিরাট মেসিনের যান্ত্রিক শব্দ ওঠে···দুনিয়ার সব

ওলট-পালট খবরে রেগে উঠে নিস্ফল আক্রোশে যেন গর্জন করে চলেছে ওই লৌহ দানব। তার বিরাট গহ্বর থেকে বের হয়ে আসছে একেবারে ছাপা ভাঁজ করা খবরের কাগজগুলো।

কলেজ স্ট্রীট পাড়াতেও আসতে হয়। দিনের পড়ন্ত রোদে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রহরারত দেওদার গাছগুলোর মাথায় হলুদ আভাস আনে। ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপকদের জটলা। বই-এর দোকানগুলোতে থরে থরে বই সাজানো, ফুটপাতেও এখানে দড়িতে আটকানো বই-এর সারি। বহু নতুন পুরাতন বই-এর সমাবেশ। রাজ্যের জ্ঞান ভাণ্ডারের সম্পদ যেন এখানের পথ—ওই দোকানে ছড়ানো।

চঞ্চল এই জগতকে জানতো না। ধীরে ধীরে সে তার অজানতেই কি এক বিচিত্র রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। শো-কেসের দিকে চেয়ে থাকে। বাংলার সব নামকরা লেখকদের বই-এর ভিড়। তাদের নাম শুনেছে, বিচিত্র-বর্ণের মলাট; চঞ্চল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওই দিকে।

ভাবছে সে। তাকেও একদিন এক ডাকে চিনবে, শ্রদ্ধা করবে সকলেই। চঞ্চল সেনও বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় নাম হয়ে থাকবে। তার জন্য যত কষ্ট—পরিশ্রম দুঃখ হোক সে স্বীকার করবেই।

সন্ধ্যার অন্ধকারে শো-কেসের এই আলো ঝলমল বইগুলো তাকে কি নীরব উৎসাহে সঞ্জীবিত করে।

কি উদ্যম আর আগ্রহ নিয়ে সে ফেরে তার গঙ্গার তীরের সেই নির্জন আবাসে, এমন অনামন -এ মানুষ অন্য মানুষ। এতদিন সে বোঝে নি কি পথের সন্ধানে জীবনটাকে মুঠো মুঠো করে অপচয় করে দিয়েছিল। আজ সেই জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পায়।

ভাললাগার নেশায় চারিপাশকে তার সুন্দর বোধ হয়।

সুষমা অবাক হয়, এটা কি?

খুশির আবেগে কিছু টাকা পেয়েই আজ ওর জন্য একটা শাড়ি কিনে এনেছে। দেখা হয়ে যায় সুষমার সঙ্গে ফেরার পথেই।

শরতের শিউলিগন্ধ-মাখা বাতাস গঙ্গাতীরের কাশবনে একটা সাড়া এনেছে। কোন রূপসী-রাত্রি তার সব রূপ নিয়ে আজ রূপবতী অ-ধরা নারীর মতো সলজ্জ চাহনিতে ওদের দেখছে।

চঞ্চলের জীবনে আজ একটি স্মরণীয় দিন। আরও দুখানা বই-এর কনট্রাক্ট করে এসেছে ভালো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। তাছাড়া সবচেয়ে ভাল খবর তার একটি গল্প ভালো একজন পরিচালক সিনেমার ছবি করবার জন্য কিনেছেন। তার জন্য আজই নগদ বেশ কিছু টাকা পেয়ে গেছে চঞ্চল।

খবরটা শুনে খুশীতে উচ্ছল হয়ে ওঠে সুষমা।

—সত্যি! ছবি হবে? সিনেমা? আমাদের এখানেও আসবে?

হাসে চঞ্চল—হ্যাঁ! যা লিখেছিলাম—তা জীবন্ত হয়ে, দেখা দেবে পর্দায়।

সুষমার মনের খুশি আজ উপচে পড়ে। চঞ্চলের হাতে ওর হাত দুটো। নরম-পেলব-হাত দুটোকে সে কাছে টেনে নিয়েছে।

সুষমা কি আবেগ কাঁপান দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওই দূর আবছা আলো-আঁধার ভরা গঙ্গার ওপারের দিকে। সামনে গঙ্গার বুকে উজ্জ্বল আলোর মাতাল এসেছে। সব বাধাবন্ধ ভেঙ্গে এই নদীর ধারা চাঁদের ভালোবাসায় স্পর্শ ধন্য হয়ে নেচে উঠছে. হাওয়ায়···হাওয়ায় সেই খুশির সাড়া।

চঞ্চল বলে—এ কাহিনী কিন্তু সত্যি! আমি একটি মেয়েকে ভালবাসি, এ তারই কাহিনী। তাকে খুব চিনি—

সুষমার সারা শরীরে মনে কি দুর্বার আনন্দ প্রবাহ।

—তার এই মিষ্টি জগতে হারিয়ে যেতে মন চায়। তবু ওর বুকের মধ্যে মাথা রেখে অস্ফুট কণ্ঠে ধমকে ওঠে সুষমা।

—এ্যাই! না—না! আমার কথা লিখবে না কখনও, তাছাড়া—

হঠাৎ এক টুকরো কালো মেঘ ওই চাঁদের আলোটুকুকে ঢেকে দেয়। সেই সুরের পরশ ঘুচে গেছে, গঙ্গার বুকে রেখে গেছে আলোর ঝলক।

—সুষ!

সুষমা চমকে উঠে সরে দাঁড়িয়েছে। তার দুচোখে কি আতঙ্ক!

আর ক'টা দিন! তার সব সুখ—স্বপ্ন—কল্পনার গড়া জগৎ থেকে নির্বাসিত হবার সময় ঘনিয়ে আসছে। ফিকে কুয়াসা ওঠা অন্ধকারে দিগন্তসীমার ওপারে দেখা যায় কঠিন শাসনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে ক'টা চিম্নি।

ওপারের কোন চটকলে দু একটা আলোর ইশারা তারপর আবার অন্ধকার।

সুষমা বলে কি বেদনাভরা কণ্ঠে।

—আর কটা দিন। তারপর···

চঞ্চল ওর দিকে চাইল।···তার স্বপ্ন মাদকতাময় জগতে ওই সুষমা কি একটি আলোক বিন্দু।···সেই আলোকটকুও নিভে যাবে।

সুষমা বলে ওঠে—সব আমার হারিয়ে যাবে চঞ্চল.। যেদিন জীবনকে চিনলাম, সেদিন আমি দেখলাম আম দেউলিয়া হয়ে গেছি। একি যন্ত্রণা তা তুমি বুঝবে না।

সুষমাকে চলে যেতে হবে। চঞ্চল আজ ভাবছে সামনে তার অন্ধকার।

ওই অন্ধকারের আভাস তার মনের সব আনন্দকে ম্লান করে তুলেছে। সে কি পারে না এই তার সামান্য পাওয়াটুকুকে সত্যি করে পেতে।

কিন্তু সুষমা রাজী হতে পারে নি।

··সুষমা বলে তা হয় না চঞ্চল। আমাকে সবই মেনে নিতে হবে।

চঞ্চল অবাক হয়—এমনি বঞ্চনা সয়েও বাঁচবে? শুনেছি তার অবস্থাও তেমন

কিছু নয়। মনের দিক থেকেও কি সাড়া তুমি পাবে? গান গাও—শিল্পীমনকে টুঁটি টিপে মেরে মিথ্যা একটা মুখোস পরে সারা জীবন শুধু সংসারের বোঝা বয়ে তিলে তিলে নিংশেষ হবে যাবে?

সুষমার দু'চোখে জল। এই মিথ্যাকেই তাকে মেনে নিতে হবে।

রাত্রির মধুর স্বপ্ন বাস্তবের কঠিন অন্ধকারে সব ফুরিয়ে গেছে। সুষমার খেয়াল হয় রাত্রি হয়েছে।

…চঞ্চলের রাত্রি কাটে তার লেখার মধ্যে। চারিদিক নীরব সুপ্তিময়। সেই কান্নার সুর তার মনের সব চেতনাকে নিথর বেদনায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

লেখাটা তাই আজ কেমন বেদনা-বিধুর আনন্দময় হয়ে ওঠে। জীবনের এই বেদনাও আজ চঞ্চলের কাছে নতুন। ভালবাসার স্পর্শ তার জন্য কান্না সে দেখে নি। এতদিন ওরা তার জীবনে কি তীব্র নেশার মতোই এসেছে। গরলজ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ওই দেহবেসাতিনিদের দেখেছিল।

কিন্তু ভালবাসা…কিছু পরম পাওয়ার স্পর্শ তাতে ছিল না। আজ মনে হয় সুষমা তার মনের সব সৃষ্টি, সব চেতনার মাঝে নিজের ঠাঁই করে নিয়েছে।

শুধু তাই নয়, তার দৃষ্টিকেও সে আচ্ছন্ন করেছে।

সমীর তার পরদিনই আসে। কাগজে তার নতুন বই-এর কথা বের হয়েছে। ছাপা হয়েছে, তার গল্প সিনেমায় রূপান্তরিত হচ্ছে। তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম বলিষ্ঠ আগন্তুক এই চঞ্চল।

এ্যাই! ওঠ! ওঠ!

চঞ্চল অনেক রাত অবধি জেগে কাজ করেছে। ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছিল। সমীরের ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসল।

বেলা হয়ে গেছে। সমীরের হাতে খবরের কাগজটা, ওর সিনেমার গল্পের খবরটা বের হয়েছে। সমীর খুশি হয়ে বলে।

—আজ তোমার নেমন্তন্ন।

—কে খাওয়াচ্চে? চঞ্চল প্রশ্ন করে।

সমীর জবাব দেয়—দেখতেই পাবে।

দেখতে পেয়েছিল চঞ্চল বৈকালে। ওকে নিয়ে গিয়েছিল সমীর, করুণাদের ওখানে। পরিচয় করিয়ে দেয়।

ছোট মেয়েটির দেহে প্রথম বর্ষার কদমগাছের সবুজ প্রাণময়তা। ওকে ঘিরে সমীরের মনে একটি সুরজগৎ। চঞ্চলের কাছে সমীরের এই পরিচয় আজ নতুন বলেই মনে হয়। করুণার মনে কি আছে জানে না চঞ্চল। তবে সমীরের একটা দুর্বলতা রয়ে গেছে ওই সুন্দর মেয়েটিকে কেন্দ্র করে।

করুণা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, ইতিমধ্যে ওর নতুন বই দু'খানা পড়ে ফেলেছে, পড়েছে কয়েকটা গল্প, করুণার কাঁচমনে ফুলের কুঁড়ির মতো একটি কামনার সৌরভময় জগৎ উঠেছে—দেখছে সে চঞ্চলকে। ওর দু চোখে ভোরের রাতের তারার মতো মিষ্টি চাহনি। চুলগুলো দু একটা এসে পড়েছে ওর মুখে চোখে। ওর হাতে যেন যাদু আছে। যাদু আছে ওর কলমে।

করুণা কৌতূহলী মন নিয়ে প্রশ্ন করে।

—যা লেখেন সব সত্যি ?

এ নিতান্ত ছেলেমানুষের মতোই প্রশ্ন—চঞ্চল হাসে মাত্র।

সমীর সাহিত্যের এই ব্যাকরণ নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। বলে ওঠে—দেখো চা হ'ল কিনা ?

চঞ্চল মেয়েটিকে দেখছে। ছন্দবদ্ধ পায়ে পায়ে করুণা চলে গেল ভিতরের দিকে চা আনতে।

কেমন দেখলে ?

সমীর কণ্ঠস্বর নামিয়ে প্রশ্ন করে।

চঞ্চলের মনে হয় ওই মেয়েটি যেন সমীরের একান্ত আপনার, নিজস্ব সম্পদ। তাই তার পছন্দের মান কেমন সেইটাই প্রশ্ন করছে সমীর।

চঞ্চল মাথা নাড়ে।

সমীর ওই করুণার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

—এমন মেয়ে আর হয় না। রূপও মন্দ নয়, তেমনি গুণ। আজকালকার মেয়েদের মতো এমন বেহায়া নয়। শ্রী-শালীনতা বোধ আছে।

চঞ্চল হাসছে। সমীরের কথাগুলো তার কাছে হাসির কথা বলেই মনে হয়। জীবনে সে অনেক দেখেছে, সব মানুষকেই কেমন তার আদিম একটা জীব বলে মনে হয়। সেই সহজাত প্রকৃতিগুলোকে ওরা মুখোসে সব ঢেকে রাখে মাত্র।

সামান্য আঘাতেই তা খুলে পড়ে। সমীর তা ভাবে না। তার কল্পনা মনের মাধুরীর সঙ্গে মিশে ওই করুণাকে ঘিরে একটি স্বতন্ত্র রূপে ফুটে উঠেছে। এই স্বপ্নকে আঘাত দিতে চায় না চঞ্চল।

করুণা চা আর খাবার নিয়ে আসে।

চঞ্চল আমতা আমতা করে, আবার এসব কেন ?

সমীর ততক্ষণে সিঙ্গাড়ায় কামড় দিতে সুরু করেছে। করুণাই বলে, একদিন তাহলে সিনেমা সুটিং দেখতে নিয়ে চলুন।

করুণার সঙ্গে সুষমার একটা তুলনাই করে চঞ্চল। সুষমার মনে একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে, মানসম্মানবোধটা তার কঠিন। তাই কোনদিনই চঞ্চলকে এসব অনুরোধ করে নি। শুধু তাই নয় করুণার মধ্যে সুষমাকেই সে যেন খুঁজছে।

একজনকে বারবার তাই মনে পড়ে চঞ্চলের। সঙ্গোপনে সুষমা তার গানের

সেই ছন্দটুকুকেও অধিকার করেছে। চঞ্চল নিজেকে কোথায় পাকে পাকে জড়িয়ে চলেছে।

রাত হয়ে আসে।

করুণার কাকীমাই ওদের খাবার আয়োজন করেছে। করুণার মা-ই আছে, বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। কাকার দয়াতেই মানুষ? চঞ্চলের দৃষ্টি এড়ায় না করুণার মুখের একটা দৈন্যের ছবি, সে জীবনে অনেক কিছুই পায় নি।

অথচ তার সাধ অনেক। এই চাওয়া-পাওয়া দুটোর মধ্যে একটা আকাশছোঁয়া ব্যবধান থাকে বলেই মানুষের মনে এত অতৃপ্তি।

অল্পে তৃপ্ত থাকা, আজ দুর্বলতার লক্ষণ। তাই সে নানাভাবে চেষ্টা করে তার সামান্য পাওয়াটুকুকে আরও বাড়াতে—ওই করুণার দু'চোখে তেমনি একটা পাবার দুর্বার নেশা।

সমীর ওর মনের সেই জ্বালার খবর জানে না। করুণা দাঁড়িয়ে আছে। ওরা বের হয়ে এল দু'জনে, চঞ্চল আর সমীর।…রাতের আবছা অন্ধকার নেমেছে। সমীর বলে—

—আজ চলি করুণা।

—এসো। করুণা হঠাৎ আমন্ত্রণ জানায় চঞ্চলকে।

—মাঝে মাঝে আসবেন কিন্তু।

ওর কণ্ঠস্বরে শুধু ভদ্রতাই নয়, আরও কি একটা ব্যাকুলতা ছিল তা চঞ্চলের দৃষ্টি এড়ায় না।

সমীরও চমকে ওঠে। ওর সুন্দর মুখখানাতে ফুটে ওটে একটা চকিত কালো ছায়া। পরক্ষণেই সামলে নেয় সে।

এ সব তার মনের ভুল ভাবনা। করুণার সম্বন্ধে এ সব ভাবনার কোন কারণ তার নেই।

জনহীন পথে নেমেছে। তারাজ্বলা রাত্রি। কোথায় একটা নীরব-বেদনা যেন দোয়েলের ডাকে আকাশবাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। সমীর বলে চলেছে।

—সংসারের দায় দায়িত্বগুলো একটু কমলে তবে একটা তখন ভাবে।

হাসে চঞ্চল।

—ঘর বাঁধার কথা?

চঞ্চল এই কথাটাকে মানতে পারে না। ঘর বাঁধা! এটা তার কাছে হাসির বলেই ঠেকে। চারিদিকে শুধু বঞ্চনা আর ব্যর্থতা। কেবল ভাঙ্গন আর ভাঙ্গন। এর মধ্যে ঘরের কথা ভেবে একজনের আগমন করার চেষ্টা কেমন দুরাশা বলেই বোধ হয়।

মানুষ আজ সামান্যতে তৃপ্তি হতে পারছে না। কার জীবনে গতি প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গেই তার আশ-পাশের সব কিছুর স্থির সত্য আর বিশ্বাসকেও আজ সে বাতিল করতে সুরু করেছে।

এই ভাঙ্গার শব্দমুখর সামনে মানুষ আজ স্থির হয়ে তার তথাকথিত বিশ্বাসের মাপকাঠি ওই শুচিতাকে কতটুকু টিকিয়ে রাখতে পারবে তা জানে না।

একদল এই ভাঙ্গন আর এই সব জীর্ণ বিশ্বাসের নিশ্চিত মৃত্যুকে সহজভাবে স্বীকার করে নেবে—অন্যদল শালীনতা, ন্যায়, শ্রী বিপন্ন বলে জিগির ঘোষণা করবে। তবু সেই ভাঙ্গনকে রোধ করা যাবে না। প্রকৃতির নিয়মে যেমন পাতা ঝরে ফুল ফোটে, তেমনি জীর্ণ সব বিশ্বাস আর অনুশাসনও বদলে যাবে। চঞ্চল বলে।

—ঘর বেঁধে শুধু দুঃখই পাবে সমীর। আজ তার কোন দাম নেই।

সমীর অবাক হয়। তার দারিদ্র্যকে ওই চঞ্চল আজ বোধ হয় ঘৃণা করে। আজকাল সে বেশ কিছু টাকা হাতে পাচ্ছে, একা মানুষ। তাই তার চোখের সামনে, শুধু অহঙ্কারের দুনিয়া। সেখানে সেই অন্তঃসারহীন দর্প ছাড়া আজ কিছুর প্রাধান্য নেই। সমীর এই কথাগুলোকে প্রলাপ মনে করে।

তার দুনিয়ায় এখনও মানুষ বদলায় নি। সে বাবা-মা ভাইবোনদের নিয়ে সুখে-দুঃখে বাঁচতে চায় একসঙ্গে। তার কর্তব্যবোধ আছে, নীতিবোধ মানে সে। অপরের জন্য ত্যাগ সে করে চলেছে। নিজের শূন্য জীবনে আর একজনকে ভালবেসে, তার ভালবাসায় পূর্ণ করে নিতে চায়। তার মনে হয় ভালবাসার অস্তিত্ব আছে। নইলে তার মতো মানুষ সারা দিন চটকলের মেসিন শপে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে এই রোজকারে তৃপ্ত হয়ে কিসের আশায় বেঁচে আছে। তাই বলে সমীর।

—ভালবাসা!

চঞ্চল ওকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে হাসে। সমীরকে আজ ও অতি সাধারণ একটি মানুষ ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। ওরা পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে বাস করে। কেরানিগিরি করে, না হয় অমনি কোন কারখানায় লোহা কাটে। ঘর বাঁধে। সাত পাকে বাঁধা সেই স্ত্রী নামক একটি অসহায় নারীকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এনে নিজের ঝামেলার জালে জড়িয়ে ফেলে পাকে পাকে। বছর বছর সন্তান জন্মায়—আর মাসকাবারের শেষে ধার খোঁজে—কাবুলিওয়ালা না হয় অফিসের দ্বারোয়ানের কাছে, চড়া সুদে। মরবার পর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পথে নামে জাতির খতিয়ানে একটা ভিখারীর দলের সংখ্যা বাড়িয়ে যায়। এদের আবার ভালবাসা।

সমীরের মুখের দিকে চেয়ে চঞ্চল বলে।

—ভালবাসার কোন অস্তিত্ব নেই। ওটাকে মোহ বলতে পারো।

চমকে ওঠে সমীর। তার সব বিশ্বাসকে ও একটা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসিতে যেন নিঃশেষ করে দিতে চায়। সমীরের কাছে ওর এই কথাগুলো একটা অবজ্ঞার আঘাত বলেই মনে হয়। জবাব দিতে চায় না সমীর। চুপ করেই পথ চলছে। চঞ্চল ওর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে বলে।

—রাগ করলে? কিন্তু কথাটা সত্যই সমীর।

সমীর জবাব দেয়।

—টাকা দিয়ে আজ সবই কিনেছে মানুষ। কিন্তু যারা অর্থ-খ্যাতি আ
প্রতিষ্ঠা দিয়ে ভালবাসার সব শুচিতাকে কিনতে চায় তারাই ঠকে চঞ্চল। নিজে
কাছে তারা নিজেদের সব বিবেক—সত্যকে অস্বীকার করে মনে মনে দেউলিয়া হয়ে
যায়। সামান্য পেতে গিয়ে যা হারায় তার দাম টাকায় হয় না।

চঞ্চল জবাব দিল না। ওই স্তোকবাক্য দিয়ে সমীর নিজেকে যেন ভোলাতে
চায়। একটা ভুলকে চাপবার জন্য মানুষ তাই ভুলের মাশুল দিতেই থাকে।

সমীর আর ওর মতবাদ দুটো সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী সে কথাটা আজ সমীরও
বুঝতে পারে। যেদিন চঞ্চলের কিছুই ছিল না, সেদিন চঞ্চল এভাবে কথা বলতে
পারে নি।

ওই সমীরই চঞ্চলকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে। তার কঠিন
পরিশ্রমে অর্জিত একমুঠি অন্নেরও ভাগ দিয়ে ওকে পুষ্ট করেছে।

আজ চঞ্চল অর্থ-খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছে। তাই তার অন্তরেরও একটা
নতুন সত্ত্বা জন্ম নিয়েছে। সে সমীরকে এমনি ব্যঙ্গ করতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা
করে না।

নির্জন রাস্তার দুপাশে সবুজ ঘাস-গাছগাছালির সীমানা। একটু আলো
পড়েছে মাঝে মাঝে। হঠাৎ গাড়িখানা ওদের দেখে দাঁড়াল, ব্রেক কসার যান্ত্রিক
কর্কশ শব্দ ওঠে।

রাস্তার একটু আলো পড়েছে ওই গাড়ির যাত্রীর মুখে। সমীর ওকে চেনে।
তাদের কারখানার একজন মাতব্বর, মিঃ দত্ত।

তরুণ কোন মরুব্বির জোরে একেবারে হাজার টাকার মসনদে এসে বসেছে।
গাড়ি হাঁকায়—কোম্পানীর গাড়ি। সমীরকে দেখেও তিনি দেখতে চান না। মুখ
চেনেন ভাল ভাবেই, কিন্তু সেই চেনাটুকুর কোন দাম নেই, শুধু সেলাম কুড়ানো
আর কাজের ত্রুটি ধরে ধমক দেওয়া ছাড়া।

মিঃ দত্ত গাড়ির দরজা খুলে সম্ভাষণ জানান, গুড ইভিনিং চঞ্চলবাবু! আসুন।
উঃ আপনার ওখানে গিয়েছিলাম মশায়। ফিরে আসছি না পেয়ে। যাক্ দেখা
হয়ে গেল। আসুন। উঠে আসুন।

চঞ্চলের এতক্ষণে খেয়াল হয়। ওর বাংলোতে যেতে হবে। আরও দু চারজন
অতিথি আসবেন কলকাতা থেকে, দত্ত সাহেব তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান
চঞ্চলেরই তাতে সুবিধা হবে। পরিচিতের সংখ্যা বাড়বে, তাছাড়া সবাই তাঁরা
উঁচু তলার লোক।

চঞ্চলের একদিকে একজন মেসিনম্যানের আকর্ষণ, অন্যদিকে মিলের এ্যাসিস্টান্ট
ম্যানেজার। তার দিকেই টানটা বেশী হবারই কথা। চঞ্চল তাছাড়া নতুন একটা
জগতের স্বাদ পেতে চলেছে ক্রমশঃ। সে জগতে অভাব নেই, জ্বালা নেই। স
বঞ্চনা ক্ষয় ক্ষতিকে সয়ে নিয়েই তারা মেশে, নীতির বোঝা বয়ে সব চিন্তা আ

নকে তারা স্তব্ধ করে দিতে চায় না, সব অকারণ বাঁধনকে ছিঁড়ে ফেলে মুক্ত মন য়ে জীবনকে উপভোগ করতে চায়।

এই জীবনকেও চিনছে চঞ্চল।

গাড়িতে উঠে পড়ল। সমীর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাকে কেউ াকল না গাড়িতে। দত্ত সাহেব গাড়ির দরজা বন্ধ করে ওর মুখের উপর একরাশ ট্রলের ধোঁয়া ছেড়ে বের হয়ে গেল।

রাস্তার নির্জনে ওই ছায়ান্ধকার পথে দাঁড়িয়ে থাকে সমীর। মনে হয় ওই ঞ্চল তার থেকে আজ যেন ভিন্ন শ্রেণীর। তার ভাবধারাতেও তাই এসেছে অন্য ্র।

চঞ্চল ধাপে ধাপে কি এক অন্য জগতে হারিয়ে চলেছে। এ এক বিচিত্র ন্মাদনা। মিঃ দত্ত, ফোরম্যান মিঃ সেন আরও অনেকেই সে রাত্রে এসেছিলেন। সেস দে, মিসেস সেন আরও অনেক পালিশকরা-মহিলাও ছিলেন। ওদের বব্ রা চুল। হালকা শাড়ির ব্লাউজটা এ যুগের আবহাওয়া ছাড়িয়ে কালিদাসের ালে ফিরে গেছে, নিটোল দেহের সব যৌবনসম্পদকে উদগ্র করে প্রকাশ করার চেষ্টা দের পোশাকে—চোখের চাহনিতে—আর কণ্ঠস্বরেও।

রঙ বদলের এই জগৎ। খাস বিলেতী মদ চোখে পড়ে চঞ্চলের। মাদকতাময় রিবেশ। বিদেশী-বাজনার সুর উঠছে। মিসেস দে-ই চঞ্চলের দিকে হাল্কা ানাগলা পানীয়ের গ্লাসটা এগিয়ে দেয়। খাঁটি স্কচ হুইস্কি। বরফের টুকরোটা াডার সঙ্গে ভাসছে, তখন ওই গ্লাস থেকে উঠছে অফুরাণ প্রাণপ্রবাহ নিয়ে দবুদগুলো।

—মাইডিয়ার! প্লিজ!

বগলের কাছে জামাটা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। দেহের কি সম্পদ পুঞ্জীভূত। র্ণশিখরের মতো সঞ্চিত হয়েছে ওই সাড়া জাগানো বুকের কাছে। চঞ্চল আজ জেকে ভাবে কোন ভাগ্যবান শ্রেণীর মানুষ।

কারখানার লেডি লেবার অফিসার মিস চ্যাড্রির মদ গেলাটার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। লিষ্ঠ পুরুষালী দেহ ওর। ডাঁটো পুরু চেহারা। ভাল করে দেখলে টের পাওয়া াবে ওর হালকা ঠোঁটের উপরেই একটু যেন গোঁফের রেখার মতো রয়েছে।

চঞ্চলের হাতটা ধরে মিস এলেন চ্যাড্রি গদগদ স্বরে বলে—মাই সুইট বয়! াভ্লি বয়!

রাত ঘনিয়ে আসে। খোলা জানালাগুলো দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢুকছে— ুকছে অযাচিত অবারিত চাঁদের আলো। কোথায় একুলের সুবাস ওঠে। রাতের ই মোহময়ী সুন্দরী রূপ-সাগরে ডুব দেবার কোন বাসনাই তাদের নেই।

কি এমন পাওয়ার সন্ধানে ওই একপাল মেয়ে পুরুষ বিভোর তন্ময় উন্মাদ হয়ে

যায়! তারপর ঝিমিয়ে পড়ে ক্লান্ত বিবশ দেহগুলো গড়াগড়ি যায় ঘৃণ্য নরকে কীটগুলোর মতো। কে বমি করছে—চঞ্চল বহুদিন পর আজ মদ খেয়েছে খেতে চায় নি।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজের মনের সেই ভীরু কাপুরুষ স্বার্থপর রূপটা ধরা পা যায়। সে সর্বকিছুকে বাড়িয়ে ভালোমানুষ সেজে আজ বাঁচবার স্বপ্ন দেখে লোভী মন। ওই আশপাশের দেখা হাজারো মানুষের সঙ্গে তার তফাৎ কোথা নেই।

জীবনকে সব কালো অন্ধকারের মাঝে সে দেখতে চায়।

—প্লিজ! মিস্ ক্যান্ডি তার সামনে পানপাত্র এগিয়ে দিয়েছে।

মাথাটা টলছে। সারা পথে যেন খানাখন্দ বিছানো। আবছা অন্ধকার প ফিরছে চঞ্চল। বনের মাঝে দূর্বার খুশির সাড়া। বাতাসে সুর ওঠে। আজ ম হয় সুষমা ওই করুণা মিস কলিন ক্যান্ডি আর কত সুন্দর মুখ ভিড় করে আসে।

সমাজের মানুষের সামনে ওরা শুধু নেশার আবেশ আনে। জীবন্ত মদ শু মনের সব ক্লান্তি অবসাদ ভুলিয়ে দেয়। ভোগেরই উপচার মাত্র এর বাইরে শিল্পমানে স্বপ্ন অনুপ্রেরণা—বাঁচবার আশ্বাস এইসব বিশেষণগুলো মানুষ ওদের শু খোসামোদ করবার জন্য দিয়েছে।

রাতের স্তব্ধতা নেমেছে, পথটা নির্জন। দূরে রেললাইনে একটা সার্চ লাই এগিয়ে আসছে, গুরুগুরু শব্দে ছুটে আসছে বিরাট ডিজেল-কাম ইলেকট্রি ইঞ্জিন।

কিন্তু তার গতিও স্তব্ধ হয়ে আসছে, অসহায় আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে ইঞ্জিন ধিকোতে ধিকোতে। আবছা অন্ধকারে কারা ছুটছে? মাথায় কি সব মালপত্র রেললাইনের ধারে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াগন ভাঙার শব্দ আসে। জানে চঞ্চ গোবিন্দের চায়ের দোকানের সেই এককড়ি শ্রীদাম-এর দলের যৌথ-কারবার এটা।

…হাসছে চঞ্চল আপন মনে। লুটের দিন। যে যেদিকে পারছে সুবিধা ক নিয়ে চলেছে। এই লুট করার সাহস যাদের নেই তারাই ভালোমানুষের রূপ দি সেই ক্লীবত্বকে ঢাকতে চেয়েছে। মনে হয় তার যদি ক্ষমতা থাকতো সে ওই বু হরিপদবাবু, সমীর ওই সদানন্দ মাস্টারের সামনে চালের বস্তাগুলো ফেলে দি যেতো, দেখতো তারা নেয় কিনা?

মেয়েছেলের দিকে সমীর চায় না?…

হাসছে চঞ্চল। ও দেখেছে সমীরের সেই মেয়েটিকে। গোলগাল কচি মি মুখখানা। সমীর ওই মেয়েটার হৃদয়-সিংহাসনের একচ্ছত্র অধিপতি হতে চায়।

চাল-ডাল বাক্স-ট্রাঙ্কের মতো একেবারে তাকে নিজস্ব সম্পত্তি করে রাখতে চায় ওকে মানুষ বলেই ভাবতে পারে না। এটা চঞ্চলের কাছে সমাজতান্ত্রিক কালে দাবীর মতোই অর্থহীন ঠেকে।

হাসছে! হঠাৎ সামনে কাকে দেখে দাঁড়াল।

বৃদ্ধ সদানন্দবাবু ওপাশের কলোনীতে একটি অসুস্থ ছাত্রকে দেখতে এসেছিলেন। ় হয়ে গেছে ফিরছেন বাসার দিকে। ওরা তাকে এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। কিন্তু নই তাদের নিষেধ করেছেন। একাই যাতায়াত করেন তিনি। পথের মধ্যে কার পজড়িত কণ্ঠের হাসি শুনে সেই মূর্তিটার দিকে চেয়েই অবাক হন। চমকে ান সদানন্দবাবু!

তুমি!

চঞ্চলকে রাত্রি গভীরে এসব এলাকায় এমনি মদ্যপ অবস্থায় দেখবেন কল্পনাই ান নি তিনি। সদানন্দবাবুর এত কালের নীতিবোধ, কর্তব্য সচেতনতা, বিকতা একসঙ্গে একালের নিষ্ঠুর এক সর্বনাশের ছবি দেখে শিউরে উঠেছে।

তুমি! চঞ্চল! তুমি না শিক্ষক!

চঞ্চল বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থাকে। দু চোখ কেমন জড়িয়ে আসছে। মাথার মধ্যে ্ঝিম্ করছে একটা নীল স্বপ্নের আভাস। তার মাঝে ওই বৃদ্ধের কঠিন কঠোর নি দেখে সে অবাক হয়।

—যাঃ বাবা! আপনি…মানে…সদানন্দবাবু ঃ

ঘৃণায় সদানন্দবাবুর কণ্ঠস্বর বুজে আসে।

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ তুমি এত নীচ। তোমার কাছে এইসব আশা করি নি।

বৃদ্ধ আর দাঁড়ালেন না। আজ রাগে অপমানে তার সারা শরীর জ্বলে ওঠে। থও পান তিনি—চারিদিকে ভাঙ্গনের মুখে তবু কিছু মানুষ আজ সচেতন ছে, দুঃখের রাত্রির প্রহরে প্রহরা দিয়ে তারা এখনও মানুষের কল্যাণবোধকে িগয়ে রেখেছে।

কিন্তু সেই শিক্ষকদের একজনকে আজ রাতের অন্ধকারে ঘৃণ্য চোরের মতো সেই তবোধের প্রাসাদে সিঁদ কাটতে দেখেছেন।

চঞ্চল তখনও বিড় বিড় করছে, আশা করেন নি এসব। কিন্তু চঞ্চলও কি য়েছে! এতদিন শুধু খুঁজে ফিরছিল কোথায় শান্তি তৃপ্তি। চাবুক খাওয়া নায়ারের মতো শুধু ঘুরেছে সে। হঠাৎ দেখেছিল সুষমাকে।

ভালো লেগেছিল, কিন্তু তার লোভী মনও হঠাৎ কিছু পেতে চেয়েছিল। সে তো ঘর বাঁধতো তার বেবশ মনটাকে ঘরমুখী করে তুলে শান্তির সন্ধান করত। মাই সেদিন জানিয়েছে তার পথ নেই। বাবা মা ওই সন্নীরকে সে আঘাত দিতে রবে না।

অথচ আর একজনকে আঘাত দিতে তার একটুকু বাধবে না। ভালবাসা। স আসে চঞ্চলের।

পথের একটা মানুষকে সে বিশ্বাস করতে পারে না। ওদের ভালবাসা নয়— লা একটা বাসা তারই সন্ধান চাই প্রথম। করুণাকেও দেখেছে চঞ্চল।

সদানন্দবাবু ওই চঞ্চলের লেখার কথা শুনেছেন। কিন্তু আজকালকার লেখকদের লেখা তার পড়াশোনা নেই। তিনি মানেন একালের সাহিত্যের শেষ পরিণতি ওই শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই। তারপর আর যাঁরা আছেন—তাঁদের পর এই বর্তমান তরুণ লেখকদের মনের দৈন্য তাঁর জানা হয়ে গেছে। এরা শুধু একালের পাঁকেই ডুবে আছেন। তবু তারাশংকর বিভূতিভূষণ বনফুলের লেখার পর এযুগে সেই দৈন্যটা আরও প্রকট।

চঞ্চলকে রাত্রে ওই অবস্থায় দেখে শিউরে উঠেছেন তিনি। একজন শিক্ষক—লেখক এমনি হতে পারে তা জানতেন না। কৌতুহলী মন নিয়ে চঞ্চলের দু'চারটে গল্প নতুন বইগুলো পড়তে থাকেন।

কেমন যেন যুগ বদলে গেছে বলে মনে হয়। ভাষাটা আরও স্বচ্ছ পরিষ্কার; তেজী ঘোড়ার মতো সেটা সতেজ প্রাণময়। কিন্তু বিষয়বস্তু! ওই পথে ঘাটে—ইস্টিশানে দেখা মেয়েছেলেদের কথাই বলেছে। ওদের মনের অতলের পাঁকটাই এখানে বড় হয়ে উঠেছে। ভালবাসার কোন স্বাদ নেই—বেদনা নেই। আছে শুধু অন্ধ জ্বালা। ওরা জ্বলছে—সেই বেড়া আগুনে নিজেরা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

বিরাট ঝড়ের পর পৃথিবীকে ঘিরে একটা প্রশান্তি নামে। বর্ষণসিক্ত মাটি সরস হয়। দেখা দেয় নবাঙ্কুর।

চঞ্চলের মনে হয় কাল রাতে তার দেহমনে একটা ঝড় বয়ে গেছে। সব চিন্তা ভাবনাগুলোর মূল অবধিকে ঘেঁটে ঘুঁটে একটা নোতুন সাড়া তুলেছে, সকালের মিষ্টি আলোয় আজ ভেসে ওঠে নহবতের সুর।

সুষমার বিয়ে।

সুষমার মা—হরিপদবাবু বারবার করে বলেছেন তাকে ঠিক। দরকার হলে বালতি হাতে পরিবেশন করতে হবে। চঞ্চলের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই ছবিটা। কনে চন্দন পরে পিঁড়িতে বসবে লজ্জাশীলা একটি মেয়ের ভাণ করে; সামনে অপরিচিত সেই টাক মাথাওয়ালা ভদ্রলোক। গরদের জোড় পরেছে, কপাল আর মাথার সীমারেখা মুছে গেছে টাকের দৌলতে। তাই চন্দনের ফোঁটাগুলো দেখে মনে হয় ময়দানের উপর যত্রতত্র ঘাসফুল ফুটেছে।

শাঁখ বাজে, উলুধ্বনি ওঠে। শুভদৃষ্টি হচ্ছে।

হাসি আসে চঞ্চলের। যে দৃষ্টি কত মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, আজ একজনের ক্ষেত্রে তাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে শুভদৃষ্টি। সবটাই সেই বিশ্বাস আর মনগড়া সংস্কার দিয়ে তৈরী। মিথ্যা স্তোক দিয়ে দুজনকে একটা বাঁধনে বাঁথার প্রচেষ্টা মাত্র। আশ্বাস দেওয়া হয় তোমার হৃদয় আমার হৃদয় এক হোক। আজীবন তোমাকে প্রতিপালন করব।

মাথায় তুলে দেওয়া হ'ল লজ্জা বসন।

ঘোমটার আড়ালে লোহার বাঁধনে কোন হৃদয়কে বন্দী বেদনায় রক্তাক্ত করে অন্তঃপুরের আড়ালে নির্বাসিত করা হ'ল।

একটি রাজ্যজয় সম্পূর্ণ হয়ে গেল, একটি নারীর মনোরাজ্য তার দেহমন। তার পর দিনই স্বামী দেবতা আবার নিশীথরাত্রে কোন কুখ্যাত পল্লীতে সেই পূর্বপরিচিতার কাছে যাবেন। স্ফূর্তিআর্তি করবেন, দয়া করে ঘরে ফিরবেন। স্ত্রী সেই অপমান মুখ বুজে সহ্য করে তার বন্দীজীবনের স্মারক চিহ্ন বয়ে বেড়াবে লোহার বেড়ি আর মাথায় রক্তলাঞ্ছিত সিঁদুর পরে, প্রতিবাদ করলে সমাজ তাকে দুষবে, সুষমাকেও এইসব বাঁধন মেনে নিতে হবে। কিন্তু কেন সুষমা পারল না এর প্রতিবাদ করতে। বৈদ্যবাটির সেই গোলগাল ভদ্রলোককে চেনে চঞ্চল। অতীতে ওইখানেই কিছুদিন ছিল সে। বাজারে আলু কুমড়োর গুদামে খাতা লেখার কাজ করেছিল কিছুদিন। তার মালিককে রাতের বেলায় গুদামের চাবি পৌঁছে দিতে হতো বিশেষ একটি জায়গায়।

শেওড়াফুলি রেল-বাজারের ওপাশেই পুরানো চুণ-পলেস্তারা খসা ভুতুড়ে সেকালে বাড়ির ভিড়। একতলা দোতলা ছোট ছোট বাড়িগুলো এর ওর ঘাড়ে পড়েছে, সরু খোয়া বাঁধানো গলি—ওপাশে বাঁশবনে আঁধার নামে।

সেই প্রায়ান্ধকার পাড়াটার বিশেষ একটি ঘরে চঞ্চলের মালিক বসতেন। ওই পাড়াতেই দেখেছে প্রায় গোলগাল বিপত্নীক বুভুক্ষু সেই ভদ্রলোককে।

ওপাড়ার রীতি হচ্ছে দেখা হলেও কেউ কাউকে চিনবে না। অনেকের অবশ্য তখন চেনার মতো অবস্থাই থাকে না। শীতকাল হ'লে তো কথাই নেই। আলোয়ান নিশ্চয়ই থাকবে তাতে মুখ চোখ কান ঢাকার সুবিধা, বর্ষাকালেও ছাতা সম্বল। হেলিয়ে দিলেই আড়াল! ব্যস।

মেয়েগুলো দরজার আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা হাসাহাসি করে।

ওরে নাড়ুগোপাল এসেছে?

গোপালবাবুকে ওরা আদর করে ডাকতো নাড়ুগোপাল বলে।

চঞ্চল সেই গোপালবাবুর কথাও বলে নি ওদের। ওদের স্বপ্ন নিয়েই ওরা থাক। তাছাড়া শুনেছিল গোপালবাবুর নাকি পয়সাকড়ি বাড়ি—জমি-জেরাত আছে।

সুষমার কথা ভাবতে পারে না, মনের একটা জায়গায় বেদনা এতটুকু বাজে। যুক্তি তর্ক আর অবহেলা দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে আজকের মানুষ। কোন বাঁধনকে মানা মানেই বোধ হয় ওদের কাছে পরাজয়। তবু বারবার মনে হয় সুষমা যেন তার জীবনে সঞ্চরণশীল একটি আলোকবিন্দু। ওকে ঘিরে রং-এর বর্ণালীই ফুটে ওঠে সারা অন্তর মনে।

…সানাই বাজছে। সমীর একবার এসে কি হড়বড় করে বলে ফিরে গেছে। ঘুরছে চর্কির মতো। চঞ্চলের ওখানে যাবার যে কারণটা ছিল তা মিটে গেছে।

সুষমার মা মুখফুটে কথাটা বলতে পারে নি, তবু আভাস ইঙ্গিতে জানিয়ে ছিল। সেটা চঞ্চলও জানে। গরীবের সংসার। এত টাকার খরচ…

চঞ্চলের হাতে কিছু পয়সাকড়ি আসছে। চঞ্চলই ওর হাতে তুলে দিয়েছে কয়েকশ' টাকা।

এতটা আশা করে নি কল্যাণী। নোট এবং বাণ্ডিল কটা দেখে একটু চমকে ওঠে।

—চঞ্চল।

ওর মুখ চোখে কৃতজ্ঞতার ছায়া। চঞ্চল ওকে দেখছে। এতদিন এতটা স্নেহ ভালবাসা প্রকাশ পায় নি। সমীরকে বরং আড়ালে অনেক কথাই বলেছে চঞ্চলের সম্বন্ধে। সুষমাকেও বকেছে ওর সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য।

আজ সেই কল্যাণী বদলে গেছে।

চঞ্চল দেখছে শুধু এই পরিবর্তনটা, মনুষ্যত্বও আজ বিক্রির পশরায় পরিণত হয়েছে। স্নেহ প্রীতি ভালবাসাও পণ্য-দ্রব্য আজ। তাই ওগুলোর বোধ হয় দাম অনেক কমে গেছে। কল্যাণী ওর হাত দুটো ধলে বলে।

—বাঁচালে বাবা! কি বিপদেই না পড়ে ছিলাম। আজ এইখানেই থাকো বাবা।

চঞ্চল বের হয়ে আসে—পরে আসবো।

—এসো কিন্তু নিশ্চয়। কল্যাণীর কণ্ঠস্বরে আজ মধু ঝরে পড়ে।

তাই বোধ হয় চঞ্চল আজ যায় নি।

সন্ধ্যা নামছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে গঙ্গার কলকল্লোলে মিশেছে সানাই-এর সুর। ওই গঙ্গার বুকেই একদিন তলিয়ে যেতো চঞ্চল তবু বেঁচে ছিল। সেই বাঁচার আশ্রয়টুকু আজ চলে গেল।

দেবদাসের কথা মনে পড়ে। পারু আর দেবদাস—ছেলেবেলায় পড়বার চেষ্টা করেছে চঞ্চল কিন্তু কখনও শেষ পর্যন্ত পড়তে পারে নি। চোখের জলে সব অক্ষরগুলো আবছা হয়ে আসতো।

অতীতের সেই কিশোর মনটাকে আজ খুঁজে পেতে ইচ্ছা করে। বাঁচার তাগিদে সেদিন চারিদিকের মানুষ এমনি হাহাকার করে নি। এমনি করে প্রীতি ভালবাসা প্রেমকে পশরায় পরিণত করে নি। কালাপাহাড়ের মতো নীরব ঘৃণা আর বুকভরা বেদনা নিয়ে তার সব সামাজিক বন্ধন সংস্কারকে ভেঙ্গে চুরমার করবার মতো দুর্বার হয়ে ওঠে নি।

সেই শান্ত সবুজ গ্রামসীমায় দু'টি কিশোর মন নীরব কান্নায় আজ হারিয়ে গেছে। মরে গেছে। আজকের যৌবন তাদের চেনে না।

সদানন্দবাবুকে ঢুকতে দেখে চঞ্চল একটু অবাক হয়।

ক'দিন স্কুলে গেছে চঞ্চল। ক্লাশ করেছে। সদানন্দবাবু আসেন অফিসে বসে কাজকর্ম দেখে চলে যান। ওর সঙ্গে কোন কথাবার্তা হয় নি।

আজ তাকে এখানে তার ঘরে আসতে দেখে একটু অবাক হয় চঞ্চল।

লিখছিল, কাগজ কলম সরিয়ে একটা চেয়ার টেনে দেয়।

—বসুন।

সদানন্দবাবুর মুখখানা গম্ভীর। দাড়ি-গোঁফ ঢাকা মুখখানায় কি চিন্তার ছায়া।

—আজকাল লিখছ শুনলাম। সিনেমাতেও বই হচ্ছে? সমীর বলছিল। চঞ্চল বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থাকে। সদানন্দবাবু স্থির কণ্ঠে বলেন।

—তবে একটা আদর্শের কথা আছে এর মধ্যে। তোমার মতকে মানি না মানি সেটা প্রকাশের স্বাধীনতা তোমার আছে, তবে ভুল কি ঠিক, জানি না। মনে হয়ে শিক্ষকতার পথে সেই মতটা আদর্শ বিরোধী!

চঞ্চল ওর দিকে চাইল।

—আমি কি এই জ্বালা, এই যন্ত্রণার কথা বলে অন্যায় করেছি?

—অন্যায় করেছো কিনা জানি না। তবে জ্বালাটাই কি সব? তার মাঝে মানুষ আজও বেঁচে আছে। বেঁচে থাকবে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে। কিন্তু তোমার সাহিত্য শুধু জ্বালার সেই সর্বনাশ রূপটাকেই দেখেছ। দেখেছ তার বিকৃতি, কদর্য বিকৃতিকে। মনুষ্যত্বকে কোথাও স্বীকৃতি দাও নি—দিতে চাও নি। শিশুদের মনে কিশোরদের অন্তরে এই সত্যটা গেঁথে দিতে হবে; তুমি তা পারবে না।

চঞ্চল ভাবছে! একদিন রাত্রে তাকে মদ্যপ অবস্থায় দেখেছিলেন উনি। সেই ঘটনা থেকেই এই সিদ্ধান্ত কিনা কে জানে। প্রশ্ন করে চঞ্চল।

—একদিন রাত্রের ঘটনাকে কেন্দ্র করে···

হাসেন সদানন্দবাবু।

—না। তাহলে পরদিনই একথা তোমায় বলতাম। তোমার সব লেখা আমি পড়লাম। এই ধ্বংসের রূপটাই চোখে পড়লো। তোমার কলমে জোর আছে—সত্যিকার পথ কি দেখাতে পারো না? অন্ততঃ মানুষের কল্যাণের জন্য দুটো কথা? পথ দেখাতে না পারো—তাদের বিভ্রান্ত করবার কোন অধিকার তোমার নেই। অনেক সভ্য ধনতান্ত্রিক দেশে শুনেছি শিল্পী সাহিত্যিকদের কোন গোপন পথে প্রচুর অর্থ দিয়ে কিনে নেওয়া হয়, যাতে তারা সাধারণ মানুষের সামনে সর্বদাই একটা বিভ্রান্তি আর বিকৃতির রঙ্গীন জগৎ নেশার মতো দেখিয়ে রাখে। তারা মদ দিয়ে বিবেককে ভোলায়—তেমনি শিল্প সাহিত্যকেও লাগায় সেই কাজে।

চঞ্চল বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থাকে। তার মনে একটা ঝড় ওঠে। কি সত্য মিথ্যা তা জানে না সে। তবে নিজের দর্শনের পিছনে কারোও যুক্তি নেই। একে তার চোখেই দেখেছে, তার জ্বালাভরা মন নিয়ে ভেবেছে। তার মনের আয়নায় যদি আজ ভাঙ্গ লাগার পারাটা খুলে যায় ঠাঁই ঠাঁই, ছবি তাতে বিকৃত হবেই। তার দোষ কি!

সদানন্দবাবুকে বাকী কথাটা বলতে হয় নি। চঞ্চল পরিষ্কার জেনেছিল

সদানন্দবাবু কেন এসেছেন। আজ তাকে ওরা বিশ্বাস করে না। অন্তর থেকে হয়তো ভয় আর ঘৃণা করে। চঞ্চলই কাগজ তুলে নিয়ে তার পদত্যাগপত্র লিখে ওর হাতে দেয়। বলে—

—এর জবাবে আমি কিছুই বলবো না মাস্টারমশায়, আপনি যা চান সেইটাই নিয়ে যান।

সদানন্দবাবু ওর দিকে চাইলেন। তিনিও অবাক হয়েছেন, চঞ্চল যে এমনি করে জবাব দেবে তা ভাবেন নি। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি চিঠিখানা পকেটে পুরে বলেন।

—মতের দিক থেকে আমাদের মিল নেই সত্য, তবু বলবো চঞ্চল—আমার বয়স হয়েছে, তোমার চেয়ে অনেক বেশী দেখেছি। শিল্প কর্মকে তারুণ্যের মত্ততায় বিকৃত করো না। পরদেশের ভাব ভাবনাকে ষোলআনা আমাদের ঘরে আনা যায় না। মাটির পার্থক্য যাবে কোথায়?

চঞ্চল চুপ করে বসে আছে। একটা বাঁধন খসে গেল—ওই স্কুলের নীতিবোধের কঠিন বাঁধন। সুষমার মুখখানাও মনে পড়ে।

সানাই-এর শব্দ ছাপিয়ে শাঁখ বাজছে···উলুধ্বনির সাড়া ওঠে।···বিয়ে হচ্ছে।

সুষমাও তাকে মুক্তি দিয়ে গেল।

কোন বাঁধনই তো মানে নি চঞ্চল। জোর করে দাবী জানায় নি। পেতে চায় নি একান্তে সমীরের মতো সেই করুণাকে।

কি সে চায়? লেখার মধ্যে খ্যাতি প্রতিষ্ঠা?···তাও নয়। তবে কেন বার বার আগুনে সে হাত দিতে যায়? এ বোধ হয় তার খেলা। অফুরান জীবনধর্মের কি প্রচণ্ড প্রকাশ!

সহজ মন নিয়েই বের হল সে সুষমাদের বাড়ির দিকে।

কথাটা চাপা থাকে নি। সমীরও শুনেছে। সদানন্দবাবু এবং স্কুলের কর্তৃপক্ষ একমত হয়ে ওই চঞ্চলকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে।

গোবিন্দের চায়ের দোকানেও এই নিয়ে আলোচনা হয়। এককড়ি ঘোষ শ্রীদাম সরকার তিনুদাসও এসে জোটে। ইদানীং চাল চালানোর কারবারে বেশ দু'পয়সা আসছে। গোবিন্দও তার চারের দোকানের পাশেই আর একখানা ঘর নিয়েছে। সেও ব্যবসা ফলাও করে চালিয়েছে।

নতুন ঘরখানার সাজ-সজ্জাও আলাদা। নতুন চেয়ার টেবিল এসেছে। ওখানে সব খদ্দেরের প্রবেশাধিকার নেই। চায়ের কাপ সামনে রেখে—ওখানে গ্লাসে পানীয় সরবরাহ করা হয়—তাজা পানীয়।

তিনু ঘোষ ইদানীং সাইকেল ছেড়ে স্কুটারে যাতায়াত করে। পোশাকও বদলেছে। এখন ধুতি সার্টের বদলে পরে টেরিকটের প্যাণ্ট আর সেণ্টপারসেণ্ট টেরিলিনের সার্ট। খাস বিলাতী মাল।

ওরাই সেদিন ঘিরে ধরেছে চঞ্চলকে।

চঞ্চল চাকরি ছেড়ে এবার লেখায় মন দিয়েছে। তার লেখার কদর যেন রাতারাতি বেড়ে গেছে। ওই রাতের অন্ধকার জগতটাকে সে চেনে। একটা সমাজের জীবনের বিচিত্র কাহিনীকে দেখেছে নিরাসক্ত দর্শকের মতো।

তার জন্য সে ওই দত্ত-সাহেবের অতিথিদের কাছে কৃতজ্ঞ। মিস কলিন ক্যাণ্ডিই তাকে এই জগতের পথে নিয়ে গেছে। কবোষ্ণ উত্তেজনাময় সেই জগতে। প্রাচুর্য আর বিকৃত বাসনার সেই উদগ্র নেশাময় জীবনকে সে দেখেছে।

তার লেখায় তারই আভাস, তার সঙ্গে চোখ মেলে দেখেছে এই ফুলে ওঠা সমাজ, অন্যদিকে রাস্তার মানুষ ওই প্লাটফরমের জনতা, তাদের বাড়ি ঘরকেও।

এককড়ি গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলে—তুই কি এতবড় লেখক—ছবির পর ছবি হচ্ছে। এত বই—এতবড় কেউ-কেটা। তুই করবি ওই বুড়োর স্কুলে চাকরি? গুলি মার। তিনু ঘোষ ইদানীং বহু পয়সার মুখ দেখেছে রাতারাতি কি সব মালপত্র যোগান দেবার মস্ত কনট্রাক্ট পেয়ে গেছে। বাজারের মানিক সামন্ত এতকাল চটকলের তাবৎ মাল যোগান দিয়েছে, দত্ত সাহেবের সঙ্গে কি কথা-কাটাকাটি হওয়ায় মানিক সামন্ত সেই সাপ্লাই-এর কাজ ছেড়ে দিয়েছে এককথায়।

ওই চঞ্চলের চিঠি নিয়ে তিনু ঘোষই দেখা করে দত্ত সাহেবের সঙ্গে তারপর কোন মন্ত্রে তিনু তাকে বশ করে ফেলে বছর খানেকের মধ্যেই লাল হয়ে গেছে। অবশ্য লোকে বলে এ ছাড়াও তিনুর অনেকরকম কারবার আছে।

তিনু বলে—বেশ করেছো চঞ্চলদা, লিখেই তো এতসব। দাও দিকি ওই বুড়ো সদানন্দবাবু আর ওই সেক্রেটারী গোকুলবাবুর নামে একখানা বই লিখে। সবারই কাহিনী আমি জানি ওই···তিনু গলা নামিয়ে তারপর মালের মুখে কাঁচা খিস্তী করতে থাকে।

হাসে শ্রীদাম সরকার।

—সমীরের বাড়ির কথা শুনেছো? ওর বোনদের কথা?

চঞ্চল চমকে ওঠে। ওর মাথায় মদের হালকা আবেশটা কি সুর তুলেছে। তার সামনে এখন উজ্জ্বল জগৎ। কলকাতার সমাজের সেই জীবনকে দেখেছে, বালিগঞ্জের নতুন ফ্ল্যাটের মিসেস দেকেও দেখেছে। স্বামী কোন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। গাড়ি-বাড়ি, ছেলেমেয়েরা পড়ে বাইরের কোন বোর্ডিং-এ থেকে। মিস ক্যাণ্ডি-র বন্ধু।

মিসেস দে ওকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সাদর আমন্ত্রণ। দে সাহেবকে কোম্পানীর কাজে বাইরে বাইরে থাকতে হয়। আজ দিল্লী, কাল বোম্বে, মাদ্রাজ এমনি ঘুরতে হয়। সারা বাড়িটায় বেয়ারা বাবুর্চি আয়াদের নিয়ে মিসেস দের সংসার। বয়স হয়েছে তা বোঝবার উপায় নেই।

প্রাচুর্য আর প্রসাধনে রূপযৌবন বাঁধা পড়ে গেছে।

নিজেই গাড়ি নিয়ে বের হ'ন। চঞ্চল তার সঙ্গেও ইতিমধ্যে কয়েক দিন ঘুরছে।

বর্তমানের সাহিত্য চিত্রকলা সিনেমা সব বিষয়েই মিসেস দের একটা অভিমত আছে। সেদিন মিস্ বলেছিল চঞ্চলকে।

—কেমন লাগছে মাই চঞ্চল—ওই মিসেস্ দেকে?

চঞ্চল ওই বয়স্কা মহিলার চোখে দেখেছিল কি ইঙ্গিতের আভাস।

ক্যান্ডিকে সে দেখেছে। কেমন বাঁধনহারা একটি মেয়ে—জীবনে সব কিছু না পেয়েও মনের খুশীর জগতে আছে। ক্যান্ডি তার হাতে একটা মিষ্টি চিমটি কেটে বলে।

—সি ইজ সিম্‌প্লি চার্মিং।

ওই বিচিত্র কামনাদির জগত চঞ্চলকে ইশারায় ডাক দেয়। নেশার তন্ময়তায় ডাক দেয়। সেই হারানো মানুষটা দুদিনের জন্য ঘরের এতটুকু সামান্য নিয়ে শান্তির স্বপ্ন দেখেছিল এখানে। সুষমা—ওই করুণার কথা মনে পড়ে।

সুষমা—তার বোন প্রতিমা সেই ছোট্ট বাড়িতে অভাবের মধ্যে একদিন এসে উঠেছিল অপরিচিত একটি সর্বহারা তরুণ। কতদিন সমীরের সঙ্গে দেখা হয় নি। কোলকাতার একটা হোটেলে সিঙ্গল রুম নিয়ে থাকে তবু এখানকার বাড়িটা রেখে দিয়েছে। আসে মাঝে মাঝে। এই মাটির সঙ্গে একটা যোগ তার রয়ে গেছে বোধ হয় ওই বাড়ি সাথে—একটি নারীর সঙ্গে বিচিত্র যোগ।

উঠে পড়ে চঞ্চল। তিনকড়ি বলে।

—উঠলে যে আবার সাহেব? ঘরটা বেশ ভালোই! ট্রাই এগেন আর কি বুঝলে ব্রাদার।

চঞ্চলের অবস্থা আজ বদলেছে। তার হাতেও বেশ টাকা জমেছে। বাজারে এখন টাকা যেন ছড়ানো। হাত পাতলেই সেই হাতের শূন্য মুঠি বোঝাই করে দেবার জন্য অনেক প্রকাশকই ঘোরাঘুরি করছে।

মনে হয় এমনি ভেসে বেড়ানোর চেয়ে একটা ঘরবাড়ি করতে হবে। জীবনে একদিন ঘুরেছিল নোংরা ঘৃণ্য সমাজে আজ সমাজের উঁচুতলার জীবনকে দেখেছে মনে হয়েছে দুটোর মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে।

একশ্রেণীর মানুষ সেই নীচতাকে প্রকট করে তোলে, কামনার আগুনে সব পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। অন্যশ্রেণী সভ্যতার আড়ালে সেই পাশব প্রবৃত্তিটাকে ঢাকবার চেষ্টা করে।

আসলে মানুষ মূলতঃ একই। শুধু তফাৎ পরিবেশ বেশবাস এবং অর্থ সাকুল্যের।

…তবু কোথায় এর মধ্যেও একটা সুর আছে। জীবন সেখানে একটি শাশ্বত মধুর সুরে বাঁধা। কামনার জ্বালা সেখানে স্তব্ধ। অন্তরের শুচিতায় সে প্রকাশিত। সেই মনকে আজ সে অবিশ্বাস করে না।

রোদে মাথাটা ঝিমঝিম করছে। খর রোদ। দুনিয়াটা বুক চাপার জ্বালায় শুধু জ্বলছে। বাতাসে ওঠে আগুনের হল্‌কা।

…ধুলো বালি রাস্তার টুকরো কাগজ এঁটো শালপাতাগুলোকে সেই দমকা ঝড় উড়িয়ে নিয়ে চলেছে কি সর্বনাশা মাতনে!

কড়াটা নাড়ছে। জীর্ণ কপাট। এ বাড়ির সামনে বহু দিন এসেছে চঞ্চল। অনেক স্মৃতি জড়ানো। দুপুরের রোদে ঝিমুচ্ছে বাড়িটা একটা বুড়ো অথর্ব জানোয়ারের মতো।

দরজাটা খুলে যায় সশব্দে। চমকে ওঠে চঞ্চল।

বাধা পেল যেন ঢুকতে। ওই প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। কোন জৌলুষ নেই, ক'বছরেই সে ম্লান। একটা তাজা ফুল যেন খররৌদ্রে কুঁকড়ে শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। নিটোল স্বাস্থ্যও ফুরিয়ে আসছে, সুন্দর চোখের কোলে কালি। চোখের চাহনিতে সেই নেশালাগানো মাদকতা নেই, কি অপরিসীম হতাশা আর বেদনা ঝরে পড়ে।

সুষমা আশা করে নি দেখবে সে চঞ্চলকে।

আজ সে অনেক সুন্দর হয়েছে। পরণে কাঁচি ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী, পায়ে চকচকে পামসু, হাতে থ্রি ক্যাসেলস্ সিগারেটের সবুজ টিন, রোদে ঘামছে! রুমাল বের করে কপাল ঘাড়টা মোছে। একঝলক মিষ্টি সুবাস বের হয়।

—তুমি! ভেতরে এসো।

চঞ্চলকে সেই-ই আমন্ত্রণ জানায়। প্রতিমাও সাড়া পেয়ে বের হয়ে এল। সেও আজ রূপবতী একটি নারীতে পরিণত হয়েছে।

প্রতিমাই বলে।

—বাব্বা! এখন তো মস্ত লোক। আমাদের কি আর মনে পড়ে? গরীবদের—

হাসে চঞ্চল। ওর হাসিটারও এখন রকমফের হয়েছে। পাঠক স্তাবকদের জন্য একরকম হাসি, প্রকাশক সিনেমা প্রযোজকদের জন্য অন্যরকম, আর নারী সমাজে রাতের অন্ধকারেও সে হাসে নীল নেশালাগানো সেই হাসি। এখানে তার বিনা কারণেই হাসি বের হয় এটা বিচিত্র হাসি।…অপরাধই করেছে সে।

—শরীর খারাপ?

সুষমা জবাব দিল না। ওটা আজ সে ভাবে না। শরীরের গুরুত্ব নেই—তার ব্যথা জমেছে মনে। হতাশার পুঞ্জ বেদনা!

গান চলছে কেমন?

গানও ভুলে গেছে সুষমা। ওরা একটা মুক্ত পাখীকে খাঁচায় বন্দী করে রেখেছে। কল্যাণীই বলে আজ এসেছো, না খেয়ে যাবে না।

চঞ্চলের সন্ধানী দৃষ্টির সামনে সুষমার মনের বিপর্যয়টা পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে।

রাত নামে।

আজ চঞ্চল ফিরে যেতে পারে নি। সমীরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বৈকালে।

অনেক দিন পর পাহাড়ী নদীকে দেখলে ঠিক চেনা যায় না। এক বর্ষার বন্যায় তীরে তীরে তার ভাঙ্গন ঘটে—নদীর বুক বুজে কোথাও পড়ে পলিচর, কোথাও দ-ই হয়ে যায়। কোন শ্যামল বনস্পতিকে সে উপড়ে ফেলে ধু ধু প্রান্তরের নিঃস্বতায়।

···সমীরকে দেখে চঞ্চল চমকে ওঠে। সেই সুন্দর স্বাস্থ্য হাসি-খুশী-ভাব আর নেই। গাল দুটো কে যেন চড়িয়ে ভেঙ্গেছে, চোখের কোলে জমাট কালির দাগ। সে মানুষটি তাকে বাঁচিয়েছিল তুফান থেকে, সেই সুস্থ সবল মামুষটা তুফানেই আজ তলিয়ে যাচ্ছে।

—কেমন আছে ?

—ভালোই। সেই উষ্ণতা আর নেই ওর কণ্ঠস্বরে। ময়লা সার্ট আর প্যাণ্টকে পাট করতে করতে বলে।

—নাইট ডিউটি আছে মা, ওভারটাইম কিছু মিলবে।

কল্যাণী ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। জানে ওই পয়সাটুকুর তার দরকার। দুরন্ত অভাব এই সংসারের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে তাকে কাবু করে চলেছে। হরিপদবাবু ধুঁকছেন? এ বাড়িতে তার ওই কাশির শব্দটা আর্তনাদের মতো শোনায়। চঞ্চলকে তারা সকলেই দেখছে কি অন্যদৃষ্টিতে।

জীবন ওর সঙ্গে বেইমানি করে নি, সে আজ প্রতিষ্ঠিত অর্থবান। হরিপদবাবু বলেন।

—মরার সহজ উপায় অনেকবার ভেবেছি বুঝলে চঞ্চল। এমনি করে তিলে তিলে শুকিয়ে না খেয়ে মরা, অসহ্য দুঃখ আর অপমানে বাসকরার চেয়ে মরা অনেক ভালো। কিন্তু তবু মরতে পারি নি। কি আশা নিয়ে বেঁচে আছি বলতে পারো? এক মেয়ে সুখী হ'ল না, প্রতিমা কোথায় চাকরির চেষ্টা করছে। ছেলেটার জীবনে শুধু অভাব আর দুঃখ। ওর কোন সাধই পূর্ণ হ'ল না। আমাদের মতো মানুষ তবু বেঁচে আছে।

চঞ্চল দেখেছে সেই নিষ্ঠুর জীবন যন্ত্রণাকে। নিজেরই লজ্জা করে।

ভাত, শাক, ডাল আর একটা ঘ্যাঁট মতো! তাই কত কষ্টে সংগ্রহ হয়েছে কে জানে। হয়তো ওদের একজনকে বঞ্চিত করেই এটুকু জুটেছে।

নিজেরই লজ্জা করে সেই নিষ্ঠুর আবিষ্কার—ও দেখেছে দরজার বাইরে কল্যাণী ক'টা পাতের সামান্য কিছু ভাত তরকারী একত্রিত করে দুমুঠো খেয়ে, কি যেন নুন দিয়ে চুমুক দিয়ে গিলে পাত্রটা নামাল। সেটা আর কিছু নয়—খানিকটা ফ্যান।

সমীরের সেই ঘরে আজও বসে আছে। অতীতে দেখেছিল এর চেয়ে অনেক ভালো অবস্থা, ক'বছরেই সেখানে বিরাট একটা দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়েছে।

সিঁড়িটা নামতে নামতে অতল অন্ধকারের গহ্বরের সামনে এসে থেমেছে। এর পরই বোধহয় চরম সত্য—সেই মৃত্যুর সীমানা—মৃত্যু নয়—অপমৃত্যুর অতলান্ত তমসা।

ভেবেছিল চঞ্চল কোথায় একটা গোলমাল হয়ে গেছে, করুণাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল সমীর। এতদিনে বোধ হয় সমীর ঘর বেঁধেছে। সে আর করুণা—, অভাব আছে—তবু সেই মেয়েটিকে এনে সে একটা ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ গড়তে পারবে।

কিন্তু তা হয় নি। সমীর দুপুরের একটু ঘুমের পর উঠে বসেছে। ওর চেহারা কেমন শীর্ণ চোয়াড়ে হয়ে গেছে। টিনের কৌটা থেকে সাবধানে বিড়ি বের করে পেছনের দিকে ফুঁ দিয়ে ধরাতে যায়। চঞ্চলই বলে—সিগ্রেট নাও ?

হাসে সমীর, নাঃ ওতে শানায় না, এই-ই ভালো।

দুটো টান দিয়ে চঞ্চলের কথার জবাব দেয়।

—করুণা বিয়ে করে নি। অবশ্যি আমিও পারি নি। মানে, বোঝা তো কমলো না হে ?

চঞ্চল তবু অবাক হয়। এত সহজে সে কথাগুলো জানাতে পারলো। চঞ্চলই বিড় বিড় করে।

—এতদিনের চেনা জানা, এত স্বপ্ন—এত ভালোবাসা—হাসে সমীর। পরম বেদনায় আজ সে জীবনের কঠিন সত্যটাকে অনুভব করেছে। তাই বলে—

—আমরা আর বেঁচে নেই চঞ্চল, সব আমাদের হারিয়ে গেছে।

একটু থেমে বলে সমীর, অবশ্য করুণা বেঁচে গেছে। এখনও বোধহয় বেঁচে আছে সে।

চারিদিকে এখানে যেন কেবল দীর্ঘশ্বাস। এ জগতে ভালবাসার কি দাম আছে তা আজ জানে না চঞ্চল। ওর অর্থ নেই সামর্থ্য নেই। ভালবাসতে গেলে সেই মেয়েটিকে সব দায় মুক্ত করে তাকে খেতে-পরতে দিয়ে নিশ্চিন্ত করে তবে তার ভালবাসা পাবে। মেয়েটির কোন দায়িত্ব নেই।

সুতরাং সেটা স্বীকার করতে পারে নি তাই সমীরকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়েছে। চঞ্চল বলে।

—এই সাধ্য যদি তোমার না থাকে, অথচ ভালবাসতে চাও—তাহলে লোকে বলবে ব্যাভিচার।

সমীর কোন জবাবই দিল না। বিবর্ণ সার্টটা গায়ে দিতে থাকে। আজ চঞ্চলকেও তার কেমন ভালো লাগে না। ওর দামী পোশাক ওই সিগারেটের টিন দেহের মিষ্টি সুবাস কেমন বিশ্রী লাগে।

ওই লোকটিকেই একদিন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে তার ঘরে এনে আশ্রয় দিয়েছিল এ কথাটাও ভাবতে পারে না। ওকে মনে হয় নতুন জগতের মানুষ। সমীর জিজ্ঞাসা করে।

—এখন প্রায় তো কলকাতাতেই থাকো ?

—থাকি। তবে ভাবছি এইখানেই থাকবো।

সমীর ওর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে। দেখেছে ওই দত্ত-সাহেবের গাড়িতে অনেকদিন রং বেরং-এর পোশাক পরা অর্ধনগ্ন মেয়েদের সঙ্গে কদর্যভাবে ঘুরতে। মদও রীতিমত খায়। তিনু ঘোষের বাড়িতে মদ মাংস খায়। কলোনীর তাজা মেয়েদের সঙ্গে তিনুর বাগান-বাড়িতে হুল্লোড় করে এসবও কানে আসে। করুণা তার জীবন থেকে আজ সরে গেছে।

করুণা নাকি কলকাতায় ভালো কাজ করে। কি কাজ করে জানে না সমীর। তবে শাড়ি গহনার চটক দেখেছে দূর থেকে। হাতে দেখেছে তার ওই চঞ্চলের বই।

দেখেছে সুষমাকে। আজ হঠাৎ সুষমার আসার পরই ওই চঞ্চলকে জামাই বেশে এ বাড়িতে আসতে দেখে বিরক্ত হয়েছে সে। সমীর তার সব কিছু আশা—ভবিষ্যৎ হারিয়েছে। কিন্তু একটা সংসারকে সে ঘাড়ে করে রেখেছে। সেখানে তার কর্তৃত্বটুকু জানাতে সেই বঞ্চিত মানুষটি তিলমাত্র দ্বিধা করে না। বলে সমীর।

—এখানে না থাকলেই ভালো করবে। মফঃস্বলের শহরের চেয়ে কলকাতাই তোমার পক্ষে ভালো। এ বাড়িতে আর না এলেই খুশী হবো।

সমীর জামাটা গলিয়ে ছেঁড়া চোটি ফটাস ফটাস করে মোড়ে চায়ের দোকানে চা খেতে বের হয়ে গেল। এ সময় বাড়িতে তাদের চা হয় না।

সুষমা ঘরে ঢুকছিল, কথাটা কানে যায় তারও। চঞ্চলের মুখে কে যেন এক পোঁচ কালি বুলিয়ে দিয়েছে।

সুষমাই বলে—দাদাটা যেন একেবারে বদলে গেছে।

চঞ্চল হাসবার চেষ্টা করে—আমরা সবাই বদলে গেছি সুষি।

সুষমা চমকে ওঠে। ওই ডাকটা তার অনেক স্মৃতি জড়ানো। আজ সে সব হারিয়ে গেছে। সেই দিনগুলোও।···গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে; হু হু করে সব বদলে গেছে। সুষমাও বদলে গেছে।

আজ ওই ডাকে সাড়া দিতে পারে না সে। শুধু ব্যথাহত চাহনি নিয়ে চেয়ে থাকে মাত্র। কত কি ভেবেছিল সুষমা।

তার সংসার, সেদিন একজনের আহ্বান অগ্রাহ্য করে সে কর্তব্য মনে করেই সেই ভদ্রলোককে বিয়ে করে তার সংসারে গিয়েছিল। সুষমা বুঝেছিল নিজের হাতে সে কতবড় সর্বনাশ করে এসেছে।

রাত্রি নেমেছে। সন্ধ্যার ফিকে আভাস মিলিয়ে গেছে আকাশে কালোর গভীরে। তারই মাঝে ফুটে উঠেছে তারাগুলো। গঙ্গার জলে তারই একটু ভীরু ছোঁয়া পড়েছে। তারাগুলো কাঁপছে। ওপারে গঙ্গার ধারে দু একটা মিলের আলোগুলো মিটি মিটি করছে বায়ু তরঙ্গে।

সুষমা আজ তার মনের সেই কান্নাকে মুখর করে তুলেছে। এই কথা বলার আর কি উদ্দেশ্য আছে জানে না। তবু খানিকটা হাল্কা হতে চায় সে। চঞ্চল চুপ করে বসে আছে।

এসব ঘটনাগুলো ঘটতে পারে এ তার যেন হিসাব করা। উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে সেও তার কল্পনার জগতে এমনি করেই জট পাকিয়ে নিয়ে যেতো। তাদের জন্য হয়তো কেউ দুঃখ করে।

চঞ্চল তবু নিরাসক্তের মতো বসে শুনতে পারে না। এ কাহিনী ঠিক লেখা নয়, ওই হতভাগ্য নারীর জীবনে অর্জন করা—শুধু কাহিনীই নয়—বেদনার মূল উৎস।

সুষমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে গোপালবাবুর সেই ঘৃণ্য ব্যবহারগুলো। লোকটা সংসারের ঝি-এর কাজ করার জন্য আর নেশার-ঘোরে মাঝে মাঝে দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তি করার জন্যই সুষমার মতো অটুট স্বাস্থ্যের একটি মেয়েকে ঘরে নিয়ে গিয়েছিল।

মদ্যপ লম্পট লোকটার কাহিনী জানতে দেরী হয় নি। রাত্রিতে কোন দিন ফেরে মাতাল অবস্থায়। ঘুমিয়ে পড়লে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলবে সুষমাকে। সুষমা তবু উঠে স্বামীদেবতার জুতো জামা খুলে নিয়ে রাখতো। বমি করলে মুক্ত করতো।

সুষমার চোখ ফেটে জল আসতো। আরও পাঁচজনের মতো সে স্বামী ঘর নিয়ে সুখী হতে চেয়েছিল। মনে পড়ে চঞ্চলের কথা। চঞ্চল তখন ধাপে ধাপে ওপরে উঠছে। কাগজে পত্র-পত্রিকায় তার নাম। সেবার ওদের সিনেমা হাউসে তারই বই একটা এনেছিল—কয়েকটা বইই···লাইব্রেরী থেকেও বই আনতো সুষমা।

গোপালবাবু এনিয়ে সেদিন জেহাদ ঘোষণা করে।

—আজেবাজে বই পড়বে বাড়ির বৌ ?

সুষমা এতদিন চুপ করে ছিল। গান ভালবাসতো এতদিন গান গেয়েছে। এই গান গাওয়া নিয়েই তুমুলকাণ্ড বাধিয়েছিল গোপালবাবু। একি বাইজী বাড়ি যে গান গাইবে। চারিদিকে যে কানপাতা দায়। চমকে উঠেছিল সুষমা।

—কেন, এখন তো গান গাইছে অনেক বাড়ির বৌ-ঝি—

—থাক। এবাড়ির আব্রু-সম্মান আছে।

সুষমার চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল ওর ঘৃণ্য স্বভাবের কথা। মানুষও নয়। একটা মদ্যপ বেশ্যাসক্ত কদাকার পুরুষের কাছ থেকে সে কোন নীতিবাক্য শুনতে রাজি নয়। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারে নি।

গোপালের বাড়িতে থাকলে সে গান গাইত না।

আজ বাধে ওই বই পড়া নিয়ে।

—এসব বাজে নভেল, প্রেম-টেমের এই কেচ্ছা যেন বাড়িতে না থাকে।

স্বভাব চরিত্তির যদি মেয়েদের না ঠিক রইল তবে তাদের বেঁচে থেকে লাভ কি।

সুষমাকে প্রায়ই এমনি ঘৃণ্য কথাগুলো বলে ওই কদাকার লোকটা। সুষমা আজ ওই লোকটাকে সহ্য করতে পারে না। ওর সব কিছু লুঠ করে নিতে চায়, ওর গান থামিয়ে দিয়েছে, কণ্ঠরুদ্ধ করে দিতে চায়—রাতের অন্ধকারে ও জানোয়ারটা তার দেহখানাকে এক একদিন যেন ক্ষুধিত নেকড়ের মত দাঁত দিয়ে ফালা ফালা করে দিতে চায়। সারা দেহমনে সুষমা সাপের হিমশীতল কঠিন স্পর্শ অনুভব করে।

তিলে তিলে তাকে শেষ করতে চায় ও। এক দিন রুদ্ধ আবেগে ফেটে পড়ে সুষমা।

—পুরুষের স্বভাবচরিত্র বুঝি কোন মতেই যায় না ?

—মানে ? লাল দুটো চোখ দপ্ করে জ্বলে ওঠে গোপালের।

—নিজের কথাটা শুনেছো এ এলাকার লোকের মুখে···লাফ দিয়ে ওকে এসে ধরে গোপাল।

—শালা অনেক লোক তালে তোর কাছে আসে ? এ্যা ?

সামনে পড়েছিল একটা বেতের হাতলওয়ালা ঝুলঝাড়া। সুষমার কণ্ঠনালী টিপে ধরেছে ওই লোকটা নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে, অন্য হাত দিয়ে ওর সারা নগ্নদেহে সেই বেতের ঘা বসিয়ে চলেছে। তীব্র যন্ত্রণা আর দমবন্ধ হবার মতো অবস্থাটা আর সহ্য করতে পারে না সুষমা। নেতিয়ে পড়ে ওর জ্ঞানহীন দেহ।

চঞ্চল জানে না সে কি করতে পারে। জানলার ফাঁক দিয়ে গঙ্গার ফুলে ওঠা জল দেখা যায়। জোয়ার এসেছে।···ব্যথার জোয়ার। তারাগুলোর প্রতিবিম্ব কেঁপে কেঁপে উঠছে ওই সঞ্চরণশীল জলের বুকে।

ফিকে কুয়াশার আবরণে সব ঢেকে যায়।

সুষমা কাঁদছে। অন্ধকারে ওই কান্নার শব্দ ওঠে।

চঞ্চলের মনে হয় বেদনাময়ী ধরিত্রীর এই কান্না কোনদিনই ফুরোবে না।

চঞ্চল তার মনের গভীরে এই বেদনার সাড়া অনুভব করে।

—তবু একে মেনে নিয়ে ঘর করতে হবে সুষি ?

সুষমা চোখ তুলে চাইল ওর দিকে। টলটলে কান্না ভিজে মুখখানা কি বেদনায় ভরা। অনেক ভেবেছে সুষমা। তিলে তিলে এই জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায় সে। বলে সুষমা।

—আর যাব না, আমি আর এই যন্ত্রণা সইতে পারছি না চঞ্চল। কিন্তু বাঁচার পথ কই ?

চঞ্চলও দেখেছে ওদের সংসারের অবস্থা। একা সমীরও পারছে না সেই বোঝা

ানতে। দেখছে ওই প্রতিমাকে ও কলকাতার অনেক জায়গায়। সঙ্গে যে সব লোকজন দেখেছে তারা কি শ্রেণীর তাও অনুমান করেছে চঞ্চল। রাত অবধি রে—মদের আড্ডায়, জুয়োর আড্ডায় ওই প্রতিমাকে সেই লোকগুলোর সঙ্গে দেখেছে।

দেখেছে কোনদিন সকালের ট্রেনে ওই কচি সুন্দর দেহটাকে তছনছ করা অবস্থায় কোন মতে গাড়িতে চেপে ফিরে আসত। বাড়িতে বলে চাকরি করি।

ওকে এড়িয়ে গেছে চঞ্চল পথে ঘাটে। হয়তো ওই মেয়েটি লজ্জায় পড়বে।··· মনে হয় লজ্জাও বোধ হয় আর তার নেই। বাঁচার কঠিন প্রশ্নের সামনে প্রতিমার মতো অনেক মেয়ের লজ্জা ঘুচে গেছে।

পথ কোথাও নেই। চঞ্চল জানে না সেই পথের সন্ধান।

—বাড়িতে সেই স্বামীদেবতাকে বলেছ ?

—আমারও এই পথ নেবার স্বাধীনতা আছে চঞ্চল। যাকে এতটুকু ভালোবাসি নি, পেয়েছি কেবল জানোয়ারের মতো ব্যবহার, তার অন্ন মুখে তুলতে ঘৃণা বোধ করি। কোন সংস্রব রাখাতো দূরের কথা।

—পরিচয়। সম্পর্ক···স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ?

—সেটারও একটা পথ আছে চঞ্চল। দেখবে ?

সুষমা অসঙ্কোচে ওর জামাটা তুলে দেখায়, সুন্দর ফর্সা মাংসল দেহে ওই নটোল হাতের, সর্বত্র দগদগে দাগ, ডেরোকাটা বাঘের পিঠের মতো ওই সুন্দর দহটাকে সেই দৈত্য তছনছ করে দিয়েছে।

শিউরে ওঠে চঞ্চল।

এর একটা আঘাত কি আমার মনে বাজে নি চঞ্চল ?

—সুষি !

চঞ্চলের পৌরুষে কোথায় বাজে। একদিন সে ভালোবেসেছিল। তাই ওকে নিষ্ঠুর কামনায় পেতে চায় নি। একদিন পথহারা একটি মানুষকে পরম প্রীতিতে স পূর্ণ করে ছিল। তার অতীতের সেই পরিচয় নিয়ে আজ চঞ্চলও দাবী জানায়।

—ঠাঁই তোমার আছে সুষমা, প্রয়োজনও আছে।

সুষমা ওর দিকে চাইল। অপমানিত ক্ষুব্ধ একটি নারী। ওর মনে কি তীব্র জ্বালা। বলে সুষমা।

—তোমার কাছে দয়া চাইবো না চঞ্চল, সব সইবে ওই দয়া আমার জীবনকে তল তিল করে যন্ত্রণায় বিবর্ণ করে দেবে।

—তবে ওই সমীরের সামান্য রোজকারে আর তোমার টুইশানিতে দিন চলবে ?

হাসে সুষমা। ও যেন ঠাট্টা করছে। পরম বেদনাকে নিয়ে অতি সত্য পরিহাস করে সহজ ভাবেই।

—না পারি, জীবনটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই তো করে দিতে পারি।

চঞ্চল চমকে ওঠে। চোখের সামনে দেখেছে সেই অপমৃত্যুকে বার বার। অ
পথ হারিয়েছে প্রতিমা। সুষমাও তেমনি যন্ত্রণা বুকে নিয়ে তুষের আগুনে জ্ব
জ্বলে শেষ হয়ে যাবে।

এই সমাজের হৃদয়হীনতা আর বেদনাকে সংস্কারের শাসন দিয়ে বাঁধতে চেয়ে
কই তারা তো সেই দানব, ওই সুষমার স্বামীকে শাসন করতে পারে নি।

সুষমার মনে বিদ্রোহের আভাস। ও কি প্রতিশোধের কাঠিন্যে আজ
পাওয়াকে তুচ্ছ করতে চায়।

এমনি করে জ্বলে জ্বলেই ফুরিয়ে যাবে সুষি?

চঞ্চলের এই প্রশ্নের জবাব সে দেয় না। বের হয়ে গেল সে। আজ ওকে বি
বলেই বোধ হয় চঞ্চলের। কারও দয়া কুড়িয়ে সে বাঁচতে চায় না—তার
মৃত্যুও ওদের কাছে শান্তিময়।

রাতের আঁধার ঘনতর হয়ে আসে। হঠাৎ ছায়ামূর্তি দুটোকে দরজার সাম
দেখে ফিরে চাইল চঞ্চল। ঢুকছে সমীর আর তার পিছনে বহুদিন আগেক
সন্ধ্যায় শেওড়াফুলির সেই নোংরা দেহ বেসাতিনীদের পল্লীতে দেখা সেই টাকপ
কালো মানুষটাকে। এখনকার চেহারা আরও কদর্য হয়ে উঠেছে। মাং
গালের মধ্যে দুটো কুত-কুতে চোখ পিট পিট করছে।

সমীরই এগিয়ে আসে।

—সুষি কোথায়? এইখানে এসেছিল।

চলে গেছে।

গর্জন করে ওঠে গোপাল—মাইরী। এ্যাইজন্যেই মাগী হেদিয়ে ছিল'। দে
এইসা ঠ্যাঙ্গানি। আর এই বুঝি সেই তোমার নিকিয়ে বন্ধু? এ্যাঁ প্রেম-
তালে ভালোই চলছে— সিং কিং সিং কিং।

চঞ্চল ওই অমানুষটার দিকে চেয়ে আছে। গোপালবাবু গলা তুলে শোনায়।
এতই যদি সখ মাইরী পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে না দেগে নিজেই একটা সেবাদা
করো কেন ভায়া। ঘটা হবে—তবে তোয়াজে থাকবে। তবে হ্যাঁপা অনেক
মাগীর কি কম বায়নাক্কা?

—যাবেন আপনি? চঞ্চল উঠে দাঁড়িয়েছে।

জবাব দেয় সমীর—তুমি ওই সুষিকে ঘর ছাড়বার উৎসাহ দিয়েছ।

চমকে ওঠে চঞ্চল। সমীর কি জানে না সব কথা? না হয় গোপালবাবু
পয়সার জন্যে ও তার নিজের ন্যায় অন্যায় বোধকেও বিসর্জন দিয়েছে।

—সমীর!

—চঞ্চল তুমি আজ সমাজের দিকপাল। শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু একটি অমানু
জানোয়ার তুমি। একজন মেয়ের এমনি সর্বনাশ করতে পারো তা জানলে সে দি
গঙ্গার অতলেই তোমাকে রেখে আসতাম।

চঞ্চলের সারা মনের মাঝে একটা তীব্র আঘাত চমকে ওঠে।

—বাঁচিয়েছ বলে সেই মানুষটার চিন্তাধারা, তার ভালোমন্দ বোধটুকুকেও ন নিতে পার না সমীর। আমি কোন অন্যায় করি নি। ওই জানোয়ারকে ধাও সুষিকে কি করেছে? স্ত্রীকে হত্যা করার অধিকার তার নেই।

গোপাল তখনও গর্জাচ্ছে—সেটা আমি বুঝবো। চলে এসো সমীর; কোর্ট লিশ···।

হাসে চঞ্চল, সুষিকে চেনো নি সমীর। তাকে দোষ দিও না। সে শুধু তে চেয়েছে মাত্র।

এর পরই জায়গাটা কেমন বিষ ঠেকেছে তার কাছে।

সেই গোবিন্দর কেবিনের তিনু এককড়ি শ্রীদামের দলও এসে পড়ে। সারা াকায় যেন একটা লড়াই-এর মনোভাব এসে পড়ে। বোমা সোডার বোতলও তে পারে।

চঞ্চল নিজেই তাই চলে এসেছে কলকাতায়।

সুষির মুখখানা মনে পড়ে। অসহায় একটি নারীকে ওরা জোর করে নিয়ে ব। সমীরও তাকে আশ্রয় দেবে না। বৃদ্ধ হরিপদ বাবুকেও কথাটা বলেছিল ল। তিনি জবাব দিয়েছেন।

—কিন্তু কি করবো বাবা! হাজার হোক স্বামী।

কল্যাণী মায়ের মন নিয়ে মেয়ের দুঃখ বুঝেছিল কিন্তু সে নিরুপায়। তাই র চোখের জলই সার হয়।

—কি করবো বাবা, আমার যে হাত-পা বাঁধা। আর সমীর একা মানুষ। র উপর এসব বোঝা কত চাপাবো বলতে পারো?

চঞ্চল পরের কথাটাও জানিয়েছিল।

—সব দায়িত্ব আমার। আপনি বুঝিয়ে বলুন সুষিকে, সমীরকে। তার াবেই সেদিন সমীর সেই ওয়াপন রেকিং-এর দলবল নিয়ে শাসিয়ে গেছে।

—শেষ করে দোব।

সুষমার সঙ্গে আর দেখা হয় নি, শুনেছে সে নাকি সেই স্বামীদেবতার ওখানেই বার ঘর সংসার করতে ফিরে গেছে।

বিচিত্র জীবন লেখার মাঝে ডুবে যেতে চেষ্টা করছে চঞ্চল। তবু সেই মানুষটাকে াতে পারে নি। সেই সুষমাকে। হোটেল থেকে কদিন বের হয় নি। মনে হয় টা জায়গায় সে নিঃশেষে হেরে গেছে।

সেই রাত্রে সুষমা বৃথাই তার সামনে চোখের জল ফেলে নি। ধিক্কার দিয়ে ছে তার পৌরুষকে, তার সব কিছুকে।

কি তার মূল্য। জীবনকে সুন্দর করতে পারে নি সে। তাই শূন্য একাই

রয়ে গেছে চঞ্চল। লেখার কি সার্থকতা? খ্যাতি আর প্রতিপত্তি পেয়েছে সত্যি
অর্থও পেয়েছে।

একশ্রেণীর সমাজে পেয়েছে প্রবেশাধিকার। দেহের তৃপ্তি, নেশায় উদগ্র বাসনা
তাকে তৃপ্ত করতে পারে নি। কি ছিল—একদিন চকিতের জন্য একটি সন্ধ্যায়
তা হাতে পেয়ে আবার হারিয়ে ফেলেছে।

সারাদিন কাজ করেছে। সমস্ত ঘটনাটাকে বিশ্লেষণ করে লেখার চেষ্টা করেছে।
তার ফাঁক আর ফাঁকিটুকুও ধরা পড়ে। সে নিজে কাপুরুষ। তাই সমীরের
মতো তুচ্ছ একটা লোকের সেই আঁকড়ে ধরে থাকা সংস্কারটাকে লাথি মেরে দূর দূর
করে দিতে পারে নি। সাহায্য করতে পারে নি সুষমাকে সেই স্বামীরূপী
জানোয়ারের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে। সীতাকে রাবণ হরণ করে নিয়ে গেছে
শুধু সংস্কার আর শাসনের দাবীতে হিংস্র লোলুপ মনে।

মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি আসে সুষমা। চঞ্চল তখন বেশ নাম করেছে। সহজে
দেখা যেতো তাকে। বেশবাসও বদলে গেছে। চঞ্চলকে এড়িয়ে চলতো সুষমা
কিন্তু এড়াতে পারতো না। সারা মনের অতলে ঝড় উঠতো। একটা নীরব বেদনা
তার মনের সব অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে তুলতো থেকে থেকে।

সুষমার মনে হয় মস্ত ভুলই করেছিল সে। কিন্তু ক্রমশঃ ওই অকথ্য অত্যাচারের
কথা শুনে মা-বাবা এমন কি তার দাদা পর্যন্ত ওই লোকটিকে কিছুই বলে নি
গোপাল মাঝে মাঝে আসে এখানেও, সেদিন চঞ্চলের ওখানে তাকে দেখে গোপাল
যা তা বলেছিল।

সমীরতো চঞ্চলকে দোষী করে এ নিয়ে।

অবশ্য চঞ্চল কোন কথাই বলে নি। চুপ করে সেই সব অপমান সহ্য করেছিল
সুষমার মনে হয়েছিল ওরা সকলেই চঞ্চল আর তাকে নিয়ে অনেক কিছুই ভাবে
তা ছাড়া বাবা মা দাদার কাছে সে বোঝা মাত্র। তাই তাকে ওই মাতাল জানোয়ারের
হাতে তুলে দিয়ে পরম কর্তব্য পালন করেছে।

ছোট বোন প্রতিমাও বলে সুষমাকে।

—বুঝলি দিদি, চঞ্চলদার সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলে। ও নাকি মদ
খায়—মিলের মেমসাহেবদের সঙ্গে কি সব যাতা কাণ্ড নিয়ে কথা উঠেছিল।

সুষমা ছোট বোনের দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় ও মেয়েটাও চায় চঞ্চল সম্বন্ধে
সে ভুল বুঝুক। তার মন বিষিয়ে তুলতে চায় ওরা। হাসে মনে মনে সুষমা
ওরা জানে না তার স্বামীর গুণের কথা।

মানুষ সম্বন্ধে তার ধারণা বদলে গেছে।

তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হলেই তাকে বদনাম দেবে। সমাজের ধাপে ধাপে
এই ব্যবস্থা। তাই ওরা সকলেই চায় সুষমা মরুক-বাঁচুক তাদের আর কিছুমাত্র যায়
আসে না।

শেষকথা বুঝেই ফিরে এসেছিল সুষমা আবার স্বামীর ঘরে।

গোপাল গজরায়।

—পিরীত! এ যে, দেখছি এমন পিরীত। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

সুখ! সুষমার মনে হয়েছিল সেই অপরিসীম সুখের আবেশে মা গঙ্গার কোলেই ঝাঁপ দেবে বোধ হয়। কিন্তু তা পারে নি। বাঁচার লোভ তবু তার মনে বাসা বেঁধেছিল।

চঞ্চল সে সব অপমান সয়েছিল। মনে জমে উঠেছিল শুধু ঘৃণা আর অবজ্ঞা। সমীরকে সে আজ অনুকম্পা করে। তবু সমীর বলে।

—শালীনতা আর সম্মান এগুলো ভুলো না চঞ্চল।

চঞ্চল মনে মনে হাসে। বলে—তুমি একটি খুনী। তোমার বোনকে গলা টিপে মার চেয়ে খুন করলে ভালো হতো। সে সাহসও তোমার ছিল না। কাওয়ার্ড!

সমীর কঠিন-কণ্ঠে বলে—দুনিয়ায় এখনও অমানুষের রাজত্ব হয় নি চঞ্চল। সবাই তোমার মত ইতরও নয়।

—না হলেই ভালো। তবে ভুল তোমার ভাঙ্গবে সমীর।

সমীর কথা বলে নি।

চঞ্চল সমীরের ভুলটাকে নিজে দেখেছে। মনে হয়েছে ও মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। যাদের নিয়ে ওর ধ্যান ধারণা আর আদর্শ তারা যে আসলে কি বস্তু তা জানে না সমীর।

চঞ্চল তাদের অনেককে চেনে।

ক্রমশঃ সে পেয়েছে নাম অর্থ প্রতিষ্ঠা। মানুষের সমাজের বিভিন্ন স্তরের দরজা তার সামনে খুলে গেছে।

সেদিন কলকাতা গেছে কি কাজে, নতুন বই-এর একতাড়া প্রুফ তার সঙ্গে। ওখান থেকে একবার যাবে স্টুডিওতে। তার একটা উপন্যাস ফিলম্ হচ্ছে, পরিচালকের সঙ্গে তারই একটা চরিত্রের বিষয়ে একটু আলোচনা করতে হবে।

শিয়ালদহে নেমে বের হবে গেট দিয়ে, সামনেই করুণাকে দেখে অবাক হয়।

—তুমি!

করুণা আজ কদিন থেকেই একটা চাকরির ব্যাপারে আসা যাওয়া করছে। ইন্টারভিউ হয়ে গেছে, এখন চলেছে উমেদারির পালা, তাই একটু সাজগোজও করেছে। করুণাও বুঝেছে চাকরি মানে তার কাছে বাঁচার আশ্বাস।

অফিসে দেখেছে অনেকেই কাজ করছে, ঝকঝকে পরিবেশে তাদের চটকও সেই চকমকানিকে বাড়িয়ে তুলেছে। অফিসের পরিবেশে অনেকসময় তাদের সেইটাই দেখা হয়ে থাকে।

কাঁচের শো কেসে সাজানো দোকানের মতো, বাহার চাই আগে। তার সামান্য পোষাক। শাড়িগুলোও পুরোনো, ওদের মত সুন্দর ওমনি এইটুকুন ছাঁটের

ব্লাউজও নেই। তবু করুণা হতাশ হয় নি। রূপ যৌবন তার আছে। ওই তার মনে হয় খনিজ হীরে, বাকি জেল্লাটুকু আসবে শান পালিশে।

নিজেকে তেমনি করে একটু সাজিয়ে তুলেছে সে। শাড়িটা বুকের উপর বেশ টান করে এনেছে, টেনেছে পিছনের দিক থেকেও। উদ্ধত দেহের সব বঙ্কিম রেখাগুলোই যেন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

করুণা মনে মনে স্বপ্ন দেখে চাকরি সে পাবেই। মহানগরীতে একটু ঠাঁই তার পেতেই হবে। তাই নিজেকে এমনি লোভনীয় করে সাজিয়ে তুলে পশরার মত হয়ে উঠেছে। শিয়ালদহ স্টেশনের ভিড় সমানে চলেছে। একসঙ্গে কয়েকখানা ট্রেন এসেছে বোধ হয়। প্লাটফরম থেকে জনস্রোত বার হয়ে কলকাতার জনসমুদ্রে মিশে যায়। সমুদ্রই বলা যেতে পারে। জনস্রোতের বিভিন্ন ধারা ওতে মিশে হারিয়ে যায়।

—করুণা!

ওর নামটা শুনে চমকে ওঠে করুণা। শেডের বাইরে একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে চঞ্চল।

তবু চেনা মুখ, অচেনা জনসমুদ্রের ভিড়ে ওকে ভালো লাগে। তাছাড়া মনটা ভালো আজ করুণার। সামনের সপ্তাহেই বোধহয় এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেয়ে যাবে। খুশি খুশি ভাব।

করুণা এগিয়ে আসে।

—এদিকে একটু কাজ ছিল। আপনি?

করুণার দিকে চেয়ে থাকে চঞ্চল। ওর সামান্য প্রসাধনে আর ওই অতিসাধারণ শাড়িখানায় তাকে মানিয়েছে অতি সুন্দর।

ওর ফর্সা মুখখানায় কালো দুটো চোখ, টিকলো নাক, হাল্কা লাল আভা লাগা দুটো ঠোঁট ওর সারা মনে একটা সাড়া আনে। করুণার সাজটা তার কাছে বিচিত্র ঠেকে।

—ব্যাপার কি? এত সাজগোজ।

করুণা চঞ্চলকে নানাভাবে কল্পনা করেছে। তার মনের প্রথম পুরুষ ছিল সমীর। এখনও সমীর যথারীতি তাদের বাড়ি আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে। আরও কি যেন বলতে চায়।

কি বলতে চায় সেকথা জানে করুণা, প্রথম প্রথম তারও ভাবনা লাগতো ওইসব কথা। করুণার তরুণ মনে একটা মিহি ছবিও ফুটে উঠে ছিল, সেও সুখী হবে। সমীর আর সে দুজনে তাই স্বপ্ন দেখেছিল। সকালের মিষ্টি সোনারোদে যে শিশিরকণাগুলো ঘাসের উপর ঝলমল করে, গাছের পাতাগুলো যত রঙ্গীন বর্ণময় বলে মনে হয় বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদও চড়চড়ে হয়ে ওঠে, তারা কোথায় হারিয়ে যায়।

করুণার মনেও সেই স্বপ্নটা ক্রমশঃ ফিকে হয়ে এসেছে। সমীরের সাধ্য সে জেনে ফেলেছে।

চঞ্চলকে তার সঙ্গে তুলনা করে আজ করুণা। ও অনেক সুন্দর, সমীরের মত কর্কশ কাঠকাঠ চেহারা নয়, ওর দুচোখে কি ঔজ্জ্বল্য; সারা দেহে এখনও তারুণ্যের ঝলক। সেই চাপা খুশীটা তার মনেও সংক্রমিত হয়, সুর তোলে। আবেশের সুর।

এগিয়ে আসে করুণা।

—একটা চাকরীর ব্যাপারে এসেছিলাম। বোধ হয় হয়ে যাবে। টাইপিস্টের কাজ—

—তাই নাকি! চঞ্চল খুশি হবার ভান করে। করুণার দুচোখের মধ্যে নীরব ব্যাকুলতাটুকু অনুভব করে সে। এটা তার সহজাত প্রবৃত্তি।

মেয়েগুলো যেন সবাই একই ছাঁচে ঢালা; বিশেষ করে আজকের দিনে। পুরুষগুলোও! তাদের মনে শুধু টাকা আর প্রতিষ্ঠার লোভ, মেয়েদেরও তাই। তবে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের নরম সুন্দর চোখে মুখে সেই লোভটা কেমন প্রকট হয়ে ওঠে।

চঞ্চল কি ভেবে বলে—সমীরদা জানে তো? তোমাদের দেবতা—

আদর্শ—

হাসে করুণা। ওর কথাগুলোয় মনে মনে খুশী হয়েছে করুণা। সমীরদার কথাগুলোই অমনি। এখনও ভাবে সমীর মেয়েরা লজ্জাবতী লতা হয়ে থাকবে, ঘরের বাইরে পা দেবে না। জীবনে বড় হবার জন্য কোনদিনই কিছু চাইবে না।

সীতা সাবিত্রী ইত্যাদির নজীর দেখিয়ে শুচিতা পবিত্রতা এইসব বচন আউড়ে ওরা মেয়েদের নিজেদের হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে। কথাটা বলতে পারে না করুণা। হাসে মাত্র। জবাব দেয়—একটা কিছু তো করতে হবে। আপনি কোথায় চলেছেন?

—বইয়ের দোকানে কপিগুলো ফেলে দিয়ে ওখান থেকে যাবো টালিগঞ্জের স্টুডিওতে। স্যুটিং আছে একবার যেতে হবে। যাবে নাকি?

করুণার মনটা কেমন হালকা আনন্দের আবেশে ভরে ওঠে। মুক্তির আনন্দ। বেপরোয়া হতে চায় ক্ষণিক বাধামুক্ত সেই মন। আজ তার কাজ কিছু নেই। তার বদ্ধ জীবনের চারিদিকে শুধু অভাব আর বহুকাল বেঁচে থাকার সংগ্রাম। তাতেই ঠাসবোঝাই হয়ে উঠেছে দিনের সবকটা মুহূর্ত।

মনের সেই চাপাপাড়া উদ্যমতা—যৌবনের শিহর তবু মরে নি। ওর দিকে দুচোখ তুলে বলে করুণা।

—ওরা কিছু মনে করবে না তো?

—কি আবার ভাববে।

একটা ট্যাক্সিকে সামনে দেখে ডাকল চঞ্চল।

কলেজ স্ট্রীটে বই পাড়ায় এসে চঞ্চলের মান খানিকটা লক্ষ্য করে করুণা।

দোকানের মালিক নিজে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সির সামনে।

—নামবেন না ?

কাগজপত্রগুলো হাতে দিতে দিতে চঞ্চল জবাব দেয় ?

—না, একটু টালিগঞ্জে যেতে হবে। আর ওই বাকী কপি পাবেন সামনের সপ্তাহে।

প্রকাশক ভদ্রলোক অনুনয়ের স্বরে বলে।

—নোতুন বইখানাও কিন্তু চাই। অবশ্য টাকাপয়সার ব্যাপারে কোনরকম গড়বড হবে না।

চঞ্চল অন্য মানুষ এখানে। তার কথাবার্তাও বেশ সতেজ স্পষ্ট। ব্যক্তিত্ব তাতে ফুটে উঠেছে।

চারিদিকে হাল্কা আলোভরা একটা জগৎ। ময়দানের পাশ দিয়ে ট্যাক্সিটা চলেছে। করুণার মনের চাপাপড়া পাথরটা যেন খুলে গেছে কি বিচিত্র উন্মাদনায়।

এদিকটায় এখনও সবুজ আছে। ট্রাম ডিপো ছাড়িয়ে চলেছে তারা। দেবদারু আর ঝাউগাছের পাতায় বাতাস এখানে সাড়া তোলে, টালিগঞ্জ রেসকোর্সের সবুজ ঘাসঢাকা মাঠটা চোখে শান্তির আভাস আনে, কোথায় পাখী ডাকছে। আজ করুণার দিনটা কেটে যায় কি একটা স্বপ্নের ঘোরে।

চঞ্চলের জগৎটাকে দেখেছে। স্টুডিওতে অনেকেই তাকে মান খাতির করে। যাদের এতদিন দেখেছে ছায়াছবির পর্দায় তাদের দেখেছে সামনে। সেই নায়ক নায়িকারা তার সঙ্গেও আলাপ করেছে। চঞ্চলের কথাগুলো তারা শুনছে।

চঞ্চল তার সৃষ্ট চরিত্রগুলোর সম্পর্ক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে চলেছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় মিশেছে ওদের দেহের বিচিত্র সুরভি, চোখের চাহনি আর হাসিতে সে জগৎ মায়ামদির, সেই রূপকথার পরিবেশে একটি মেয়ে আজ হারিয়ে গেছে।

ওরাই এনেছে কাটলেট-টোষ্ট-সন্দেশ-বিস্কুট আর চা।

করুণার নিজেকে এই পরিবেশে কেমন সামান্য বলে মনে হয়। চঞ্চল বলে।

—খাও !

করুণার মনে হয় খিদে পেয়েছে। সকালে বাড়ি থেকে সিদ্ধ ভাত (এর বেশী কিছু জোটে নি). খেয়ে বের হয়েছে, সারাদিনটা কোনদিকে কেটে গেছে। এইবার খিদেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

ওদিকে কোথায় পিচকার টেক হচ্ছে গানের সঙ্গে। লাউড স্পীকারে গানের বিচিত্র সুর ভেসে আসে। জানলার বাইরে চেয়ে দেখে বৈকালের সোনা রোদ মুছে গিয়ে গাছগাছালির মাথায় সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নামছে। পাখীগুলো কলরব করে।

এ তার কাছে নোতুন চোখে দেখা দেয় আজ।

—দেরী হয়ে গেল না ?

চমক ভাঙ্গে করুণার। এতক্ষণ অন্য জগতে সে কি স্বপ্নের মধ্যে ডুবে ছিল। চঞ্চল সেখানে ব্যক্তিত্বময় পুরুষ। ওর মুখের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, সিগারেটের টিন থেকে একটার পর একটা সিগারেট তুলছে আর জ্বালাচ্ছে। ওর কথা বলার ধরনটাও এখানে স্বতন্ত্র। মনে হয়, যাকে তাদের বাড়িতে—সহরের পথে দেখেছে এ সেই সাধারণ মানুষ নয়, ওর ভিতরে অন্য একটা সত্ত্বা আছে, ওদের মত নামকরা পরিচালক, নায়ক নায়িকাও তার কথা মন দিয়ে শোনে, গুরুত্ব দেয়।

আবার সে সহজ হয়ে উঠেছে।

করুণার পিঠে হাতখানা রেখেছে। আঁধার নামা পথ। দূরে দূরে দু একটা আলো জ্বলছে। করুণার নিজের সত্ত্বাটুকু ওর সামনে আজ হারিয়ে গেছে। চঞ্চলের হাতখানা তার নরম পিঠের উপর একটা সাড়া আনে, করুণার মনে হয় সে যেন হারিয়ে গিয়েছিল, ওই সাড়া টুকুতে আবার তার মনের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। করুণা জবাব দেয়।

—না। এমন কি দেরী। বাড়িতে জিজ্ঞাসা করলে যা হয় একটা জবাব দেব।

হাসছে চঞ্চল। ওদের জবাব ঠিক তৈরী হয়ে যাবে।

—যদি সমীর কিছু বলে ?

—কেন ? তাছাড়া তার বলার কি আছে এতে ?

করুণার কথায় হাসছে চঞ্চল। সমীর অবশ্য এসব কথা শুনলে খুশী হবে না। করুণা জানে না ওর সম্বন্ধে সমীরের ধারণাটা কি।

করুণার সারা মনে তখনও চাপা বিস্ময়। বকে চলেছে সে।

—ওই ভদ্রমহিলার এত নাম, তবু কেমন সিম্পল্ দেখলেন।

—সহজ হওয়াই কঠিন। বুঝলে!

চঞ্চলের কথাগুলো শুনছে করুণা। আজ তার কাছে চঞ্চল কি এক বিচিত্র মানুষ। একটা প্রতিষ্ঠা তার আছে। অর্থ! টাকাকড়ি! সারাদিন ওরা ট্যাক্সিতেই ঘুরেছে।

তাছাড়া চঞ্চলের মনটাকে জেনেছে খানিকটা। ভালো লাগে করুণার।

রাতের ট্রেন। প্যাসেঞ্জার কুড়িয়ে ও যাত্রা করে। পথে প্রায়ই নেমে যায় অনেকে। শেষ হয় তাদের স্টেশনে এসে। ফাঁকা কামরা। ফার্ষ্টক্লাশেই যাতায়াত করে চঞ্চল।

ডানলোপিলো গদিতে দেহটা বেশ আরামেই ঢুকে যায়, মনে হয়, করুণার সাধারণের থেকে সে আলাদা।

হঠাৎ শুধোয় করুণা—

—প্রতিমা আসে নি কোনদিন ষ্টুডিওতে ?

প্রতিমার কথা বলার মধ্যে করুণার মনে একটা কেমন যেন ঈর্ষা না হয় অন্যাকিছুর সুর ছিল। চঞ্চল ওর দিকে চাইল।

—না।

হাসে করুণা—ওর দাদার ভয়ানক শাসন। বাবা মা কিছু বলে না, বাবা দাদার ভয়েই ও কুনো হয়ে হইল। তবে কি জানেন, ওরও ডাঁট আছে। কিসের যে ডাঁট তাতো বুঝি না ? কটা রং-এর গুমোরেই গেল।

করুণার রংটা একটু চাপা। তবু ওর স্বাস্থ্য যেন উপছে পড়ছে। অযাতিত সেই উপছে পড়া নিটোল যৌবনকে করুণা আবিষ্কার করেছে। তাই যেন মেতে উঠেছে সে। বলে করুণা।

—মেনিমুখো লোকগুলোকে আমার কিন্তু ভালো লাগে না। ওই সমীরদার কথাই ধরুন, দুনিয়ার সবাই কেবল গোল্লায় গেল, এই ওর ভাবনা।

হাসছে করুণা। শূন্য কামরা। গাড়িটা ছুটে চলেছে অন্ধকারে। এলোমেলো বাতাসের সাড়ায় ওর শাড়ীটা গা থেকে খসে পড়েছে। ব্লাউজের বাঁধন ছাপিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে করুণার মাংসল দেহ। চঞ্চল ওর দেহের দিকে চেয়ে আছে। করুণা দেখছে ওকে। তবু হাসছে, হাসছে।

তার হাসির উত্তেজনায়, গাড়ির গতিবেগে, এলোমেলো হাওয়ায় সব কিছু খুশীকে সে ছড়িয়ে দিতে চায়, অনুরণন তুলতে চায় সে চঞ্চলের দেহে মনে—অতন্দ্র মনের সব কামনার সাপগুলো যেন ওই বেদেনীর বাঁশীর সুরে মাথা তুলছে—ফণা মেলে উঠছে।

—করুণা !

চঞ্চল ওর সারা দেহটাকে নিমেষের মধ্যে নিজের মাঝে টেনে নিতে চায়। কাঁপছে করুণা।

ওর দুচোখে কি বিচিত্র আবেশ—নীরব আহ্বান। চঞ্চলের শিরায় শিরায় বহু-দিনের বিস্মৃত সেই তৃষ্ণাটা প্রবল হয়ে উঠেছে। দেখেছে তার কাছে অতীত-ভবিষ্যতের কোন হিসাব নেই। জেগে আছে শুধু বর্তমান।

...ওর কঠিন নিষ্পেষণে, ওই চোখের চাহনিতে চমকে উঠেছে করুণা। তার অসাবধান মুহূর্তে সে আগুনের একটা ফিনকি দিয়ে বারুদের সঞ্চিত স্তূপকে স্পর্শ করেছে।

এক নিমিষের মধ্যে মনে হয় করুণার সে জিতেছে, চঞ্চল ভাবছে তার কাছে সব ভালবাসর মুখোসটা নির্মমভাবে খুলে পড়েছে। জীবনের বিচিত্র একটা নির্মম সত্যকে সে আবার প্রত্যক্ষ করেছে।

...গাড়িখানা আউটার সিগন্যাল পার হয়ে তাদের স্টেশনে এসে ঢুকছে, চাকায় চাকায় একটা বিক্ষোভ আর বিদ্রোহের বাঁধভাঙ্গার দুর্বার শব্দ ওঠে। সর্বকিছু কেমন এলোমেলো বেতালা ঠেকে।

সমীরও গিয়েছিল করুণাদের ওখানে। সেইখানেই খবর পায়, কলকাতায় চাকরির ব্যাপারে গেছে, ফেরার কথা সন্ধ্যার আগেই, এখনও ফেরে নি।

সমীর করুণার এই ব্যাপারটা পছন্দ করে নি। ক'দিন থেকে দেখেছে করুণা তাকে কেমন এড়িয়ে চলেছে। কথাবার্তা তখন কতো বলতো, হঠাৎ সেই মেয়েটি কেমন সংযতবাক গম্ভীর হয়ে গেছে। সমীরের মনে মনে একটা স্বপ্ন, সেকথা ওই করুণাকেও বলেছে, প্রতিমার বিয়ে থা দেবে তারপর তারা দুজনে ঘর বাঁধবে।

করুণা ততদিন অপেক্ষা করবে।

কিন্তু সমীরের মনে হয়েছে সেই করুণা হঠাৎ যেন কেমন বদলে গেছে। ওর পোষাক-আষাকও অতি সাধারণ। কোন চালচহ্ন নেই, উৎকট মেক্আপ্ করে সে নিজের দেহটাকে দেখাবার জন্য বৈকালে হাওয়া খাবার নাম করে গঙ্গার দিকেও যায় না আর পাঁচজন ওর বয়সী মেয়ের মতো।

সমীরের ভালো লাগতো ওর ওই সংযমটুকু।

হঠাৎ কোথায় যেন একটা বেসুরো পর্দা বাজে।

আজ সকাল সকাল ফিরে আসবে বলেছিল করুণা। সমীরকে কথা দিয়েছিল দু'জনে সিনেমায় যাবে। কি একটা ভালো ছবি এসেছে। সমীর টিকিট দুটো কেটেছিল, কিন্তু সময় হয়ে যায় দেখে সে দুখানা বিক্রী করে দিয়েছে, তখনও করুণার দেখা নেই। পায়চারী করছে সমীর। বার বার তার খবর নিতে করুণাদের বাড়ি যেতে নিজেরই লজ্জা লাগে। করুণার বৌদি কি ভাববে।

মনে মনে রেগে উঠেছে সে।

কি ভেবে স্টেশনেই এসেছে সমীর। বাড়ি ফিরতেও ইচ্ছা করে না আজকের সন্ধ্যাটাকে নিয়ে সে অনেক কল্পনাই করেছিল, ছবি দেখে চাঁদনীরাতে দুজনে গঙ্গার দিকে যাবে।

পার ঘাটায় ভিড় কমে আসে, সামনে মুক্ত উদার গঙ্গার বিস্তার, ঝাঁকড়া বটগাছের মাথায় চাঁদ ওঠে, তারই আবছা আলো পড়ে গঙ্গার জলে, ঝিকিমিকি তোলে।

সেই আলো আঁধারির জগতে করুণা আর সে হারিয়ে যাবে। কিন্তু সব স্বপ্ন দেখা তার ব্যর্থ হয়ে গেল করুণা আজ তাকে যেন ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে।

একটা আলোড়ন তুলে ট্রেনখানা স্টেশনে ইন করছে। আপাততঃ তার যাত্রা শেষ। লোকজন নামছে—টি স্টলে দাঁড়িয়ে আছে সমীর। চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে আনমনে চেয়ে থাকে। স্টেশনে তবু প্রাণের সাড়া জাগে, লোকজন নামে—সারাদিনের কাজের পর তারা বাড়ির দিকে ফেরে, কারোও হাতে দুটো ফুলকপি, দুটো কমলালেবু, না হয় অফিস কামাই করে লাইন দিয়ে সংগৃহীত একটা হাফ পাউন্ড পাউরুটি। সুতলীর দড়িতে বাঁধা একটা মাছ তাই নিয়ে খুশি-মনে বাড়ি ফিরছে।

হঠাৎ তারই ভিড়ে ফার্ষ্টক্লাস থেকে কাকে নামতে দেখে চমকে ওঠে সমীর।

করুণাই। ওর ওই শাড়িখানা চেনে সে। ছাপা আর্ট সিল্কে শাড়ি। কিছুতেই নেবে না, সমীরই তাকে এবার পুজোর আগে জোর করে কিনে দিয়েছিল বোনাস পেয়ে।

—করুণা!

সমীরের সব রাগ অভিমান দূর হয়ে যায়। ওর সুন্দর মুখ আর মিষ্টি হাসির সামনে সমীর সব ভুলে যায়। মনে হয় জরুরী কাজে আটকে পড়েছিল।

ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে এগিয়ে আসে সমীর।

—এত দেরী হল ফিরতে?

করুণা সহজ হয়ে উঠেছে। কলকণ্ঠে বলে।

—হঠাৎ চঞ্চলদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ওর সঙ্গেই একটু গেলাম স্টুডিওতে। ওর একটা বই-এর সুটিং দেখতে। বাপরে চঞ্চলদা একজন কেউ কেটা লোক সমীরদা। এখানে ওকে এমনি দেখি, বড় বড় হিরো হিরোইনদের দেখলাম ওর সামনে চুপ করে বসে কথাগুলো শুনতে। যা খাওয়ালো না।

সমীরের মুখের হাসি সেই চাঞ্চল্যটুকু নিঃশেষে মুছে যায়। করুণারও চোখ এড়ায় না সেটা। পিছনে নেমে আসছে চঞ্চল। ওর কোচানো দিশী ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী পরা চেহারার দিকে চেয়ে থাকে সমীর। হাতে থ্রিক্যাস্‌লস্‌ সিগারেটের টিন।

—এই যে সমীর দা।

সমীর ওর দিকে চেয়ে দেখছে। এই চঞ্চলকে সেও যেন চেনে না। অতীতে একদিন এই ছেলেটাকেই চরম বিপদের মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনেছিল গঙ্গার দর্বার জোয়ার আর ঝড়ের মুখ থেকে। সেদিন ও ছিল হতদরিদ্র, নাম পরিচয়হীন একটি তরুণ।

আজ সে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, খ্যাতিমান ব্যক্তি, টাকারও অভাব নেই। জীবনে কোনদিকেই জড়ায় নি। তাই মধুর সন্ধানে ঘোরার সময় এবং সামর্থ্য তার আছে। সমীর চঞ্চল আর করুণাকে দেখছে।

—নাও।

সিগ্রেট এগিয়ে দেয় চঞ্চল ওর দিকে। সমীরের মনে একটা চাপা রাগ মাথা তোলে।

চঞ্চল সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে সে। মেয়েদের নিয়ে চঞ্চলের এই খেলার দৃশ্য সেও দেখেছে ওই মিল এলাকায়।

আজ করুণাকেও ওর সঙ্গে এত রাত করে ফিরতে দেখে খুশী হয় নি সমীর।

করুণা সমীরকে দেখছে। সেই কঠিন কঠোর চাহনিটা। ভাল লাগে না তার। ওকে আজ এড়াতে চায় সে। তাই বলে—চলি চঞ্চলদা, পরে দেখা হবে। আসি—

সমীরকে লক্ষ্য করে কথাটা যেন ছুঁড়ে দিয়ে সে হাল্‌কা পায়ে ওভার ব্রিজ দিয়ে

উঠে গেল, সমীর চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। ভিড়ে মিশে গেছে করুণা, আজ তাকে ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেল সে।

হাসছে চঞ্চল।

সমীর ওর হাসি দেখে রেগে ওঠে—হাসছ যে?

চঞ্চল হালকাস্বরে জবাব দেয়।

—এমনিই হাসছিলাম। তুমি যেন খুব খুশী হওনি? এ্যাঁ!

সমীর জবাব দিল না। ওরা বের হয়ে আসছে স্টেশন থেকে। ভিড় কমে গেছে। পথঘাট ফাঁকা। শহরতলীর রাস্তার দুধারে দোকান পশারও বন্ধ হয়ে গেছে। দুএকটা পান বিড়ির না হয় চায়ের দোকান খোলা আছে।

সমীর বলে ওঠে।

—সবকিছু নিয়ে ইয়ার্কি করা ঠিক নয় চঞ্চল। করুণার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা একটু আলাদা, তা তুমিও জানো।

হাসছে চঞ্চল।

—যেটা তুমি সত্যি বলে জানো, আমি সেটাকে জেনেছি মস্ত ভুল বলে। অথচ তুমি মোটেই তা জানো না।

—চঞ্চল! সমীর কঠিন হয়ে উঠেছে। বলে, এ নিয়ে তোমার কথা না বলাই ভালো।

চঞ্চল হাসছে, এবার সে হাসির ধমকটা আরও জোর, যেন অবজ্ঞার তোড়ে সমীরের মনের সব ধ্যান ধারণাকে সে নিঃশেষ করে দিতে চায়। বলে চঞ্চল।

—আজকের দিনে বাস করেও এখন প্রেম ভালবাসা ইত্যাদিকে এতখানি মানো তা জানতাম না। ওসব প্রেম মিথ্যা—ওর কোন দাম নেই আজ!

সমীর চঞ্চলের দিকে চাইল। রেগে উঠেছে সে ওর ওই বিশ্রী কথাগুলো শুনে। বাধা দিয়ে ওঠে সমীর।

—চঞ্চল!

—রাগ কোরো না দাদা। এই আছে? এ্যাই!

দুটো আঙ্গুল দিয়ে একটা বিশেষ মুদ্রা প্রদর্শন করে চঞ্চল, টাকা-বাজানোর মুদ্রা তারপরই নিজের আবিষ্কারের কথাটাকে বেশ জাহির করে বলে।

—তালে লেগে থাকো, নইলে ক্লিন আউট হয়ে যাবে বুঝলে বোল্ড আউট! আজকের দুনিয়ার এই নিয়ম। ও সতী সাবিত্রীর দলও এযুগে বাস করলে তাদেরও এই ফর্মুলা মেনে চলতে হতো, না হলে তারা যেতেন—

চঞ্চল নাটকীয় ভঙ্গীতে তাদের শেষ পরিণতির ঠাঁইটা দেখিয়ে দেয় চটকলবাজারের ওই পল্লীর দিকে। সমীর স্তব্ধ হয়ে গেছে। চঞ্চল ওর মুখের উপর ধোঁয়া ছেড়ে বলে।

—চলি দাদা, তোমার তো এসব চলবে না? চল্ না একটু গোবিনের দোকানে, ভালো জিনিষ আছে। নিদেন ব্ল্যাকনাইট একপেগ—

সমীরের গালে ও চড় কসছে একটার পর একটা।

সমীরই ওই তরুণটিকে এখানে এনেছিল, বাঁচিয়ে এনেছিল।

সমীরের ইচ্ছা করে ওর গলাটা ধরে মাটি থেকে তুলে একটা পটকান্ দিয়ে দেয়। তার হাতের জোর এখনও আছে। কিন্তু সেটা খুব ভালো দেখাবে না, বলে সমীর।

—করুণাকে নিয়ে ওই সব কথা আর বলো না, তোমাকে সাবধান করে গেলাম।

সমীর ওর কাছ থেকে সরে যেতে পারলে যেন নিষ্কৃতি পায়, তেমনিভাবে কথাগুলো ওর মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বেগে বের হয়ে গেল।

কোথায় যাবে জানে না, মনে হয় করুণাদের বাড়িই যাবে। কিন্তু কি ভেবে থামল। রাত্রি হয়ে গেছে।

এতরাতে সেখানে গিয়ে এসব কথা না বলাই ভালো। বাড়ির দিকে হন্ হন্ করে এগিয়ে যায় সমীর।

তখনও হাসছে চঞ্চল। মনে হয় কি সামান্য বস্তু নিয়ে ওরা কত বড় মূল্যের মন দিয়ে বসে আছে। প্রেম ভালবাসা বিশ্বাস! চঞ্চল দেখেছে ওসব ধারণা বিশ্বাস কত ঠুনকো। করুণার নরম মাংসল দেহের কামনাবিহ্বল নিবিড় স্পর্শটুকুকে সে এখনও ভোলে নি।

ওসব তার কাছে যেন হসাআঅংকের উত্তরের মত বের হয়ে আসে। চঞ্চল তো চায় নি—তাকে প্রলোভন দেখিয়েছে ওই মেয়েটাই।

সে নাকি আবার ভালবাসে ওই সমীরকে। প্রেম-ভালোবাসা! হাসছে চঞ্চল। গোবিনের দোকানের ওপাশে ফ্লোরেসেণ্ট আলো জ্বলছে, ডিসটেমপার করা হলটায় ছোট ছোট কাঠের খুপরি করা। খাবারের সঙ্গে ওরা এখানে মদও গোপনে দেয়। অবশ্য সীমিত খদ্দেরের কাছে।

ওর দোকানে তাই সাধারণ খদ্দেরের আনাগোনা নেই, আসে বিশেষ একটা শ্রেণীর লোক। যারা চাল চালানের দলপতি না হয় রাতের অন্ধকারে পাকিস্তান বাজারের বিদেশী মাল টেনে আনে এদেশের বাজারে, তিনগুণ মুনাফা করে। না হয় রেল কোম্পানীর ওয়াগন থেকে রাতের অন্ধকারে মাল হালকা করে দেয়—এরাই। তা ছাড়াও একটা শ্রেণী আছে।

গোবিন তাদের মান খাতির করে। রাতের খাওয়াটা খেয়ে নেবে আজ এইখানেই। বয় এগিয়ে আসে।

—কি দোব!

চঞ্চলের চোখের সামনে তখন করুণার সেই উদ্ধত যৌবনের নেশা। ওকে এত সহজে কাছে পাবে তা ভাবে নি। মনে হয় ওরা ধরা দেবার জন্যই এগিয়ে আসে। প্রেম ভালবাসা! সমীরকে ভালবাসে? নন্‌সেন্স!

—কি দোব স্যার!

—কষামাংস, কাটলেট-আর—

—মোগলাই দোব। গরম—

চঞ্চল গর্জন করে ওঠে।

—আলোচাল আর কাঁচকলায় সেদ্ধ করে গব্যঘৃত ছিটিয়ে আন। হবিষ্যি করতে এসেছি এখানে। এ্যাই গোবিনদা?

গোবিন ছুটে আসে—আপনি! কখন এলেন?

চঞ্চল গোবিন্দের রসাল বিশেষ খদ্দেরদের অন্যতম। চঞ্চল বলে ওঠে—নোতুন মাল কোত্থেকে রোজ রোজ আমদানী করো? এইবার ফাঁসবে তুমি নির্ঘাৎ! যাও—একবোতল, দুটোসোডা। কালো সওয়ার আছে—ব্ল্যাক নাইট! তাই দিও।

গোবিন বয়টাকে ধমকাতে থাকে।

—যা তুই যা। হিরুকে ডেকে দে!

হিরু এদিককার স্পেশাল বেয়ারা। সে এদের নাড়ি নক্ষত্র চেনে। শহরের রাতের জীবনের নবনায়কদের তার ধাত জানা। চঞ্চল জেরা করে।

—শ্রীদাম এসেছে? তিনুদা—

হাসে গোবিন। জবাব দেয়।

—কি জরুরী কাজে বের হয়েছে, আসবো তো বলেছে। ওরে বাবা, সামনের দরজা বন্ধ করে দে। রাত হয়েছে।

শেষ ট্রেন চলে গেল। তবু ওর কারবারে মন্দা নেই। রাতের অন্ধকারেই এখানে এসে জমে ওরা। ওঘরে তাসের আড্ডা বসেছে। এ তাস খেলার দান পড়ে পয়েন্টে নয়, টাকায়। নোটের বাণ্ডিল জমে এদিক ওদিকে। হাওয়ায় উড়ছে নোট। সিগ্রেটের ধোঁয়া আর মদের মৃদু গন্ধে ঘরটা ভ্যাপসা হয়ে উঠেছে।

ওপাশেই সেই পাড়াটা, বস্তির খোলার চাল চলে গেছে একটা জমাট অন্ধকারের মতো। ওরই খোপে খোপে ওরা বাস করে। দিনের বেলায় ওদের সাড়া মেলে না, সন্ধ্যার পর থেকেই ওদের দুচার জনকে দেখা যায় রাস্তার ধারের লাইটপোস্টের ধারে এক চিলতে আলোর নীচে ওদের সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকতে। কেউ কেউ আবার তারই মধ্যে একটু অন্য জাতের। তাদের রূপ যৌবন এখনও আছে। এমনি করে দেউলিয়া হয় নি। শহরের অনেকেই আসে তাদের সন্ধান করে।

চঞ্চল বের হয়েছে। সারা মনে করুণার সেই দেহটার নীরব আমন্ত্রণ, ওর বুকে এক অতৃপ্ত নেশার আগুন জ্বালিয়েছে। এ অবশ্য চঞ্চলের কাছে নোতুন নয়।

নিজের কাছেই বার বার মনে হয়েছে এ একটা সামাজিক অপরাধ, রাতের অন্ধকারে তবু নিজেকেই হারিয়ে ফেলে সে। ওই মাংসের স্বাদ আর মদের জ্বালাকরা বিশ্রী অনুভূতিটা সারাদেহ মনে চাঞ্চল্য আনে। নীতি বিবেক—সামাজিকতা?

কি তার দাম। ও দেখেছে ঘুণ ধরা এই সমাজের স্তরে স্তরে শুধু পাপ আর পাঁক। তার বাবাকে মনে পড়ে। মদ্যপ-লম্পট একটা জানোয়ার, মাকে মনে পড়ে না।

সব ভাবনার রেখাগুলো কেমন আবছা হয়ে যায়, শরীরের মধ্যে সারা মনে তার তীব্র জ্বালা। সুষমার কথা মনে পড়ে।

একটা বাঁধন কোথায় ছিল তার মনে।

ওকেই সে একটু ভয় করতো। কৃতজ্ঞও ছিল তার কাছে। কিন্তু সুষমাও চলে গেছে।···তাকে ফেরাতে পারে নি চঞ্চল।

··রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। গলিটায় পিচের প্রলেপ পড়ে নি। ভিতরে পেঁছায় নি বিজলীর আলো। ওটা বোধ হয় মিউনিসিপ্যালিটির কর্তারাই দেয় নি ইচ্ছে করে, এখানে যারা আসে তারা অন্ধকারটাকেই পছন্দ করে। তাদের জন্যই এটা আঁধারই রয়ে গেছে।

দু একটা লম্প জ্বলছে, বাতাসে কাঁপছে সেই লালাভ শিষটা। মনের সব কামনা আর লালসার মতো ওটা নিষেধের বেড়া টপকে কেবল হু হু করে জ্বলে ওঠে।

—ও বাবু!

কে এককলি গান গায়। ওর মাতাল সুরটা ওর চলনের সঙ্গে সঙ্গে যেন টলছে

—পিরীতের এমন কেন জ্বালা লো।

ও সজনী।

পিরীতির আসল হ'ল কালা।

কে বলে চোখে ধরছে না নাগর?

চঞ্চল চলেছে এই অন্ধকার জগতের মাঝ দিয়ে। ওদের অনেককে সে চেনে; দেখেছে। অল্পবয়সী একটা মেয়ে বলে ওঠে।

—সেই নিকিয়ে বাবু গো দিদি! ও কেবল খুঁজছে আর খুঁজছে!

থমকে দাঁড়াল চঞ্চল। ওদের হাসি আর ওই ঠারে ঠোরে কথাগুলো কানে আসে। ও যেন খুঁজছে, কাকে খুঁজছে, কি খুঁজছে সেইটাই জানে না শুধু লক্ষ্যভ্রষ্টের মতো সে খুঁজেই ফিরছে। সবকিছু তার হারিয়ে গেছে।

রাত কত জানে না।

শান্ত স্তব্ধ এ পল্লীর বাইরের জীবন। রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেছে। আকাশে দু'একটা তারা জ্বলছে কি নীরব আকুলতা নিয়ে। চঞ্চল এপথ যেন চেনে না। চলেছে সে—সামনের মাটি পথ সব কেমন একাকার হয়ে গেছে। মনে হয় ওর মাথাটা নুইয়ে পড়ছে নীচের দিকে, ওই পথটা কেবলই বেঁকে গেছে, এঁকেবেঁকে গেছে, তাকে ধরা যায় না। ধরবার জন্যই বার বার কষ্ট পাচ্ছে সে—তবু ধরতেই হবে।

অন্ধকার!···সামনে চকচক করছে গঙ্গার বিস্তার। পথটা এইখানে এসে থেমে গেছে। জলের মাঝে রাতের বাতাস শব্দ তুলেছে, দূরে আকাশে মাথা তুলে আছে কলকারখানার চিমনীগুলো—ওদের গায়ে লাল আলো; লাল চোখ মেলে ওরা কেবল শাসাচ্ছে। নিষ্ফল সেই শাসানি।

চঞ্চল কার ডাকে থমকে দাঁড়াল। দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। একটা চাতালে বসে পড়েছে, চাইবার চেষ্টা করে দুচোখ মেলে। মনে হয় গোবিনের দোকানে আজ সে দু বোতলই সাফ্ করেছে। কেবল মনে হয়েছে ট্রেনের দেখা মেয়েটার কথা। ও হাসছিল কেন? কাঁদতে পারে না ওরা?

কান্নার ক্ষীণ একটা সাড়া ওঠে। রাতের অন্ধকারে সেই ক্ষীণ স্বরটা এই বাতাসের ধমকানিতে মাঝে মাঝে থেমে যায়, আবার ফুটে ওঠে।

চাতালের উপর কাৎ হয়ে বসে পড়েছে চঞ্চল। মনে হয় সবাই যেন কাঁদছে। ওই করুণা কাঁদে—কেঁদেছিল সুষমা, তার মাও বোধহয় মরবার আগে কেঁদেছিল। দেখেছে ওই অন্ধকার ঝুপড়ির ঘরগুলোয় ওরা রূপের বেসাতি সাজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর কাঁদে। সব জায়গাগুলো ওই কান্নার স্বরে ভরা। মিসেস দের কথা মনে পড়ে। মা হতে পারে নি সে। স্বামীও তাকে ফেলে চলে যায়। টাকাকড়ির অভাব নেই। মিসেস দে সেদিন মদ খেয়ে ওর কোলে মাথা রেখে কেঁদেছিল।

ওরা সবাই কাঁদে। হঠাৎ কান্নার জগৎজোড়া একটা স্তব্ধ বিষণ্ণতার মাঝে হাসছে কে, খিলখিল করে হাসছে। সব কিছুকেই যেন বিদ্রূপ করে ওই হাসিটা তীব্রস্বরে। চঞ্চলও কিসব ভাবছিল। মনে হয়েছিল রাতের অন্ধকারে সে বোধহয় কাঁদছিল। বড় একা সে, পয়সা মান প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অনেকেই তাকে সমীহ করে। কিন্তু কি পেয়েছে সে? তার সামনে ফুটে ওঠে কেবল কতকগুলো কামনাবিহ্বল বীভৎস মুখ—দেহ নয় মাংসপিণ্ড। জৈবিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছে মাত্র কিন্তু জ্বলে উঠেছে দুর্বার আগ্রহে সেই বুকের জ্বালা, আগুন নেভে নি, বেড়েছে মাত্র।

হাসির শব্দটা ওঠে রাতের অন্ধকার কাঁপিয়ে।

—কে! চঞ্চল বিরক্ত হয়ে চোখ মেলবার চেষ্টা করে।

—আমি গো! আমি কদম।

চঞ্চলের মনে হয় তার সারা দেহটা অসাড় হয়ে আসছে। গা-টা গুলিয়ে ওঠে। সব ইন্দ্রিয়গুলো শিথিল হয়ে যায়। বেশী মদ খেলে মাঝে মাঝে এমনি হয়ে যায় তার। বোধহয় বমি করছে, মুখে নোনতা স্বাদ জাগে, মোচড় দিয়ে ওঠে পেটের নাড়িগুলো। দুটো নরম হাত ওকে চেপে ধরেছে। ওর মাথার চুলের আমলা তেলের একটা তীব্র গন্ধ ওঠে।

বলিষ্ঠ দুটো হাতে ধরে ওকে তুলে বসিয়ে দিল চাতালে, ঘটিতে খানিক জল এনে ওর মুখে কপালে দিতে খানিকটা সুস্থবোধ করে চঞ্চল। দম নিচ্ছে।

অনেকটা হালকা বোধ করে সে। ওই নোংরা জঞ্জালগুলো বের হয়ে গেছে। কদম বলে।

—এসব ছাই পাঁশ গেলো কেন ?

চঞ্চল ওর দিকে চাইল। পারঘাটের ঘাটোয়ালের বৌ, এককালে ওই ঘাটোয়াল হয়তো ছিল, কবে মরে গেছে। তখন থেকেই কদম এঘাট মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ইজারা নিয়ে নিজেই দেখা শোনা করে।

কদমের সম্বন্ধে এখানের হাটে বাজারে ওই বিশেষ পাড়ায় নানা আলোচনা চলে। কিন্তু কদমের মনে সে সব কিছুই রেখাপাত করে না। চঞ্চলও ওকে দেখেছে ঘাটের ধারে ঝুপড়িতে বসে পয়সা আদায় করছে, কেউ পয়সা না দিয়ে সরে পড়বার তাল করলে কদমও গলা তোলে।

—গোবরা ধরতো মিনষেকে! দে মা গঙ্গায় গোটাকতক চোবানি দিয়ে।

কদমের দেহে যৌবনের জোয়ার। তার দেহে ভাটার টান সুরু হলেও বোঝার উপায় নেই। নিটোল ভরপুর দেহ, মাটির মতই একটা কোমলতা ফুটে থাকে তাতে।

মড়াঘাটের খাতাবাবু ঘনশ্যাম বলে—ওই গাংএই ডুবে মরবো কদম!

হাসে কদম—এখানে কেন? সাতঘাটের জলখেয়ে শ্মশানঘাটে এসে ঠেকেছো, চিতের তো অভাব নেই, পয়সাও লাগবে না উঠে পড় না একদিন দুর্গা দুর্গা বলে।

কদম রাতের অন্ধকারে মাঝে মাঝে গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকে। পারাপার এখন বন্ধ। অনেক রাত অবধিই নৌকা চলে, অনেক বিচিত্র আরোহী মালপত্র তাতে থাকে। কদম শুধু দেখেছে মাত্র। তার কেমন ঘেন্না করে ওই মেয়েগুলোর হাসি আর সাজগোজ দেখলে। বেহায়ার শেষ।

পুরুষগুলোকে মনে হয় ঘেয়োকুকুর, দিনরাত শোঁক শোঁক করে কেবল পচা মাংসের সন্ধান করছে। তার মনের সেই জ্বালাটা ক্রমশ কমে আসে রাত নির্জনে। নিজের হারানো মানুষটাকে ক্রমশ ওই নোংরার প্রবাহতল থেকে খুঁজে পায়।

মনে পড়ে গিরিশকে, ভালবেসেছিল তাকে। কি উন্মাদ প্রচণ্ড সেই ভালবাসা। কদমকে নিয়ে এখানেই ঘর পেতেছিল। ঘাটের ডাক নিয়েছিল সেই-ই, বুদ্ধিটা কদমই দেয়। অবশ্য তার জন্য কদমের গায়ে ধুলোকাদাও লেগেছিল। তখনকার চেয়ারম্যান মতিলালবাবুর কদর্য দেহটাকে এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সেদিন দুঃখ হয়েছিল তার, কিন্তু মা গঙ্গার জলে নেমে ধুয়ে সব জ্বালা ভুলতে চেয়েছে কদম। তবু একটা আশ্রয় তাদের চাই। সেটুকু এমনিতে কেউই তাকে দেয় নি, তার জন্য দাম দিতে হয়েছিল তাকে, কদমের ইজ্জৎ; তার দেহটাকে ওরা জানোয়ারের মতো ভোগ করেছিল।

সেদিন থেকেই কদমের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল পুরুষ জাতের প্রতি একটা

ঘৃণা। তার স্বামী গিরিশ ঘাটোয়াল সেটা জানতো তবু প্রতিবাদ করে নি, বরং এগিয়ে দিয়েছিল।

কদমের সে একটা জ্বালা। গিরিশকেও তাই মাঝে মাঝে সইতে পারতো না। মদ খেতো গিরিশ, কদমও গালাগাল দিত। মুখে আগুন মিন্সের গলায় দড়ি জোটে না?

গিরিশ ঠা ঠা করে হাসতো।

—জুটেছে, তবে দড়ি নয়, প্রেমডোর যিগো।

প্রেমডোর!

কদমের কাছে সব প্রেম ভালবাসা ক্রমশ কেমন ঘোলা হয়ে যায়। তবু গিরিশকে সে ভালবাসতো, নইলে তার মৃত্যুর পর এমন করে কেঁদেছিল কেন? মনে হয়েছিল ভালবাসা ঠিকই আছে। সেখানে খিদে নেই, মাংসের নেশা নেই। সব নেশা সেখানে শান্ত স্তব্ধ।

গঙ্গার বুকে তারপরও অনেক জল বয়ে গেছে। অনেকে ভিড় করেছে তার জীবনে, ঘাটছাড়া নৌকার কেউ হিসাব করে না। পালে হাওয়া লাগিয়ে তারাও অকুলে হারিয়ে যায়। কদম তাদের ভুলেছে। তবু মনের অতলে একটি সুর জাগে—বিচিত্র সেই সুর। কি নেশা।

—কেন এসবগুলো। নেখাপড়া শিখেছো ভদ্দরনোক বাবু মাশায়, এই বয়স।

হাসে চঞ্চল। কদম ওর দিকে চেয়ে থাকে। বলে চলেছে সে—বিয়ে থা করে ঘর-সংসার কর।

চঞ্চলের নেশাটা তখনও কাটে নি। আবছা তারার আলোয় ওর নিটোল দেহের দিকে চেয়ে থাকে। বলে সে—

বিয়ে! কার জন্য করবো বল! সবশালা কুত্তা আর কুত্তি, তুইতো বিয়ে করেছিলি, কটা ব্যাটাছেলে হ্যাংলা কুকুরের মতো ঘুরেছে আশপাশে বল?

কদম শিউরে ওঠে। এসব কথা সে ঠিক শুনবে আশা করে নি। হয়তো কথাগুলো কতক সত্যিই? কিন্তু তবু মনে হয় ওটা ভুলই। মানুষ তবু ঘর বাঁধে, নিজের সামান্য নিয়ে সুখী হয়। এ যেন বিচিত্র মানুষ। ওর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে। দেখেছে ও চঞ্চলকে। গঙ্গার বুকে মাঝিদের জেলে ডিঙিতে ঘোরে। মদ খায় খেউর গায়। আবার দেখেছে শহরের তাবড় লোকের সঙ্গেও। কাগজেও নাকি ছবি ছাপা হয় ওর। দিনের আলোয় দেখেছে ফিটফাট ভদ্দর লোক। এখন দেখছে বিচিত্র একটা মানুষকে।

হাসছে চঞ্চল—তবে বল, ওসব ফালতু ঝামেলায় কি হবে? বেশ আছি। তুই তো বিয়ে থা করতে পারিস, ওই খাতাবাবু ঘনাটাকে। করিস্ নি। তালে? ন্যাটামি! আবার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে।

…কদম ওর দিকে চেয়ে থাকে। মুখের মতো জবাব দিয়েছে তাকে কদম জা ওকে। জানতো সুষমার কথাও। ওর সঙ্গে ও মাঝে মাঝে এখানে আস দেখেছিল চঞ্চলকে। কদমের ভালো লাগে ছেলেটিকে। ওর কথায় রাগ করে ন হাসে কদম।

চঞ্চলের নেশার সেই জড়তাটা কেটে আসছে। তার মনে হয় এইখানে আসতে মাঝে মাঝে সে আর সুষমা। মেয়েটাকে চেনে তখন থেকেই। সুষমার কথা ম পড়ে। সব কোথায় হারিয়ে গেছে। চঞ্চলকে অবহেলাই করে গেছে সে। এ মেয়েটাকে দেখে মনে হয় ভরা গাং-এর মতো ওর উথল পাথাল দেহ, ওতে ডুব দি মন চায় না। গাং-এর অতলে একদিন তলিয়ে যেতো সে, কিন্তু দয়া করে তা বাঁচিয়েছিল সেদিন ওই সমীর—এই ঘাটেই নৌকাডুবি হয়েছিল। কদম বলে ওঠে।

—চা খাবেন? র চা। শরীরটা সযুত হবে।

চঞ্চল উঠে পড়ল। রাত কত জানে না। দেহটা যেন নুইয়ে আসে ক্লান্তি আ দুর্বলতায়। কদম বলে।

—এতরাতে কোথায় যাবেন গো?

—জাহান্নামে। ত্যাঁদড়া মাগী কোথাকার।

আরও কি যেন খিস্তী করে ফেলে সে। রেগে উঠেছে ওর এই ভালোমানুষিপনায় বাগানের ধারে ঘরটায় দিকে এগিয়ে আসে নিশুতি মহল্লার মধ্য দিয়ে।

…দিনের আলোয় চঞ্চল আবার অন্য মানুষ। কাল রাত্রের সেই ঘটনাগুলে আবছা ছবির মতো মনে পড়ে। সে আরও কি সব করেছিল। কাছে বসেছে লেখাটাই তার কাছে একমাত্র পথ, অন্তরের তীব্র জ্বালা আর হতাশার প্রকাশ প এইটাই। চোখের সামনে দেখেছে বিচিত্র একটা সমাজকে। মানুষগুলে এখানে সব যেন অতল কোন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

বেউশ্যে পাড়ায় দেখেছে চাদরে গা ঢেকে সহরের অনেক তাবড় ব্যক্তিকে গোবিনের চায়ের দোকানের পিছনের অনেক কাহিনীও তার জানা। রাতে অন্ধকারে দেখেছে ওই বিচিত্র মেয়েটাকে। পার ঘাটের কদমকে মনে পড়ে। তা দুচোখে দেখেছে একটা অন্য চাহনি। সেবাও করেছিল সে তাকে। লিখতে ব রাতের দেখা সেই জগত আর দিনের আলোয় সেই মানুষগুলোকে মনে হয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

—দাদা যে, নমোস্কার!

গোরাচাঁদ এগিয়ে আসে। পরণে ময়লা একটা পাৎলুন, বগলে একটা ব্যাগ তার থেকে কিছু চাল রেখে দেয় একটা ছোট থলেতে।

—ভালো চাল পেলাম, দিয়ে গেলাম।

গোরাচাঁদের পেশা চাল-এর চোরাকারবার। রোজ দু এক খেপে সে চলে যায় খানা গুসকরার দিকে। ওই লাইনে তার ঝিল্লীবিল্লী বলে সেনা আছে

তারাও চাল আনে। সেই চাল সব গোরাচাঁদ একত্র করে জমা দেয় শহরের আড়তদার গয়াগতি সাহার মোকানে। গোরাচাঁদ ওকে লিখতে দেখে বলে।

আর ডিস্‌টাব করবো না দাদা। চলি।

—নে!

চঞ্চল দামী সিগ্রেট একটা এগিয়ে দেয় তার দিকে।

—আয় বাপ্‌, এযে চারমিনারের বাপ্‌ তিন মিনার গো। এ্যাঁ ॰

—চা খাবি? ঢাল ওই ফ্লাস্‌ক থেকে।

গোরাচাঁদের ভালো লাগে এই আত্মিকতাটুকু। এ ব্যবহার সে কোথাও পায় না। তারা অন্যের চোখে ঘৃণ্য একটা শ্রেণী। গোরাচাঁদ চা খেতে খেতে বলে।

—শালা গয়াগতি একটা হারামজাদা! বুঝলেন দাদা। আপনি মাইরি মস্ত লোক—ডাঁট গরম নেই, ওশ্লার নাহয় দুদো ট্যাকা কিছু আছে, তাই বলে মানুষকে মানুষ বলে না। কেবল ঠকাবে মাইরি। ওজনে মারবে। আমরা শ্লা পুলিশ হোমগাডের গুঁতো কোঁৎকা খেয়ে মাল আনবো, মারবেন উনি। দোব একদিন ফিনিস্‌ করে। গোরাকে চেনো নি শ্লা—

জানে চঞ্চল ওসব গোরার চোটের কথা। গয়াগতিকে নাহলে ওদের চলবে না। গয়াগতিও ওদের কারবারে ফুলে উঠেছে। মেলাই জায়গা জমি কারবার ফেঁদেছে। মিউনিসিপ্যালিটির অন্যতম মাতব্বর। চঞ্চলের ভালো লাগে ওই গোরার মতো ছেলেদের। ওদের মাঝে নিজের হারানো একটা সত্ত্বাকে যেন খুঁজে পায় সে।

—দেশ কোথায় ছিল তোর?

হাসছে গোরাচাঁদ—দ্যাশ! দ্যাশ তো দেখি নি দাদা। শুনেছি আমাদের দেশ ছিল ঢাকার ওদিকে। বেশ সবুজ গ্রাম। একটু থেমে গোরাচাঁদ বলে কে আর জানবে সে কথা বলেন। মা-টা বেঁচে ছিল, সেও গেল এবার। ধুঁকে ধুঁকে মরে গেল; আমি তখন এ্যাই টু। দেশ বেশ আর নেই, বাকি এইখানে, ব্যস।

গোরাচাঁদের ওই বৃত্তান্ত। ওরা স্বয়ম্ভু। চঞ্চলের মতই। কেউ কোথাও তাদের ঠাঁই দেয় নি, কারোও প্রতি ওদের কোন দায় দায়িত্বও নেই। কর্তব্য-নীতি শালীনতা তাদের কোন উপায়ই করে দেয় নি। ওরা সমাজের বাতিল একটি শ্রেণী।

জানলার সামনে একটা উস্কোখুস্কো মেয়েকে দেখে চঞ্চল চাইল। মেয়েটার পরণে একটা ডুরে শাড়ি—দুচোখের তারায় কি কৌতুক। গোরাচাঁদ ধমকে ওঠে।

—তুই যা না ইষ্টিশানে, আমি যাচ্ছি।

—ও কে রে? চঞ্চলের কথায় গোরাচাঁদ হাসল। সলজ্জ একটু হাসি। জবাব দেয়।

—দলেরই মেয়ে। গৌরী! ওসব কথা ছাড়ান দ্যান দাদা, কোত্থেকে যে ঘাটের

মড়া সব এসে জোটে। দুনিয়াতে কেবল নাই নাই রব। গোরা শ্লার যেন বাপের জমিদারী, ওদের নিয়েই কারবার।

হাসে চঞ্চল—মেয়েটা বেশ ভালো রে?

গোরা গর্জন করে—হাড় খচ্চর। চলি দাদা। বেশকোরে একটা আমাদের গপ্পো লিখুন দিকি, অনেক মজা আছে কিন্তু বলবো একদিন।

বের হয়ে গেল গোরাচাঁদ। ওই মেয়েটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। চঞ্চল। দেখেছে গোরার ঝড়ো বিক্ষুব্ধ মনে ওই মেয়েটাও কোথায় সাড়া তুলেছে। কিন্তু মনে হয় ওটা দেশাই।

মেয়েটা গোরার ব্যাগটা নিজের কাঁকালে তুলে নিয়ে চলছে দুজনে। গোরার মুখে কিসের হাসি ফুটে ওঠে। গয়াগতি সাহার ঠকানোর ব্যাপারও তারা হয়তো ভুলে গেছে এখন।

চঞ্চলের মনে হয় ওরা সবাই একই স্তরের। প্রচণ্ড ভাঙ্গনের ধাক্কায় তারা কে কোন্ দিকে ছিটকে পড়েছে। মূল সুর বলতে সেই হাহাকারই।

…হঠাৎ সমীরকে এসময় দেখবে ভাবেনি। চঞ্চল ওর পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল। সমীরকে মনে হয় এই জীবনের মাঝে একটা ব্যতিক্রম। এতবড় ভাঙ্গন এই জ্বালাকে ওরা বিশ্বাস করে না। নিজের চারপাশে একটা খোলস তৈরী করে তারই মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায় তারা। শুক্‌নো নীতি কর্তব্য-শালীনতা নৈতিক চেতনা ইত্যাদি গালভরা কথা বলে আর নিজের না পাবায় অক্ষমতাটাকে তেমনি আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে ভুলে থাকতে চায়।

সমীরকে দেখে চঞ্চল অভ্যর্থনা জানাল।

—এসো।

সমীর কালকের ঘটনাটা ভুলতে পারে নি। নাইট সিপ্‌টের ডিউটিতে যাবার সময় দেখেছে ওই চঞ্চলকে গোবিনের দোকান থেকে মদ্যপ অবস্থায় বের হতে। সমীর গম্ভীরভাবে বলে।

—এসব কি করছ চঞ্চল?

চঞ্চল হাসতে থাকে—সিগ্রেট নাও।

—বিড়িতেই চলবে, ওসব থাক!

চঞ্চল তখনও হেসে চলেছে, বলে সে।

—উপদেশ আর দিও না সমীরদা। ওসব পুরানো হয়ে গেছে। মদ খেয়েছিলাম বলবে তো? ওটা একটা জ্বালার বহিঃপ্রকাশ—না হয় সেই জ্বালাটাকেই ভুলে থাকার চেষ্টা বলতে পারো।

সমীর ওর কথায় বেশ কঠিন স্বরেই বলে।

—জ্বালা কোথায় দেখলে?

—সর্বত্রই। ওটা দেখার চোখ তোমার নেই, নয়তো অনুভূতিও নেই।

আশপাশ—সহরে-পথেঘাটের মানুষদের দিকে চেয়ে দেখেছো সমীরদা, সবাই খোলসের আবরণে জীবনের সব পরাজয় হতাশা আর নগ্ন অভাবকে ঢেকে চলেছে। ভিতরটা তাদের ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, সব খড় গোঁজা মানুষ। তাদের কাছে নীতি-ধর্ম-শালীনতার কি দাম থাকতে পারে বলো ?

সমীর ওর এই সর্বনাশা কথায় বিশ্বাস করতে পারে না। তার কাছে মনে হয় এই অভাব-বঞ্চনার মাঝেও মানুষ বাঁচবে আবার নোতুন করে, জীবনকে সুন্দর করে তুলবে। তাই বলে সে।

—এই দুর্দিন চিরকাল থাকবে না, একে সইতেই হবে। তবু বাঁচতে হবে।

চঞ্চল জবাব দেয়।

—যদি সে আপোষ করতে না চাই ?

—তাহলে ঝড়ের রাতে গঙ্গায় ডুবতে গিয়ে আর্তনাদ করেছিলে কেন ? বাঁচতে চাও নি সেদিন ?

চুপ করে চায় চঞ্চল সমীরের ওই কথায় বলে উঠে তবু।

—ভুল করেছিলাম। আজ সবকিছুকে ঘেন্না করি।

সমীর জবাব দেয়।

—তাই সবকিছু শ্রী শালীনতা নীতিকে মানি না। চারিদিকে লোভের জাল পেতে আগুন জ্বালাতে চাও। মানুষের এই দৈন্য-হতাশা তোমার কাছে বেসাতিতে পরিণত হয়েছে। তুমি এদের চেয়েও আরও নীচ।

হাসছে চঞ্চল। ও জানে সমীরের রাগের কারণটা কি। তাই স্পষ্ট কথায় বলে—তুমি করুণাকে ভালোবাসো—না ?

—চঞ্চল! সমীর হঠাৎ গর্জে ওঠে।

—মারবে নাকি ? চঞ্চল ওর বিস্ফোরণে অবাক হয়।

সমীর সামলে নিয়েছে—না!

—ওকে ভালবেসো না। কাউকে ভালবেসো না ? দুঃখ পাবে।

সমীরের মুখচোখ কঠিন হয়ে ওঠে। আর কোন কথা বলল না। বের হয়ে গেল সে। চঞ্চল তখনও হাসছে। ও জানে না ভালবাসার রূপ আজ বদলে গেছে।

সমীরও অবাক হয়। এসব কথা সে বলতে চায় নি। কিন্তু চঞ্চলকে আজ সে সহ্য করতে পারে না। তাই বোধ হয় ওই কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করছে। আজ মনে মনে ওর উপর ক্ষুব্ধই হয়েছে সে। সুষমার স্বামী গোপাল কাল এসেছিল, সেও বেশ কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে ওই সুষমাকে নিয়ে। তার সারা জীবন সংসার নাকি জ্বালিয়ে দিয়েছে ওই মেয়েটা। তার জন্য দায়ী ওই চঞ্চলই। সমীর দেখেছে তার জীবনেও চঞ্চল একটা গ্রহ।

করুণাকে কেন্দ্র করে তার মনের অতলে ছিল অনেক স্বপ্ন অনেক কামনা। কিন্তু সেই সামান্য চাওয়াটুকুর দিকেও দৃষ্টি দিয়েছে।

করুণাকে কাল রাত্রে বিশেষ কিছু বলতে পারে নি। আজ সকালেই গিয়েছিল ওদের ওখানে। করুণা স্নান সেরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গুণগুণ করে কি যেন একটা গানের কলি আলাপ করছিল। ওর ভিজে চুলগুলো পড়েছে পিঠ ছেয়ে। চোখের কোলে কাজলের ধোঁয়া ধোঁয়া আভাস। সুন্দর পুরুষ দেহের লালিত্য ঘিরে ধানিরং শাড়িখানা ওর দেহকে কি নীরব আকর্ষণে মোহময় করে তুলেছে।

হঠাৎ সমীরকে এসময় আসতে দেখে ওর দিকে চাইল দুচোখ মেলে।

—তুমি! এসময় ?

—এলাম! বেশ অবাক হয়েছো দেখছি ?

সমীরের কথায় করুণা কি যেন অন্য সুরের সন্ধান পায়।

—খুব রেগে আছো না ?

—তোমার লজ্জা করা উচিৎ! সমীর সতেজ কণ্ঠে বলে কথাটা। করুণা অবাক হয়েছে, তার ফর্সা মুখখানা টকটকে হয়ে ওঠে। নিজের মান অপমান নিয়ে সেও সচেতন। ওর কথাগুলো ভালো লাগে না। জবাব দেয় করুণা।

—লজ্জা! লজ্জা করবে কেন ? চাকরি করতে হচ্ছে, এটা কি আমার লজ্জা ?

—তুমি এইকথা বলছো কেন তাও জানি।

—সেটা হঠাৎ জেনেছো। আজ নোতুন জগতের চমক আর চটক দেখেই ভুলেছো তুমি। তার আড়ালের গরলটাকে চেনো নি করুণা।

হাসছে করুণা।

—এসব অক্ষমের নীতি উপদেশ। তাছাড়া ওসব কথা শোনার সময় আমার নেই। আপিস বেরুতে হবে।

—আপিসে না অভিসারে ? সমীর ওর মুখের উপর কথাগুলো ছুঁড়ে মারে। চমকে ওঠে করুণা। এখুনি যেন রাগে চীৎকার করে উঠবে সে। নিজেকে সংযত করে কঠিন স্বরে বলে—এখন তুমি এসো।

নিজেই চলে গেল করুণা রান্নাঘরের দিকে। তাকে আজ বেরুতে হবে।

চাকরিতে যোগ দেবে আজ থেকে। এসময় আর কথা কাটাকাটির মধ্যে যেতে চায় না।

ওখান থেকে বের হয়েই সমীর এসেছিল চঞ্চলের কাছে।

আজ সবকিছু পরিবেশ তার সামনে দ্রুত বদলে যাচ্ছে। মনের মধ্যে একটা তীব্র জ্বালা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। মনে হয় তার সব ধারণা চেতনা একটা বিরাট আঘাতের সামনে কি যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠেছে।

চঞ্চলের কাছে মনে হয় এটা অতিসহজ সত্য কথা। তবু সমীরকে এসব কথা সে বলতে চায় নি। নিজের কাছে নিজেরই বিশ্রী লাগে। তাই সমীরদের বাড়ির দিকেই বের হয়েছে সে।

পথে তখন ভিড় সুরু হয়েছে। মহানগরের শহরতলী। সারা শহরতলীর

মানুষ দৌড়চ্ছে স্টেশনের দিকে। ট্রেনের টাইম ওদের মুখস্থ পোষাকও কম বেশী একই ধরনের। হাতে ছোট থলেতে টিফিনকৌটা আর অফিস লাইব্রেরী থেকে গিন্নীর জন্য আনা একটা নভেল, কারোও হাতে সকালের পাটকরা কাগজ, পান মুখে দিয়ে দৌড়চ্ছে স্টেশনের দিকে।

ওদের ভিড়ের মাঝে দু একটি মেয়েকেও দেখেছে। তারাও চলেছে আপিসে। এ বেলায় ওদের রূপ আলাদা, স্নান সেরে একটু প্রসাধনও করেছে। ফেরার সময় ওরা ফেরে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে।

—কি, আপিস চল্লে নাকি ?

করুণাও চলেছে। করুণা চঞ্চলকে দেখে দাঁড়াল। ওর মুখচোখ উলসে ওঠে ওর অজ্ঞাতেই। চঞ্চল জানে ওই উচ্ছলতার অর্থ, এগুলো তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে সহজেই ফুটে উঠে। করুণা বলে।

—আপনি বেশ আছেন ? দশটা পাঁচটা করতে হয় না।

চঞ্চল বলে না করলেই তো পারো।

—কেন ? দুটো কালো চোখের ভ্রূতে একটু আবেশ।

—অনেকেই তো সব দায় ঘাড়ে নেবার জন্য তৈরী আছেন। সমীর—হাসে করুণা। সেই হাসিটুকুতে বেদনা আর অবজ্ঞাই ফুটে ওঠে সবচেয়ে বেশী করে শোনায়।

—হ্যাঁ। মাঝে মাঝে বলতো বটে, এখনও সেই দাবী নিয়ে শাসাতে আসে। আজও এসেছিল। আমি তাকে চলে যেতে বলেছিলাম—

চঞ্চল ওর কথাগুলো শুনছে। করুণা তার মনের মাঝেই আজ নিজের পথ সন্ধান করে নিয়েছে। বলে সে।

—যেতেদিন ওসব কথা। চলি। পরে দেখা হবে।

চঞ্চল হাত নাড়ল একটু। করুণা যেতে যেতে তার দিকে দু একবার ফিরে চাইল।

চঞ্চলের মনে ক্ষণিকের জন্য একটা সুর ওঠে। কেমন নেশা জাগানো অনুভূতি। খেয়াল হয় চঞ্চলের সে চলেছিল সমীরদের ওখানে।

এদিকটা শহরের অন্যপ্রান্ত। ওপাশের মাঠের সীমানা। কলকারখানার ভিড় নেই। মাঠের ধারে বসেছে নোতুন একটা কলোনী। নুইয়ে পড়া ঝুপড়ির মতো ঘর—আশপাশে আধনেংটা ছেলেগুলো খেলা করছে।

ওদিকে পুরানো কালের একটা শিবমন্দির। বাংলা ইটের গাঁথুনি তার আশপাশ থেকে ছাড়ছে, নাট মন্দির ছিল বহু আগে, এখন সেটা ধ্বংসস্তূপই বলা যায়। এককালের সাজান বাড়ি বাগান পুকুর ভিটে পুরীতে পরিণত হয়েছে। গজিয়েছে অশথ আশশেওড়ার জঙ্গল কচুগাছগুলো কাঁচা নর্দমার বুক বুজিয়ে দিয়েছে।

ওপাশেই সমীরদের ধ্বসেপড়া বাড়িটা। চারিদিকে কেবল ভাঙ্গনের পালা। তার মাঝেও কোনরকমে চুনপলেস্তারা করে এরা বাস করছে। পুকুরঘাট থেকে স্নান করে উঠে আসছে প্রতিমা।

চঞ্চল ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

অনেকদিন এদিকে আসে নি। সময়ের ব্যবধানে ওরা বেড়ে চলেছে লকলকিয়ে উঠেছে। চঞ্চলের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই খুশীতে উপছে পড়ে প্রতিমা।

ভিজে শাড়ির আবরণ ভেদ করে নিটোল পূর্ণতা ফুটে ওঠে কি স্বপ্নময় আকর্ষণে। প্রতিমাও ওর চোখে কি নেশার স্পর্শ দেখেছে। প্রতিমা সদ্যজাগর যৌবন চকিতের জন্য শিউরে ওঠে। সামনে গিয়ে বলে—যাক্ তবু মনে পড়ল। বসুন, আসছি।

সমীরের ঘরখানাই এবাড়ির বসবার ঘর। ওকে সেখানে বসিয়ে রেখে চলে গেলে প্রতিমা ভিতরের দিকে। কল্যাণীও ওর সাড়া পেয়ে বের হয়ে আসে।

—ভালো আছো তো বাবা?

চঞ্চল ওর দিকে চেয়ে দেখছে, জবাবটা দেয় সংক্ষেপেই—চলছে। হরিপদবাবুর কাশির শব্দ শোনা যায়। শুকনো শীর্ণ দেহটা থেকে বিকট একটা শব্দ ওঠে।

—কেমন আছেন চঞ্চল দা?

ঘরে ঢুকছে সমীরের ছোট ভাই তিমির, অনেক বড় হয়ে উঠেছে সে। কল্যাণী বলে।

—ওই তিমিরের কথাই বলবো ভাবছিলাম বাবা।

তিমির খেয়ে দেয়ে খাতা হাতে নিয়ে বের হয়ে গেল ব্যস্তসমস্ত হয়ে। কোথায় টাইপ শিখছে। কল্যাণীর আজ চঞ্চলের কাছে অনেক আশা দাবী যেন আছে তার উপর। বলে কল্যাণী, সংসার তো অচল হয়ে উঠেছে বাবা। সমীরের একার উপরই সব। তিমির তো পাশ করে বসে আছে, প্রতিমার পড়ার খরচ, ওঁর চিকিৎসার খরচ একা সামলাবে কোনদিকে। তাই বলছিলাম বাবা অনেক ঠাঁই তো যাতায়াত করো এখন নাম ডাকও হয়েছে যদি কাউকে বলা—প্রতিমা ঘরে ঢুকেছে, বেরুবার আয়োজন করে।

কোথায় চল্লে?

স্কুলে যেতে হবে না? বই খাতা নিয়ে তৈরী হয় সে।

সমীরও নেই সারা বাড়িটাকে ঘিরে একটা কালো ছায়া নেমেছে। এখানে মন টেঁকে না, কি ভেবে উঠল চঞ্চল।

চল, আমিও ফিরবো।

কল্যাণী চেয়ে থাকে ওদের দিকে। আজ মনে হয় চঞ্চল ওদের অনেক কিছু সাহায্য করতে পারে।

অফিস যাত্রীদের ভিড় কমেছে। রাস্তায় নেমেছে সকাল আর দুপুরের মাঝামাঝি

রোদের আভাস। চঞ্চল আর প্রতিমা চলেছে। প্রতিমাই বলে দাদা কিন্তু আপনার উপর ফায়ার হয়ে আছে।

—কেন? চঞ্চল না জানার ভান করে।

প্রতিমা হাসছে, বিচিত্র একটু হাসি। ছোট্ট মেয়েটা হঠাৎ কেমন বদলে যায়। একটা রহস্যময় জগতের আবছা সন্ধান যেন পেয়েছে সে। তার সদ্যজাগর মনে তারই কৌতুকময় আবেশ। কি হল?

প্রতিমা বলে আপনি নাকি করুণাদিকে নিয়ে কলকাতায় যান, মেশেন। দাদার আবার 'ইয়ে' কিনা? কালতো মাকে দাদা আপনার কথা নিয়ে কি সব বলছিল।

চঞ্চল চুপ করে থাকে। প্রতিমা দেখছে চঞ্চলকে ওর মধ্যে কি যেন একটা আকর্ষণ আছে, দিদিকেও দেখেছিল ওকে ভালবাসতো দিদিও, করুণাদির মতো মেয়েও ওকে ভালবাসবে এতে অবাক হবার কিছুই নয়। প্রতিমার মনে হয় তার মনের মাঝেও একটা সুর ওঠে! হঠাৎ করুণার জন্য কেমন হিংসা বোধ করে সে। রাস্তাটায় লোকজন বিশেষ নেই। রেল-কলোনীর রাস্তার দুদিকে গোলমোড়, সোঁদাল গাছে এসেছে হলুদ ফুলের গুচ্ছ। ছায়া পড়েছে রাস্তার বুকে ঠাঁই ঠাঁই আলোর মাঝে কালো ছোপের মতো। বলে চলেছে প্রতিমা।

করুণাদি কিন্তু ভালো মেয়ে নয়। ওর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনি, ওর চাকরির ব্যাপারেও নানা কথা উঠেছিল।

হাসে চঞ্চল। প্রতিমার মনের ছবিটাকে সেও দেখেছে। করুণার সম্বন্ধে চঞ্চলের কোন কোতূহলই নেই। তার প্রয়োজন সামান্যই! মোহ! ভালবাসা! এসবের কোন ঠাঁই তার মনে নেই!

—চঞ্চল যে! ভালো আছো?

চঞ্চল ওর নাম ধরে ডাকতে দেখে থামল। সদানন্দবাবু চলেছেন স্কুলের দিকে। স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাই সদানন্দবাবুর উদ্যোগে স্কুল বিরাট জায়গা নিয়েই শুরু হয়েছিল, এখন ওপাশে আরও নোতুন বাড়ি উঠেছে, গার্লস স্কুলও তৈরী হয়েছে।

সদানন্দবাবুই চঞ্চলকে প্রথম চাকরি দিয়েছিলেন। সেদিনের বানে ভাসা চঞ্চল এই স্কুলেই সামান্য একজন শিক্ষকের চাকরি পেয়ে ধন্য হয়েছিল, সেটাও হয়েছিল সমীরের জন্যই। অবশ্য পরে তার সঙ্গেও নীতিগত ভাবে সদানন্দবাবুর মেলে নি, চাকরি থেকে সরে এসেছিল চঞ্চল। সেদিন সে লিখে বেশ নাম করেছে।

সদানন্দবাবু ওকে চিনতে ভুল করেছিলেন। বৃদ্ধের চোখকে এই চঞ্চলের উপরের রূপটা সেদিন প্রতারিত করেছিল।

সদানন্দবাবু প্রতিমাকে ওর সঙ্গে দেখে একটু অবাক হয়েছেন। চঞ্চল অন্যান্যদের মতো প্রণাম করে না সদানন্দবাবুকে। বৃদ্ধকে মনে মনে সে হয়তো কিছুটা সমীহ

করে, তবে তাকে অন্ধ শ্রদ্ধা বলা যায় না। প্রণাম করার অভ্যাস তার নেই। জবাব দেয় ওর কথায়-–ভালোই আছি।

সদানন্দবাবু বলেন,—তোমার নোতুন বইখানা পড়ছিলাম। মানুষের মধ্যে ভালো টুকুকেই তুলে ধরবে তোমরা। পাপ নোংরামিই জীবনের বড় কথা নয় চঞ্চল। এমন চরিত্র সৃষ্টি করো যা হবে জাতির আদর্শ।

বুড়োর কথাগুলোই অমনি। বুড়ো হলে মানুষ বোধহয় অতীতের সব মালিন্য ভুলে স্মৃতিকে উজ্জ্বল একটা অনুভূতি দিয়ে ভরাট করিয়ে নেয়। তাই বর্তমান তাদের কাছে অন্ধকার, ভবিষ্যতেও তাই। জেগে থাকে শুধু অতীতই। বলে চলেছেন সদানন্দবাবু।

গৌরবময় অতীত, জাতির সংগ্রাম—মানবিকতার কথাই তো বলবে আজকের লেখকরা। সাহিত্য হবে সত্য আর সুন্দরকে নিয়ে।

হাসে চঞ্চল।

ওসব ধারণা আজ বদলে গেছে। দোষ গুণ নিয়ে মানুষ। পাঁকটাও জীবনে সত্য—তাকে এড়িয়ে সুন্দরের ঠাঁই নয়।

সদানন্দবাবু চুপ করে যান। তাঁর কথার উপর কথা বললে বুড়োর রাগ হয়, কিন্তু চঞ্চলের কথায় আজ মনে মনে দুঃখই পান তিনি। ওরা কোনদিকে চলেছে জানেন না।

নিজের জীবনকেও ওই পাঁক খুঁজতে গিয়ে পাঁকের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে না ওরা তাই বা কে জানে।

প্রতিমা ততক্ষণে স্কুলের মধ্যে ঢুকে গেছে, চঞ্চলও দাঁড়াল না। এগিয়ে যায় বাড়ির দিকে। সদানন্দবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। মনে হয় ও আগুন নিয়ে খেলছে। পয়সা পায় বই লিখে, তাই বই ও লেখে এমন যা বিক্রী হবে। আর তাই বোধ হয় সত্য কথা বলতে চায় না, ভয়ে না শুধু নিজেদের স্বার্থে কে জানে? ওরা সত্যকে বেসাতিতে পরিণত করেছে।

হঠাৎ একটা কি যেন তার গায়ের কাছে এসে পড়ল। বৃদ্ধ সনাতনবাবু সচকিত হয়ে এদিক ওদিকে চাইতে দেখেন মেয়েদের স্কুলের পাঁচীলের ওদিক থেকে একটি মেয়ে কি ছুঁড়ে দিয়েই সরে গেল। ওপাশে সাইকেল নিয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা ছেলে চোঙাপ্যাণ্ট পরা চোখে কালো চশমা সে ওই ঢিলটা পড়তেই এদিকে আসছিল, সদানন্দবাবুকে দেখে সরে গেল, মেয়েটাকে ঠিক চিনতে পারেন না সদানন্দবাবু, মেয়েটি তখন স্কুলের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে।

সদানন্দবাবু দেখেন বস্তুটা একটা ঢিল মোড়া চিঠি সেটা খুলতেই অবাক হন তিনি! মেয়েটা বোধ হয় ওই ছেলেটাকে চিঠি পাঠাচ্ছিল। বিশ্রী কদর্য ভাষা, ছত্রে ছত্রে নোংরামি।……

সদানন্দবাবুর সারা গা রি রি করে ওঠে ঘৃণায়, আর অসহায় রাগে।

জীবনটাকে অমনি রহস্যময় আর যৌনসর্বস্ব করে তুলেছে ওরা আজ থেকেই। কোন নীতিবোধ, শালীনতার চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

তারই উৎসাহ মেলে চঞ্চলদের অনেক তথাকথিত সাহিত্য সৃষ্টিতে, সেগুলোও নাকি পাঠকদের মতে, সমালোচকদের মতে সার্থক কালজয়ী সাহিত্যকৃতি!

সদানন্দবাবুর চোখের সামনে দিনের আলোটা অন্ধকার আবছা মনে হয়।

—এ্যাই যে স্যার আপনি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনু ওকে দেখে স্কুটার থামিয়ে মাটিয়ে পা দিয়ে কৈফিয়ত নেবার ভঙ্গীতে দাঁড়াল। এখন তিনু দাস আর শ্রীদাম সেন দুজনে স্কুলের বিল্ডিং কমিটির মেম্বর। তিনু আবার কার্যকরী সমিতিতে রয়েছে।

সদানন্দবাবু কমিটিতে ওদের প্রবেশ রোধ করতে পারেন নি, জানেন তিনুকে ব্যাক্ করেছে ওই নরোত্তম সাহু বাজারের লোহার কারবারী নরোত্তম শেঠ মায় জুটমিলের কর্তারাও। শ্রীদামও তার ডানহাত। পাড়ার সব মস্তান রুস্তমের দল তার হাতে। ওর রাতের অন্ধকারে কারবারের খবর এরা সবাই জানে।

সেবার ভোটের সময় বিপক্ষ দলের সঙ্গে কি নিয়ে বাধল গোলমাল, নিমিষের মধ্যে বোমার আওয়াজে সারা শহর কেঁপে ওঠে, বেশ কয়েকজনই জখম হয়েছিল। শ্রীদামকে তবু রুখতে পারে নি কেউ।

পান চিবুচ্ছে, আদ্দির পাজাবীতে পানের কসের দাগ, শ্রীদামের ওদিকে নজর নেই, তিনুর পরনে প্যাণ্ট আর টেরিলিনের সার্ট। সদানন্দবাবু জবাব দেন।

—এইদিকে আসছিলাম, তা ওবাড়ির ছাদ ঢালাই-এর কি হবে সিমেণ্ট এল না?

তিনুই বলে।

—তাই খুঁজছিলাম আপনাকে নরোত্তম শেঠ এমনিতে এত মাল দেবে না, ল্যাজে খেলাচ্ছে। শ্লাকে কিছু উপরি দিতে হবে আর কি! ধরুন শো দুয়েকটাকা দিদেন!

—এ্যাঁ। স্কুলের ব্যাপারে ও উপরি চাই!

অবাক হন সদানন্দবাবু। শ্রীদাম বলে ওঠে।

—বল বাব্বা! এটা কি নিজেরা নিচ্ছি স্যার? ও ব্যাটাকে দিতে হবে, নাহলে ছাদ অদ্ধেক উঠে পড়ে থাকবে।

তিনু যোগান দেয়।

—তাই দিচ্ছি তবে এর শোধ লিব স্যার। শ্লা নারোত্তম শেঠ পর্বালিকের কাজেও বা হাত চাইবে, একদিন বদ্‌লা লিয়ে লোব? চঞ্চল দেবেন টাকাটা। যতোসব সদানন্দবাবু স্তব্ধ হয়ে ওদের কথাগুলো শুনাছেন।

এটাকা কোথায় যাবে কে জানে? তবু মনে হয় ওদের লোভ আজ সর্বস্ব গ্রাস করেছে; নীতি-বিবেকবোধ সবকিছু। নইলে এই ব্যাপারেও টাকা চাইতে পারে

মানুষ তা তিনি জানতেন না। এখন না দিলেও উপায় নেই। তবুও বলেন সদানন্দবাবু।

—এতবড় অন্যায়টাকে প্রশ্রয় দিতে হবে?

তিনু বিজ্ঞের মতো জবাব দেয়।

—দিনকাল যে বদলে গেছে, শয়তানের যুগ পড়েছে স্যার। শ্লারা দিল্ খচিয়ে দিলে স্যার।

কিন্তু কমিটির কাছে কি জবাব দেব? সদানন্দবাবু ইতস্ততঃ করেন, হাসছে শ্রীদাম।

—এ ব্যাপার আর নোতুন কি স্যার, ওপন্ সিক্রেট। এসব আজকাল লাগে কাজ করতে গেলে। ব্যস।

চঞ্চলের চাহনিটা তাঁর চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তার চোখেও এমনি একটা ভাব দেখেছিলেন তিনি। কিছু পাবার—ভোগ করার ঠকাবার ভাব; সকলেই সেই নেশাতেই আজ পথের সন্ধান করছে। দুনিয়াটা ভরে গেছে ওদের ভিড়ে। কেউ খোঁজে অর্থ—কেউ খোঁজে মাংস—কেউ মনের সব বুভুক্ষাকে রূপায়িত করবার জন্য দুর্বার মোহে এগিয়ে চলেছে, মায় আগামী দিনের কিশোর কিশোরীর দল পর্যন্ত।

হাতে তখনও দলাপাকানো সেই প্রেমপত্রটা রয়েছে, কথা মনে পড়তেই কাগজখানাকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন সদানন্দবাবু।

তিনু শ্রীদাম তখন অপিসঘরের দিকে এগিয়ে গেছে।

আকাশ ছেয়ে কালো মেঘগুলো জমেছে। করুণা অপিস থেকে ফিরছে। এমনি মেঘজমা আকাশের অসীমে তার মনটা কোথায় উধাও হয়। আজ সে মুক্তির আনন্দে মত্ত, বোধহয় মন তাই দুর্বার হয়ে উঠেছে?

এতদিন সে ছিল অপরের দয়ায়, আজ স্বাধীন সত্ত্বার একটি মেয়ে নিজেকে নোতুন করে চেনে।

অপিসের মেয়েমহলের দু চারজনকে দেখেছে, তাদের সঙ্গে আলাপও হয়েছে। অনেক বৈচিত্র্যময় সেই রহস্যান্ধকার জীবনের গল্পও শুনেছে সে।

করুণার মনে হয় আজ যাকে রোজকার করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তার প্রতি অপরের উপদেশ দেবার দাবীও নেই।

সমীরকে তাই আর সহ্য করতে পারে নি করুণা। মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে, তার সঙ্গে কথা বলবার জন্য সন্ধ্যার দিকেও আসে তাদের বাড়িতে। সমীরের মনে যতদিন ভালোলাগার আবেশ ছিল, কোন কিছু চায় নি সে, ততদিন করুণা তাকে সহ্য করেছে।

কিন্তু সেই সমীরের চাওয়া আজ সোচ্চার হয়ে উঠছে। বলেছে সেদিন।

—বিয়ে করতে চাই করুণা।

করুণা ওর দিকে চেয়ে থাকে। পাটকলের কঠিন পরিশ্রমে সমীরের চেহারাটা কেমন চোয়াড়ে হয়ে উঠেছে। চোয়াল দুটো কে যেন চাড়িয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে, গলার স্বরটা ফ্যাঁস্‌ফেসে। করুণা হেসেছিল।

সমীর তবু বলে।

– কথাটা ভেবে দেখো করুণা।

সমীরের আর্থিক সামর্থ্য জানে সে। বাড়িতে সারা পরিবারের ভার তার উপর।

—তোমার কর্তব্য-নীতি-আদর্শ—

সমীর বলে—ভালোবাসার জন্য এটুকু দুঃখ সইতে পারো না করুণা?

করুণা সেদিনও বের হয়ে গিয়েছিল কি জরুরী কাজের ছুতো করে।

চঞ্চলকে দেখেছে, মাঝে দুএক দিন অপিসের পরও গেছে দুজনে কোন রেস্তোরাঁয়, স্বচ্ছ জলপ্রপাত যেন ওর জীবনপ্রবাহ, দুর্বার বেগে সবকিছুকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। করুণা স্বপ্ন দেখে।

সেদিন কালো মেঘটা সারা সহরের আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। দমকা বাতাসের বেগে মাঝে মাঝে ধুলোর ঝড় ওঠে; গাছ-গাছালিগুলো কাঁপছে যেন কি দুর্বার উল্লাসে।

বাড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল করুণা. সমীর তাদের বাড়িতে ঢুকছে। মনটা বিষিয়ে ওঠে। ওকে আর সহ্য করতে পারে না। কি ভেবে করুণা বাড়ির দিকে এগোল না, সামনের সরু গলিটা দিয়ে এগিয়ে চলে গঙ্গার দিকে।

ঝড়টা অতর্কিতে এসে পড়ে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে উথালপাথাল ঝড়ের মাতনে সারা সহর মেতে উঠেছে। চঞ্চল সেদিন বের হয়নি।

নোতুন উপন্যাসের কপি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। চরিত্রগুলো তার মনে ভিড় করে আসে। অনেকদিন আগেকার সেই উদ্‌ভ্রান্ত প্রথম-যৌবনের দিনগুলো আর সেই বিচিত্র চরিত্রের শোভাযাত্রা তার মনে কামনার পুরোনো সেই বুভুক্ষটাকে জাগর করে তুলেছে। তার সামনে মানুষের শুভবুদ্ধির তথাকথিত ভড়ংটা কতখানি অর্থহীন আর হাস্যকর তাই মনে হয়। মানুষ তাই নিয়ে মিথ্যার স্বর্গ রচনা করে।

আগেকার বাড়িওয়ালার গিন্নীর কথা মনে পড়ে, তার জীবনে দেখেছে সেই সতী সাজা মেয়েটার মনের পুঞ্জীভূত পাপ আর কামনার মাতাল নেশা, স্বামী ও স্ত্রীকে গোপনে রোজকার করাতো, নিজেও স্ত্রীকে দেখিয়ে হয়ে উঠেছিল জননেতা, ধর্মসংস্কারক। ধর্ম! হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার নেতা। ধর্ম! কথাটি একটা পাপ ঢাকবার ছুতো মাত্র।

বাউল বৈষ্ণবদের আখড়াতে মাঝে মাঝে ঘুরেছে সে। দেখেছে তার জীবনে

অনেক কিছু। পাপ নোংরামি করবি কর তাকে ঢাকবার ভড়ং কেন? পিত
স্বর্গ-পিতা ধর্ম।

মনে পড়ে চঞ্চলের অতীতে পেটের দায়ে মাষ্টারি করবার চেষ্টাও করেছিল তখন ওই শ্লোকটার মানে করতে গিয়ে বারবার তার মনে পড়েছে দীর্ঘদেহী মদ্য একটা লোককে, কুৎসিত ভঙ্গীতে একটা নীচু শ্রেণীর মেয়ের সঙ্গে রসিকতা করছে স্বর্গ! ধর্ম! ধ্যাত্তোর! তার ছাত্রকে বলেছিল—

ওসব বাজে কথা। ও পড়তে হবে না।

অবশ্য ছাত্রের পিতৃদেবের কানে কথাটা যেতেই পিতৃদেব নিজের অখণ্ড অধিকা এবং সার্বভৌমত্ব হারাবার ভয়ে মাষ্টারকে সেইদিনই বিদায় করেছিল।

ধর্ম! কোন্নগরের বাড়িউলি বৌ তাহলে পরম ধর্মপরায়ণা। তাকেও সে ধমে দীক্ষা দিয়েছিল। চঞ্চল লিখে চলেছে। তীব্র মাদকতাময় একটি অনুভূতি তা সারা দেহমনে। নিজের অন্তরের সুপ্ত পশুত্বকেই জাগিয়ে তোলার দুর্বার আনন্দ যেন তার লেখার মূল উৎস, রাতের অন্ধকারে একটা হিংস্র লালসা নিয়ে সরীসৃ তার কুণ্ডলী ছেড়ে মাথা তুলছে। এই হীন স্বরূপটাকে চেনে না চঞ্চল।

তবু এই নীচ পৈশাচিক স্বভাবটা তার বুক ঠেলে ওঠে, সব বাঁধন ঠেলে খসিে প্রকাশ্যে আসতে চায়।

সশব্দে জানলাটা আছড়ে পড়ে, কালো আকাশ জুড়ে বিজলীর একটা চকিত রেখা বিস্ফারিত করে তোলে অতল অন্ধকারের বুক, কি দুঃসহ যন্ত্রণায় বাতা গুমরে ওঠে, গঙ্গার শূন্য বুকে হাওয়ার সাপট মারে বটে এর ঝুঁটি ধরে, গোঁ গে করছে বন্দী পৃথিবী অব্যক্ত যন্ত্রণায়।

চাপা পড়া সেই জানোয়ারটা যেন বাধা ভেদ করে আজ লাফিয়ে উঠেছে, প্রচণ্ড বিদ্রোহে সে সব কিছু তছনছ করে দেবে।

বদ্ধ দরজায় কে আঘাত করছে। চঞ্চলের খেয়াল হয়—দরজাটা খুলে দিতেই চমকে ওঠে, সামনের আলোটাও নিভে গেছে, অতল অন্ধকারে বৃষ্টি নেমেছে বৃষ্টিতে নেয়ে উঠেছে করুণা, দুচোখে কি দুর্বার উত্তেজনা। হাঁপাচ্ছে সে। সারাট পথ যেন ছুটতে ছুটতে এসেছে কি ভয়ে, এখানে এসে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁচেছে মাথার চুল দিয়ে জল ঝরছে, জামাটা ভিজে ওর নরম সুডোল দেহে চেপে বসেছে করুণার শাড়ীর আবরণে এত সঞ্চয় ছিল তা সহসা এই দুর্যোগের মাঝে একটা নির্মম দস্যু আবিষ্কার করেছে, তার অতলের জেগে ওঠা জানোয়ারটা আজ সব দ্বিধা সংশয় ঝেড়ে ফেলে ওকে কাছে টেনে নেয়, নিবিড় নিষ্পেষণে তাকে পিষে ফেলবে।

করুণার অবচেতন মনের সেই সহজাত চাঞ্চল্য—তার অলক্ষে কামনার রক্ত নেশায় পরিণত হয়েছিল, আজ সেও যেন এই মুহূর্তটার স্বপ্ন দেখেছিল তার বিকৃত স্বাধীন সত্ত্বা।

তাই বিনা দ্বিধায় সে চঞ্চলের সেই দুর্বার লোভের শিকার করে তুলে নিজেকে বলে মনে করে।

ঝড়ের মাতন তখনও চলেছে ; বাতাসের ঝাপটানিতে বাইরের ওভারহেড বিজলীর দুটো আবার সচল হয়ে ওঠে, আলোটা অন্ধকারের বুকে একটা কঠিন শাসনের ব চাহনিতে জ্বলে ওঠে।

করুণা আর চঞ্চল চমকে ওঠে। কোথায় বাজ পড়ল। সারা আকাশ বাতাস পে ওঠে প্রচণ্ড সেই শব্দে। তারই এক ঝলক আলোয় দেখে চঞ্চল দরজার সামনে ড়য়ে আছে সমীর।

জলে ভিজে গেছে, তবু ভিজে চোখ দুটো তার নির্মম কাঠিন্যে জ্বলছে, ের রেখাটা কঠিন হয়ে উঠেছে। ওদের দিকে চেয়ে থাকে। সরে গেল করুণা। মনের সেই নির্লজ্জ কামনাটা ক্রমশঃ কঠিন ঘৃণায় পরিবর্তিত হয়। উত্তেজনার বেগে হাঁপাচ্ছে সে, কাপড় চোপড় ঠিক করে নেবার চেষ্টা করে, জামাটা ছিঁড়ে হ। সমীর ওই মেয়েটার দিকে চেয়ে থাকে, মনে হয় ওরা দুজনেই যেন মানুষ । চঞ্চল আর করুণা, দুটো ক্ষ্যাপা রাস্তার কুকুর।

করুণা এমন ছিল না, তার মনে সে দেখেছিল শান্ত একটি মাধুর্য, দুচোখে ছিল ট স্বপ্নের আবেশ। সেই শান্ত মেয়েটিকে আজ কি নেশায় উন্মাদ করে তুলেছে া। করুণাও তার সবকিছু ভুলে গেছে।

করুণা বলে ওঠে।

এখানে কেন এসেছো ?

সমীর অনেক কিছুই বলতে চেয়েছিল, ভেবেছিল করুণা তার ভুল বুঝতে বে। কিন্তু করুণার কথায় সেই আপশোসের কোন রেশই নেই, বরং ফুটে ছে জ্বালা আর ঘৃণা।

সমীর ওর কথার জবাব দিতেও ঘৃণা বোধ করে। রাগ হয় ওদের ওপর, চঞ্চলের র নিজের অক্ষমতার জন্যই। তার ঘর বাঁধার, একজনকে ভালবাসার কোন সাধ্য ক্ষমতা নেই। তাই করুণা এমনি কঠিন আঘাত দিতে সাহসী হয়েছে। া ও তাকে আগে এ নিয়ে অনেক ঠাট্টা করেছে।

করুণা তীক্ষ্ন স্বরে বলে,

—লজ্জা করে না সং-এর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে ?

চঞ্চল হাসছে, ওর হাসিটা অন্ধকারে হায়নার হাসির মতো কঠিন নৃশংস বলে হয়। সমীর জবাব দেয়।

—দেখলাম কত নীচে নামতে পারো ?

—সেটা দেখা শেষ হয়েছে ? তাহলে এখন এসো। আর ভবিষ্যতে স্বর্গের তা তুমি, নরকের কীটদের সংস্পর্শ না রাখলেই ভালো করবে। সমীর ব দেয়।

—কিন্তু তারা যখন আমার ঘরের মাঝে এসে পড়ে তখন যে না দেখে উ
থাকে না। তাই বলছিলাম—এ ঝড় চিরকাল থাকবে না ; ঝড়োপাতার
উড়ো স্বর্গে উঠতে পারবে না কোনোদিনই, মাটিতেই এসে পড়তে হবে।

সেদিন দুঃখ আর পরিতাপের সীমা থাকবে না করুণা। সমীর আর
বলল না। অন্ধকারে তার দীর্ঘ মূর্তিটা হারিয়ে গেল। অন্ধকারে গঙ্গার
তাণ্ডব চলেছে, ঢেউগুলো ফাটছে তীরে এসে নিষ্ফল আঘাত করে বার
কোথায় মাটির একটা চাপ্‌ড়া ধ্বসে পড়ল ওই জলের বুকে।

সমীরের মনে হয় তার জীবনের সব শ্যামল সবুজ মৃত্তিকা অমনি অতল ধ্ব
মাঝে ঝরে ধ্বসে পড়ছে। সে পায় নি কিছুই। জীবনের সব দুঃখ কষ্টের
তার কর্তব্য পালন করে চলেছে সে। দিনান্ত পরিশ্রমের অর্জিত সামান্য অ
বাবা ভাইবোনদের বাঁচিয়ে রেখেছে। নিজের ঘর বাঁধার কোন পথই পা
একজনকে কেন্দ্র করে তার জীবনকে সুন্দর করে তুলতে চেয়েছিল, অনেক ক
করেছিল। কিন্তু !···সব তার হারিয়ে গেল।

আজ করুণার চোখে দেখেছে সে কি অন্ধ নেশার উন্মাদনা। মত্ততা সর্ব
সেই ধ্বংসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সমীর। নিজের অসহায়তার জন্য আ
বেদনা বোধ করে। মনটা কেমন বিশ্রী হয়ে ওঠে।

আনমনে জনহীন রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যায়। তাদের বাড়ির দিকটাও অন্ধ
হয়ে গেছে। বিজলীর তারের উপর কোথায় গাছের ডাল পড়েছে। চারি
সেই সর্বনাশা ঝড়ের ধ্বংসচিহ্ন, ভাঙ্গা রাস্তায় জল বয়ে চলেছে।

বাড়িতে হ্যারিকেনই জ্বলে। বিজলী নেবার মতো সামর্থ্য নেই।
বাড়িটার চারিদিকে বেদনার তমশা ঘিরে রয়েছে। বাড়িতে পা দিয়েই থমকে দ
সমীর।

সুষমাও এসে পড়বে এমনি দিনে তা ভাবে নি।

এ নিয়ে বাড়ীতে বেশ নাটক খানিকটা জমে উঠেছে। কল্যাণীর সামনে
কোন পথ নেই। সমীরের রোজকার বাড়ে নি, বেড়েছে সংসারের খরচ।
প্রাণীর তবু কোনমতে চলছিল এতদিন, কিন্তু এবার একবেলা চলাই দায়
উঠেছে। তার উপর রুগ্ন স্বামীর খরচ আছে, সব দিক থেকে ওরা অতল
ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে চলেছে, যার গর্ভে অপেক্ষা করছে তাদের জন্য নিশ্চিত মৃ

তারই মাঝে আর একজনকে এসে পড়তে দেখে কল্যাণী দিকবিদিক্
হারিয়েছে।

সুষমা আর ওবাড়িতে গোপালকে স্বামী হিসাবে মেনে নিয়ে থাকতে পারে নি
দিন দিন তার অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে ওঠে! রাতের অন্ধকারে
জানোয়ারটা মদ্যপ অবস্থায় তাকে নির্দয়ভাবে বিনা কারণে প্রহার করে, নি
মান সম্মান সব কিছু হারিয়ে মাত্র দুমুঠো অন্নের জন্য। সুষমা ওখানে থা

চায় নি। তাই সব ছেড়েই চলে এসেছে। কল্যাণী মেয়ের এই যুক্তি মানতে
া নয়। নিজের স্বামীর ঘর ছেড়ে কোন মেয়ে রাতের অন্ধকারে
য়ে আসবে, তাকে ত্যাগ করার কথা ভাবলে এটা কল্যাণীর কাছে ঘোরতর পাপ।
বলে কল্যাণী।

—এটুকু সইতেই হয় সুষমা।

সুষমার দেহ মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। এই পথ সে নিয়েছে অনেক
চিন্তেই, গোপালকেও সেই কথা শুনিয়ে এসেছে, সুষমা জবাব দেয়।

—অনেক সয়েছি ক'বছরে, আর সইবো না। মিথ্যা ঘৃণা একটা পরিচয় আঁকড়ে
আর থাকবো না।

কল্যাণী জবাব দেয়।

—তাহলে জাহান্নামেই যাও, এ বাড়িতে ঠাঁই হবে না। নিজেদের অভাব
তাটাকে জানাতে পারে না, সেটাকে নীতির এবং ধর্মের দোহাই দিতে ঢাকতে
কল্যাণী। বলে,

—স্বামীর ঘর ছেড়ে যে মেয়ে রাতের অন্ধকারে চলে আসে, স্বামীকে ছোড়ছাড়
দোব বলে, তেমন মেয়ের ঠাঁই আমার ঘরে হবে।

—মা! সুষমা আর্তনাদ করে ওঠে।

প্রতিমাও দিদির দিকে চেয়ে থাকে, তার মন নীরব বেদনায় ভরে ওঠে। সেও
কি বলতে চায়, অসুস্থ হরিপদবাবুও উঠে এসেছেন বিছানা থেকে। আর্তকণ্ঠে
ন তিনি,

—কি বলছ সুষির মা? তোমার মেয়ে—

কল্যাণী কঠিন কণ্ঠে ঘোষণা করে।

—ও আমার কেউ নয়। এ বাড়িতে যেন কোনদিন পা আর না দেয়।
ন্নামে যাক ও! জানবো একটা মেয়ে আমার ছিল না, নেই!

ুষমা অপমানে বেদনায় কাঁদছিল, অনেক আশা নিয়েই এসেছিল সে এখানে,
ঠাঁই পাবে, নিজেকে আবার নোতুন করে গড়ে নিতে পারবে। কিন্তু এখানে
ঠাঁই হবে না এটা বেশ জেনেছে সে।

তাই মনে মনে কঠিন হয়ে ওঠে। আকাশের মত্ততা তখন কিছুটা থেমেছে,
বর্ণের আকাশে কোথাও একটা তারার নিশানা নেই, শুধু থোক থোক বিজলীর
প্রদীপ্ত রেখায় আকাশের বুকে কি বিভীষিকাময় নিষ্ঠুর কাব্য রচনা করে।

ুষমা বের হয়ে এল।

প্রতিমা বাধা দিতে যায়,—দিদি।

কল্যাণী কঠিন কণ্ঠে বলে—যাক্ ও। জাহান্নামে যাক্! এত তেজ! দূর
আপদ্।

মায়ের দিকে চেয়ে থাকে প্রতিমা। কঠিন হিংস্র একটা মূর্তি! সমীর বাড়িতে

পা দিয়েছে, কল্যাণী তখনও থামে নি। অভাবের জ্বালায়—অর্দ্ধাহারে তার ম
সব শ্যামস্নিগ্ধতা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, এককালে ছিল ওর বুকজোড়া
ভালবাসা, দেহমনে ছিল শান্ত মাধুর্য আর শ্রী। আজ সেই ফুলে ফলে ভরা স
গাছটা কোন বজ্রাঘাতে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে আছে মাত্র কাণ্ডটা, পত্র
ন্যাড়া মরা ডালগুলো নিষ্ঠুর ধ্বংসের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় বার বার।

সারা বাড়িটাকে ঘিরে অব্যক্ত বেদনা-চাপা গোঙানির মতো একটা স্তব্ধ আর্ত
উঠছে। সমীরকে দেখে প্রতিমাই এগিয়ে আসে।

—দাদা!

সমীর ওর দিকে চাইল। সমীরের বোধহয় প্রতিমা তাঁকে তার একটা সর্ব
অনুকম্পই জানাবে। কিন্তু ওরা সবাই মনে মনে নিজের যন্ত্রণায় জ্ব
একজন অন্যজনের অন্তরের দিকে চাইতেও ভুলে গেছে বলে ওঠে প্রতিমা।

—দিদি শ্বশুরবাড়ির থেকে চলে এসেছিল টিকতে পারে নি সেখানে, মা ত
এ বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। অন্ধকারে কোথায় চলে গেল।

সমীর নির্বাক মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে তার খেয়াল
কথাটা। এতক্ষণ কি নিষ্ঠুর উন্মাদনার ঘোরে তাকে এবাড়ি থেকে কুকুরের ম
তাড়িয়ে দিয়েছে মা হয়ে! একটা বেদনার জ্বালা মনের সব কাঠিন্যকে ধীরে ধ
গলিয়ে দেয়! কল্যাণী আবার যেন স্বাভাবিক হয়ে আসে।

ধীর কণ্ঠে বলে—একবার দেখ সমীর, কোথায় গেল সে।

সমীরের চীৎকার করে প্রতিবাদ জানাতে ইচ্ছে করে। নিজের সব কিছু
তার হারিয়ে গেছে। তার দিনান্ত পরিশ্রম করাই বৃথা হয়ে গেছে। এতগ
বুভুক্ষু প্রাণীর বোঝাই টেনেছে সে। কেন তা জানে না। তবু চীৎকার ক
পারল না।

ক্লান্ত দেহটা নিয়ে ওই বৃষ্টির মধ্যে বের হল। তার মনেও বোধহয় ত
কর্তব্য দয়ামায়াটা রয়ে গেছে। মনে হয় এছাড়া তার করণীয় আর কিছু নেই।

···তখনও বৃষ্টি থামে নি। নির্জন পথ, মাঝে মাঝে হাওয়ার সাপট ল
গঙ্গার ঘাটেও এসেছিল, পারঘাটার খেয়া বন্ধ। রাত হয়ে গেছে, ঝড়ের রাত্রি
পারাপার করবে এই দুর্যোগে! হতাশ হয়ে ফিরে যায় সমীর।

ঠাণ্ডায় সারা হাত পা জমে আসছে। কি ভেবে স্টেশনে এসে উঠল সমী
অর্থহীন এই ঘোরা, শুধু একটা ছায়ামূর্তি যেন নিছক কি আবেগ ভরে ঘ
বেড়াচ্ছে অন্ধকার ঝড়ো পৃথিবীর পথে, সব তার হারিয়ে গেছে। ভালবাসা,
সবকিছু, সমীরও ঘুরেছে অন্ধকারে। সুষমার কোন সন্ধান পায় নি।

এমনি অন্ধকারে বের হয়েছে চঞ্চল। সমীরের সেই ঝড়ের মতো আসা
চলে যাবার পর করুণা কি ভেবে বের হয়ে গেছে। চঞ্চলের চোখের সামনে সমী
দুটো চোখ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাতে দেখেছে সে পুঞ্জীভূত জ্বালা আর ঘৃণা।

চঞ্চলের মনে হয় একটা অন্যায়ই করেছে সে, সমীরের জীবনে একটা প্রচণ্ড আঘাতের উপলক্ষ্য হয়ে উঠেছে সে। বৃষ্টির ঝাপ্টা এসে তার মুখে হানে তীরের ফলার মতো বিঁধছে। ঠাণ্ডা কন্‌কনে জলো হাওয়ায় হাড় কাঁপিয়ে তোলে।

পারঘাটের আলোটা মিট মিট করে জ্বলছে, কদম বোধহয় ঘুমোয় নি। আজ চঞ্চলের মদ খেতেও ইচ্ছা করে না। মনে হয় জীবনে সে একটার পর একটা ভুল করে চলেছে। কোন অতল স্রোতের আবর্তে সে ভেসেই চলেছে লক্ষ্যভ্রষ্টের মতো। কোন নিশানা নেই।

কদমকে বের হয়ে আসতে দেখে ওর দিকে চাইল সে।

--বাবু যে গো?

চঞ্চল জবাব দিল না। কদম জানে এখানে সহরের অনেকেই রাতের অন্ধকারে আসে। কিন্তু একে তেমন ঠিক ভাবতে পারে না। তাই ওকে দেখে বলে—খেয়া তো বন্ধ এখন।

—চঞ্চল জবাব দেয়, যাবার ঠাঁই বা কোথায় বলো?

—ঘর থাকলে মানুষের মন এমনি যাই যাই করে না? বুঝলে, হাসছে কদম। মিষ্টি একটা হাসি। কদম জানে ওর কথা। চঞ্চলের মনে ওর কথাগুলো অন্য সুরে ফুটে ওঠে। ঘর। একজনকে নিঃশেষে ভালবেসে শান্তি পাবার ভাগ্য বোধহয় তার নেই। তাই পথে পথেই এমনি অন্বেষণ। কারা ছিল—সবাই হারিয়ে গেছে।

কদম বলে—বড় জ্বালা গো, এমনি করে শূন্যি থাকার বড় জ্বালা। ওটা বোধহয় ওর অন্তরের কথা। বলে চলেছে কদম।

—চারিদিকে তাই দেখবে শুধু ঘেয়ো কুকুরের দল শোঁক শোঁক করে ঘুরছে। মানুষের মতো বাঁচতে তোমাকে দেবে না।

চঞ্চলের মনে হয় কথাটা সত্যি। জীবনে একটা অপরিসীম শূন্যতার জ্বালাই তার সংবেদনশীল মনে ঝড় তুলেছে। কেবল পাঁকেই জড়িয়েছে সে, সুস্থ সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে নি। চোখের সামনে ফুটে উঠেছে কেবল বিশ্বজোড়া সেই জঙ্গালের ছবিটা—মানুষের নীচতার অন্ধকারময় রূপ। কদম ওর মুখের সেই চিন্তাক্লিষ্ট বেদনাকে দেখেছে। বলে ওঠে আজতো মদ খাও নি?

চঞ্চল জবাব দিল না। তার মনের বেদনাটা ওই নারীর সন্ধানী দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠেছে। কদম বলে।

—জ্বালাটাকে ভোলার জন্যই মদ খাও তা জানি, ওতে কি কমে গো, কেউ চাপা থাকে, ছাড়া পেলেই হু হু করে মন।

চঞ্চল সরে এল। বৃষ্টির ফিন্‌ফিনানি আবার শুরু হয়েছে। বাতাসে ওঠে ফুলে ওঠা বানডাকা গঙ্গার ক্রুদ্ধ গর্জন। তারাগুলোও সব হারিয়ে গেছে, চারিদিকে শুধু অন্ধকার। সে এমনি অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেছে একা? ঘরের ঠিকানা নেই, পথের নিশানা নেই।

অন্ধকারে ছায়ামূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে।

—কে!

দূরে শ্মশানের দিকে একটা জ্বলন্ত চিতার লালাভ আলোর একটু ছোঁয়া লেগেছে ওর মুখে। কান্না ভিজে কঠিন একটা মুখ দুচোখের চাহনি বেদনা—হতাশা।

সুষমা দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি থেকে চলে এসেছে সে। ফেরার ঠাঁই নেই, স্বামীর ঘরের ঠিকানাও হারিয়ে গেছে, নিজের হাতে সেই নিষ্ঠুর অতীতকে সে ধ্বংস করে দিয়ে এসেছে। কোথাও কোন আশ্রয় নেই। মানুষের উপর এসেছে ঘৃণা হতাশা, সব ভালবাসা তার ওই অতল তমসায় হারিয়ে গেছে।

চঞ্চলকে এখানে এসময় দেখবে কল্পনা করে নি।

দুজনেই এমনি মৃত্যু আর নিষ্ঠুর ভাঙ্গনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, আশাহারা—পথহারা দুটি মানুষ।

—আজ আমার ঠাঁই কোথাও নেই, স্বামীর সব পরিচয় আমি ফেলে এসেছি চঞ্চল, তিলে তিলে সেই অপমৃত্যুকে সইতে পারলাম না, বাড়িতেও ঠাঁই হ'ল না। স্বামীত্যাগী মেয়ে নাকি পাপী, তাকে ঘরে ঠাঁই দিলে অকল্যাণ হবে। তাই ভাবছিলাম সব শান্তির সন্ধান করবো ওই গঙ্গার অতলে, ও নাকি পুণ্য তোয়া, জেনে শুনেই আমি নিজেকে শেষ করে গেলাম—কোন পথ না পেয়ে, সব আশ্রয় হারিয়ে।

চঞ্চলের মনের সামনে অতীতের সেই স্বপ্ন দেখা দিনগুলো ফুটে ওঠে। আজ সব হারিয়ে সে পথে পথে ঘুরছে, নিজের জীবনের অন্তহীন শূন্যতাকে ভুলবার জন্যই। কোন কিছুরই সন্ধান পায় নি।

সুষমা ওর দিকে চাইল ব্যথাভরা চাহনিতে। চঞ্চল জানায়।

—বাঁচা যায় সুষমা। তুমি নিজেকে এতদিন ঠকিয়েছো, আমিও ঠকিয়েছি আমাকে। সেদিন যে কথা বলতে পারি নি তার দাম দিয়েছি অনেক জ্বালায়। পাঁকে কেবলই নেমেছি। আজ মনে হয়—তোমাকে সেই কথা বলার দিন এসেছে। আমরা দুজনেই বাঁচতে চাই নোতুন করে।

সুষমা অবাক হয়—কি বলছ তুমি? স্বামী পরিত্যক্ত একটি মেয়েকে নিয়ে ঘর বাঁধবে? সমাজ!

হাসে চঞ্চল—মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করতে পারি নি তাই মদ খেয়েছি—নারী-মাংসের স্বাদ পেয়েছি, তুমিও পারোনি তাই ঘর ছেড়েছো। সব অপবাদ সইবার সামর্থ্য আমাদের আছে, এত সহজে ভেঙে পড়বে না আমাদের ঘর।

সুষমা ওই বেপরোয়া তরুণটির দিকে চাইল। শ্মশানের সেই চিতার আগুন জ্বলছে ওর দুচোখে। সামনে ওই ঝড়ো রাতের উম্মাদ তুফানভরা স্রোতস্বিনী—তারই সামনে অতল অন্ধকারে ঝড়ের গর্জনে দুটি পথহারা নারী পুরুষ নিজেদের কামনার নোতুন স্বর্গ রচনা করেছে।

—চঞ্চল!

সুষমাকে ও নিয়ে চলেছে। সুষমার আজ ভাববার সাধ্যি নেই ; জীবনের কঠিন আঘাতে সে বিভ্রান্ত, তবু মনে হয় তারা বাঁচবে। চারিদিকে এই ঝড়—সামনে অন্তহীন প্রবাহমান কালরূপী গঙ্গার শাশ্বত প্রবাহ—চিতার নিভুনিভু আগুন—সবকিছু ঘিরে ধ্বংস আর মৃত্যুর ছায়া, তারই মাঝে চকিতের জন্য যেন বাঁচার পরম আশ্বাস পেয়েছে সে।

দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে কথাটা সহরে ছড়িয়ে পড়ল। বহুল প্রচলিত পত্রিকায় সেইদিনই বের হয় চঞ্চলের নোতুন লেখা—সেই চালানদারদের জীবনের বেদনা আর অপমানের মধ্যে একটি আশার সুর মেশানো গল্প। এত বিপদেও আগামী দিনের মানুষ পথ হারায় নি। তারা ভালবেসে বেঁচেছে।

...সেই গল্পটার খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে সারা সকালের আলোতেই প্রকাশিত হয় চঞ্চলের জীবনের নবতম কাহিনী। সুষমা আর তাকে জড়িয়ে নানা কুৎসার কথা।

স্টেশনের চায়ের দোকানেও ওপাড়ার কিছু বাঁধা খদ্দের আসে, তারা সকলে বিনা পয়সায় কাগজটা পড়ে—আলাপ আলোচনাটা ওই দুজনকে নিয়ে। স্টেশনারী দোকানদার মদন বলে।

—অমনি দাদা।

চঞ্চল অবশ্য মদনের খদ্দের। এমনকি চঞ্চল বেশ সৌখীন। পাউডার-স্নো-সেণ্ট পেষ্ট এটা-সেটা সে তার কাছ থেকেই নেয়, মাঝে মাঝে গল্পসল্প করে। তাছাড়া মদন এখনকার রাজনীতির একজন সক্রিয় পাণ্ডা। প্রগতিবাদী বলে জাহির করে নিজেকে।

সেদিক থেকে ওই চঞ্চল প্রগতিবাদী, পুরোনো সবকিছুর ওপরই চঞ্চলের প্রতিবাদ। তাই মদন মনে মনে ওকে একটু সমীহ করে। তাছাড়া নাম করা লেখক—তাই তোয়াজও করে মাঝেমিশলে, সেটা অবশ্য পরের কথা। আজকের প্রসঙ্গে তাই মদন চঞ্চলের দোষটাকে মেনে নিতে পারে না। বৃদ্ধ খগেনবাবু চায়ের শেষটুকু চুমুক দিয়ে বেশ আমেজ করে বলে।

—একহাতে কি তালি বাজে মদন ? ছোঁড়াটাও অমনি। নটবর মার্কা বুঝলে ? সহরের মেয়েদের মাঝে তো ওই চঞ্চলকে নিয়ে লুফোলুফি। বুঝলে—এখন তো এমনিতেই ওসব আকছার মেলে কি বল হে নিমু, আমাদের কালে এসব কি মিলতো ?

—দুঃখু হয় নাকি দাদা ?

হাসে খগেনবাবু—কি আর হবে ভায়া ? বলে না—

দেখা হইল নারে শ্যাম,
নোতুন বয়সকালে ?

স্রেফ ওই খান্‌পাড়ার দোর ধরেই দিন কেটে গেল। এসব নেখাপড়া শেখা।

সমীর ডিউটি থেকে ফিরছিল, সকালের দিকে এখানে মাঝে মাঝে এক কাপ চা

খেয়ে যায়, কাল থেকে মন মেজাজ ভালো নেই। বাড়িতে ওই সব ঘটনার পর বের হয়ে গিয়েছিল অনেক রাত্রে ডিউটিতে। সকালে ফিরছে। চায়ের দোকানে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। প্রসঙ্গটা তাদের পরিবারকে নিয়েই।

কাল রাতেই গিয়ে উঠেছে সুষমা চঞ্চলের ওখানে। তারপরই সারা শহর এরই মধ্যে মুখর হয়ে উঠেছে। কাগজে চঞ্চলের আজকের গল্পের চেয়ে মফঃস্বল শহরে ওর এই ঘটনাটা আরও চমক লাগিয়েছে। সমীর কথাটা শুনে চমকে উঠেছে।

মনে হয় সুষমা ইচ্ছে করেই তাদের এমনি অপমান করতে চেয়েছে, আর ওই চঞ্চলও প্রশ্রয় দিয়েছে তাকে।

সমীরের মনে হয় তারা সারা মনে একটা কঠিন জৈবিক উন্মাদনা ফুটে উঠছে। চঞ্চলই বার বার তাকে আঘাত দিয়ে চলেছে, ওর অতলের সেই ক্ষেপে ওঠা জানোয়ারটা সমীরের সব সম্মান শেষ করে দিতে চায়, সব আশাকে ব্যর্থ করে দেবে বার বার।

চা খাওয়া হ'ল না। ওদের রসাল বিশ্রী কথাগুলো কানে আসে। বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে।

কল্যাণীর কানেও উঠেছে কথাটা।

সুষমা কাল রাত্রে বের হয়ে গেছে এখান থেকে। মায়ের মন তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল অনেক বেদনায়, তারপর মনে ভয় হয়েছে কে জানে যদি আত্মহত্যাই করে! নিজের মেয়েকে সে চেনে, ভয়ানক জেদী মেয়ে।

তবু মরে নি সুষমা, বেঁচে আছে, হয়তো রাগ পড়লেই আবার বাড়ি ফিরে আসবে আজ।

সমীরকে দেখে মা এগিয়ে আসে। খুশিভরা স্বরেই বলে,

—সুষমা চঞ্চলের ওখানে আছে।

সমীর মায়ের দিকে চাইল। মাকে খুশি আর নিশ্চিন্ত হতে দেখে সমীর মনে মনে অবাক হয়, আরও রেগে ওঠে। সেটা তার কথায় ফুটে ওঠে।

—বেশ খুশী হয়েছো দেখছি! এর চেয়ে আমার মনে হয় ওর মরাই ছিল ভালো, তবু মুখ দেখাতে পারতাম। সারা শহরের চায়ের দোকানে পথেঘাটে কান পাতা দায়। কি বলে ওরা শুনেছো? গোপাল এলে তাকেই বা কি জবাব দেবো?

মা চমকে ওঠে কথাটা শুনে।

সমীর বলে ওঠে—

—ওকে বলে দিও, এ বাড়িতে যেন না আসে। এতদিনে বুঝছি গোপালের কোন দোষ নেই, দোষ তোমার মেয়ের আর ওই হতচ্ছাড়া, চঞ্চলের, কথাটা তাকেই জিজ্ঞাসা করবো আমি। একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক।

গোপালজামাই-এর নেশা ছুটতে সেও এসেছে। গঙ্গার পারঘাটাতেই শুনেছে

কথাটা। কদম ঘাটওয়ালিই তাদের ওই মিলনরাতের সাক্ষী। সহরেও দু'একজন গোপালের দিকে চেয়ে মুচকি হেসেছে মাত্র। গোপালের মনে হয় ওরা তাকে ব্যঙ্গ করছে।

রেগে ওঠে সে, তার সুপ্ত পৌরুষ আর স্বামীত্বের দাবী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাই সমীর—মায় কল্যাণীকে নিয়ে ওরা হানা দিয়েছে চঞ্চলের ওখানে।

ইতিমধ্যে কৌতূহলী জনতাও সেখানে জুটেছে। গোরাচাঁদও চাল-চালানোর সহকারীদের নিয়ে ষ্টেশন থেকে গিয়ে জমেছে সেখানে। বেশ একটা কাণ্ডই বাঁধবে আর কি! বেউশ্যে পাড়ার মেয়েরাও শুনেছে। রোদাপিঠ করে পাশের দোকান থেকে চা নিয়ে গেলাসে চুমুক দিতে দিতে তারা বলে।

—ভদ্দরলোক! ঝাঁটা মার মুখে। এতই যদি খিদে তবে ডুবে ডুবে জল খাওয়া কেন?

কমবয়সী একটা মেয়ে হাসতে হাসতে বলে।

—আমরাই অসতী বুউলা গো দিদি। বাকী সবাই সতী।

গোরাচাঁদ ইতিমধ্যে মহড়া নিয়েছে চঞ্চলের আস্তানার ওখানে। শীর্ণ প্যাকাটির মতো দেহ, পরণে একটা পাৎলুন আর লাল তোয়ালের গেঞ্জি গায়ে, টিকটিকে গলার একটা চিত্তির আঁকা রুমাল গিঁটবাধা রয়েছে। গোরাই খবর দেয়।

দেখলাম চঞ্চলদা, শ্লা জামাইটা এসেছে, আর সমীরদা তো ফায়ার। দলবল নিয়ে নাকি আসছে শুনে এলাম। বেশী ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করলে জামাই ফামাই মানবো না—দোব ঘুসি ওর থ্যাবড়া নাকে—হেভি ব্লিডিং হয়ে যাবে। শ্লা গোরাচাঁদকে চেনে নি।

সুষমা ভাবতে পারে নি তার উপর এখনও দাবী জানাতে আসবে সেই দানবটা। আজ পিছনের সব পরিচয় মুছে ফেলেছে সে। একরাতে তার অতীতের সব ঘটনাকে ভুলে গেছে। লজ্জা! আজ লজ্জা তার নেই, কোন অপরাধও নেই। কেউ তাকে ঠাঁই দেয় নি, সুস্থ জীবনের সন্ধান দেয় নি।

চঞ্চলের মাঝেও নীরব একটা কাঠিন্য জেগে উঠেছে। সেও আজ সব বাধা—বিপত্তির মাঝে নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

সমীর গোপালজামাই আরও কয়েকজনকে আসতে দেখে বের হয়ে এল সে। সুষমাই বাধা দেয়।

—কোন কথা বলবে না তুমি। যা বলতে হয় আমিই বলবো। দীপ্ত ফণাতোলা সাপের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সুষমা, চঞ্চল নারীর এই বিচিত্র রূপ আগে দেখে নি। আজ মনে হয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ওরাই মাথা তুলে প্রতিবাদ করতে পারে। ঠোঁট দুটো ফুলে উঠেছে, ডাগর সুন্দর চোখ দুটোয় কি কাঠিন্য—ফর্সা রং টকটকে হয়ে উঠেছে। মাথার একরাশ চুলে লেগেছে এলোমেলো বাতাস। গোপাল ওকে দেখেই গর্জন করে ওঠে।

—এই যে বেশতো নাগরের এখানে এসে জুটেছো—বলি গঙ্গায় কি জল ছিল না – না দড়ি কলসী কেনার পয়সা জোটে নি ? চলো এইবার থানায় ?

সুষমা কঠিনকণ্ঠে জবাব দেয়।

—থানায় ডায়েরী আগে থাকতেই করে এসেছি। মাতাল, ব্যাভিচারী, লম্পট লোকের ঘর আমি করবো না, তাকে আমি চিনি না। স্বামী! কাল তবে কেন খাবারে বিষ দিয়েছিলে? হাতে মেরে গলা টিপে শেষ করতে না পেরে বিষ দিইছিলে—সেটাও থানায় জমা করে এসেছি। আবার এসেছো এখানে ?

সমীরকে দেখে বলে ওঠে সুষমা।

—তুমিও এর মধ্যে থেকো না বড়দা? মরতে আমি পারি নি। তাই আবার বাঁচার জন্যই চেষ্টা করছি। ওই শয়তানের হয়ে কোন কথা তুমি বলো না।

গোপাল গর্জে ওঠে, লাফ দিয়ে ওর চুলে মুঠি ধরতে যায়। বাধা দেয় চঞ্চল,—গায়ে হাত দেবেন না।

—মাইরী! গোপাল গর্জন করে ওঠে। চঞ্চলকেই মারতে যায়। মাঝপথে গোরাচাঁদ এসে দাঁড়ায়। তার চোখ দুটো জ্বলছে। বলে ওঠে সে—এগোবেন না স্যার, এইবার কিন্তু 'বাষ্ট' করবো। দুখানি ঝাড় খেলেই কিলিন্ আউট হয়ে যাবেন। থাপ্‌ড় বসিয়ে দোব মাইরী।

গোপাল থতমত খেয়ে যায় ওকে দেখে। চঞ্চলই বাধা দেয় গোরাচাঁদ। গোরা গজ গজ করে।

—ভদ্দরলোক! জেনট্যালম্যান্। সোয়ামি। একটা লাগাতাই গপ্পো লিখো চঞ্চলদা ওই মালকে নিয়ে। জমবে ভালো।

গোরা সরে দাঁড়াল, গোপাল তখনও চীৎকার করছে।

—আবার গুণ্ডা আনা হয়েছে? আমার কি পয়সা নেই? একশো গুণ্ডা নিয়ে আসবো, পুলিশে যাবো।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসেন সদানন্দবাবু। তিনিও ব্যাপারটা শুনেছেন, সমীরের নাম জড়িত দেখে তিনিও এসেছেন। ওকে এগিয়ে আসতে দেখে সকলেই অবাক হয়। সমীরও অস্ফুট আর্তনদে করে ওঠে।

—মাস্টার মশাই!

হ্যাঁ! এর একটা সম্মানজনক মীমাংসা হওয়া ভালো সমীর। সুষমাও বড় হয়েছে, তার উপর অত্যাচারের কথাও শুনেছি। গোপাল গর্জে ওঠে—আপনি থামুন দিকি মশাই, নিজের ওয়াইফের গায়ে হাত তুলবো না বদ দোষের জন্য শাসন করবো না ?

সুষমা স্পষ্ট কথার বলে।

—আমি সব সম্পর্ক ছেড়ে এসেছি। এইখানেই থাকবো।

চঞ্চল আজ নিজেকে তৈরী করেছে। তার মনে মিষ্টি একটা সুরের রেশ। স্পষ্ট সতেজ কণ্ঠে জানায় সে।

—আমরা স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ই গড়ে তুলবো।

সুষমা আজ নিশ্চিন্ত হয়, যেখানে কোন শান্তি নেই, চিরন্তন দুঃখ অপমান আর লাচনাকে নিয়ে সেখানে জীবনভর আপোষ করে বেঁচে থাকতে পারবে না সে। তার চেয়ে আবার নোতুন জীবন শুরু করবে।

সমীর কোন কথাই বলে নি। তার অন্তরের জ্বালা আর অপমানটা তীব্রতর হয়ে ওঠে। গোপালকে দায়ী করে সে মনে মনে এই সর্বনাশের জন্য। গোপাল অবশ্য তখন নিজমূর্তি ধরেছে। তারস্বরে ঘোষণা করে—এই জঘন্য কাজে নাকি সমীরদেরও সায় ছিল। তারাই এতবড় অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছে ওই বকাটে ছোঁড়াটার কাঁচা পয়সার লোভে।

স্তব্ধ হয়ে এসেছে ওদের কোলাহল। জনতাও সরে গেছে।

গোপাল গর্জাতে গর্জাতে বের হয়ে গেছে, নীরব দর্শকের মতো এখান থেকে চলে গেছে সমীর।

চঞ্চল আজ অবাক হয়েছে সদানন্দবাবুকে এখানে আসতে দেখে, প্রথমে ঠিক চেনেনি ওই লোকটিকে। সদানন্দবাবু বলেন সুষমাকে।

বিয়ে-থা করে যদি সুখী হতে পারো তবে এটাকে সমর্থন করি।

সুষমা ওই বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থাকে। দেখেছে ওকে স্কুলে—রাস্তায়। এখানের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ও। অজে সুষমা কান্নাভিজে স্বরে আবেদন জানায়।

—তাই আশীর্বাদ করুন আপনি, অন্যায়ের অসহ্য জ্বালায় সব ছেড়ে এসেছি, এখানে এসে যেন মানুষের পরিচয়ে আবার বাঁচতে পারি। সকলেই নিন্দা করবে —কিন্তু এ ছাড়া আমার পথ ছিল না।

সদানন্দবাবু হাসেন।

—নিন্দার কাজও অনেক সময় করতে হয় মা। এযুগে মানুষ অনেক ভুল করে —একালের জ্বালা যে অনেক। তবু মানুষের কর্তব্য তার সবার উপর।

চঞ্চল অবাক হয়—আপনি এই কথা বলছেন?

—হ্যাঁ চঞ্চল। অনেক ভুলের মধ্যেও যদি আজ ঠিক পথ পাও সব ভুল তোমার শুধরে যাবে। নিজেকে খুঁজে পাবে। এই কামনা করেই আমি তোমার এই শুভ প্রয়াসকে স্বীকৃতি দিতে এসেছি। তোমরা সুখী হও।

সদানন্দবাবুকে ঠিক যেন চিনতে পারে না চঞ্চল। তবু মানুষটিকে সে শ্রদ্ধা করে। হঠাৎ চঞ্চলের মনে হয় তার কাছে এই দুনিয়ার রূপ যেন বদলে গেছে—সে মানুষকে নোতুন চোকে দেখে। ভালবাসা প্রীতি আর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে। আজ হঠাৎ প্রণাম করে বসে সদানন্দবাবুকে।

—আরে, আরে! সদানন্দবাবু অবাক হন।

কথাটা গভীরভাবে ভাবতে চেষ্টা করেছে সমীর।

নিজের দোষ—তাদের পরিবারের দীনহীন—অবস্থা—এমনকি আজকের দিনের মানুষের জীবনযন্ত্রণা অবধি। নিজের মনকেও বার বার প্রশ্ন করেছে। পাটকলের চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছিল, সেদিন সংসারের সব বোঝা এসে তার ঘাড়ে চেপেছিল। বাবা অথর্ব। ছোট ভাই বোনরা - মা-বাবা তাদের বাঁচাতে হবে, তাই সামনে আর কোন পথ না পেয়ে সমীর এই পথটাকেই নিয়েছিল। জীবনে অনেক আশা ভবিষ্যৎ তার ছিল। ছাত্র হিসেবে বেশ কৃতিই ছিল সে। সদানন্দবাবুরও অনেক আশা ভরসা ছিল তার উপর।

কিন্তু সবাইকে হতাশ করে সমীর এই পাটকলেই চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছিল। তবু সদানন্দবাবু বলেন।

—একটি অন্তরকে মানবিক কর্তব্যে সার্থক করে তোলো সমীর সেইটাই তবে বড় কথা। তুমি মানুষ—তোমার বিবেক নীতি বোধ আছে পরের জন্য সব ত্যাগ করেছো এইটাই তোমার সার্থকতা। জানো ইংরাজীতে একটা কথা আছে— **salvation of a man's soul is more than preparing 'Magnea Carta' of the hundred worlds'.** সমীর তবু পড়াশোনার অভ্যাসটা ছাড়ে নি। বিশ্বসাহিত্য পড়েছে লাইব্রেরী থেকে শুধু বইই আনে, দেখেছে নিজের চারিপাশের বিচিত্র জীবনকে—ভাঙ্গা-গড়ার মাঝে মানুষের জীবনকে। তার জীবনকে ঘিরেও এমনি নাটক গড়ে উঠবে স্বপ্নেও ভাবে নি।

তবু এই ভাঙ্গনকে মেনে নেবার চেষ্টা করেছে। সুষমার বিয়েটাকে সমর্থন করেছে মনে মনে। সে সুখী হয়েছে—চঞ্চলও এখন অনেক বদলেছে।

তবু কোথায় যেন বাধে সমীরের। এটা বোধহয় তার কমপ্লেক্স। এড়িয়েই চলে ওদের। সবাইকে কেমন এড়িয়ে চলে সে। মুখ বুজে কাজ করে, মনে হয় তবু তার জীবনে কোথায় একটা ক্ষয় এসেছে।

সেদিন কারখানা থেকে ফিরছে। রবিবারের সকাল। সকলেরই ছুটির দিন। সহরের পথে বের হয়েছে আজকের আলগা মানুষগুলো। থলি হাতে বাজারের দিকে চলেছে। ষ্টেশনের দিকে চলেছে সমীর কাগজখানা নিয়ে বাড়ি ফিরবে। রেলকলোণীর বাড়িগুলোর এখানে একটু ফাঁকা—খোলামেলা। মেহগিনী-দেওদার গাছগুলোকে রাঙ্গিয়ে দিয়েছে সকালের মিষ্টি রোদ, পাখীগুলো তখনও কলরব করছে। হঠাৎ করুণাকে দেখে দাঁড়াল। অনেকদিন দেখে নি তাকে সমীর, সেই ঝড়ের রাতের অন্ধকারে তাকে দেখেছিল চঞ্চলের ওখানে। সেরাত্রে সেখানে না গেলেই ভালো করতো সমীর। করুণা সেদিন তাকে ক্ষমা করে নি।

তার মনের অতলের নোংরা রূপটাকে দেখে শিউরে উঠেছিল সমীর দুঃসহ ঘৃণায় আর লজ্জায়। নিজের ক্ষতির চেয়ে করুণার অধঃপতনে সে বেশী বেদনা পেয়েছিল।

ওকে দেখেছে সমীর। করুণার দেহে এসেছে উচ্ছল লাস্য, সেই সাধারণ মেয়েটি আজ আমূল বদলে গেছে। তার গায়ে উঠেছে ছোট্ট হাতকাটা ব্লাউজ, নিটোল মোমমাজা হাতটা মাংসল আমন্ত্রণ নিয়ে দুটো নীরব মাদকতার আবেশময়, ছোট জামাটার নীচে পেটের ফর্সা মাংস খানিকটা ফুটে উঠেছে। দেহের সব উদ্দামতা সে আরও প্রকট করে তুলেছে, সুর্মার ছোঁয়ায় চোখদুটো আরও বড়। করুণা আজ সেজেছে, নিজেকে সাজিয়ে তুলে পুরুষের দরবারে পেশ করেছে। ...তবু চোখের সেই শান্ত শ্রীটুকুর আর কোন অবশেষ নেই।...করুণা ওকে দেখে দাঁড়াল।

ওর দুচোখ যেন জ্বলে ওঠে কি কাঠিন্য আর জ্বালায়। বললে সমীরকে।

—খুব খুশি হয়েছো না ?

সমীর ওর প্রশ্নে অবাক হয়। তার খুশি হবার মতো কারণ কিছু সে খুঁজে পায় না। ওকে দেখে খুশী হবার মোহ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে সে। আজ আর ভালবাসার স্বপ্ন দেখে না। তাই নিস্পৃহ কণ্ঠে শুধোলো সমীর।

—কেন ?

করুণার মনের অতলে তখনও চঞ্চলের কথাগুলো মনে পড়ে। একদিন সেইই কি এক মিথ্যা আশার জাল বুনেছিল মনে মনে ওই চঞ্চলকে কেন্দ্র করে। তার জন্য অনেক কিছুই মূল্য দিয়েছিল সে। করুণার জীবনে চঞ্চলই প্রথম পুরুষ, সেইই ঝড়ের আবর্ত এনেছিল করুণার কুমারী দেহ মনে। সেই ভাঙ্গন আজ তাকে পথহারা করে তুলেছে।

করুণার মনে হয়েছিল সমীরই এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। তার জীবন থেকে চঞ্চলকে সরিয়ে নিয়েছে সে, তারই বোন সুষমা সেই অপসারণের উপলক্ষ্য। সমীর এমনি করেই করুণার দেওয়া আঘাতের প্রতিশোধ নিয়েছে। আবার তার এই না জানার ভান করা দেখে জ্বলে ওঠে করুণা। ফোঁস করে ওঠে সে।

সুষমাকে নিয়ে ঘর পেতেছে চঞ্চল। তার মূলে কে ছিল তা জানি না বলছো ?

—আমি ! সমীর চমকে ওঠে।

তাকে এমনি বিপরীত বুঝবে—তাকেও এই ঘৃণ্য সন্দেহের পাঁকে জড়াবে করুণা একথা কোনদিনই ভাবে নি সে। অস্ফুট কণ্ঠে বলে সমীর।

—করুণা বিশ্বাস করো।

হাসছে করুণা, অবিশ্বাস আর অবজ্ঞার হাসি। বলে সে।

—হ্যাঁ, তুমি গঙ্গাজলে ধোওয়া তুলসীপাতা, সবাই ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। বদ—নষ্টা শুধু আমরাই ! কাওয়ার্ড—হিপোক্রিট কোথাকার। আদর্শ, ভালবাসা—অল র‍্যাবিশ টক্স।

ওর মুখের দিকে না চেয়ে বের হয়ে গেল করুণা। সমীর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এ নিয়ে কোন কৈফিয়তই সে দেবে না। তবে দুঃখ হয় এমনি করে সব

তার হারিয়ে যাবে, ওরা সবাই ভুল বুঝবে তা ভাবে নি। নিজেকেই কত নামাে পেরেছে করুণা তা স্বচক্ষেই দেখে দুঃখ পায় সমীর।

সুষামও সুখী হয়েছে। তার জীবনের অতলে ছিল পুঞ্জীভূত হতাশা আ বেদনা। গানও শিখেছিল সে, ভালো গাইত। মনে মনে তার আশা ছিল সে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, কিন্তু এতদিন তার বৃথাই কেটেছে। জীবনে শুঃ কুড়িয়েছে বঞ্চনা আর জ্বালা।

আজ সেই ব্যর্থ জীবনপাত্র সার্থকতার কানায় কানায় ভরে উঠেছে। চঞ্চল তা মর্যাদা রেখেছে। সুষমা আর সে দুজনের নিঃশেষ ভালবাসায় আজ প্রতিষ্ঠ পেয়েছে। সুষমা আবার গান গায়। বাড়িতেই দু একটা টুইশানি করে। চঞ্চ বলে,—ওর কি দরকার?

হাসে সুষমা।

—চর্চা থাকা ভালো, তবু সময় কাটে। কিছু আনন্দ পাই, আর নগ বিদায়ও কিছু জোটে। তুমি আর বাধা দিও না। হাসে চঞ্চল।

একই বাড়িতে সাহিত্যিক আর গাইয়ে থাকতে পারে না।—কেন? সুষম ডাগর দু চোখ মেলে তার দিকে চাইল। চঞ্চল জবাব দেয়।

—একজনের সাধনা নির্জনে—স্তব্ধতার মাঝে, অন্যজন সাধে গলা ফাটিয়ে, এ তফাৎ আর কি?

সুষমা বলে।

—তবে কিন্তু আর গান শুনতে চেওনা কোনদিন।

হাসিতে ওদের তর্কের শেষ হয়। ব্যাগ থেকে চেক-টাকাগুলো বের করে করতে বলে চঞ্চল।

—এগুলো রাখো। হ্যাঁ প্ল্যানটা পাশ হয়ে গেছে। বাড়ির প্ল্যান। এইবা ভাবছি কাজে হাত দোব।

সুষমা সায় দেয়—সেই ভালো। হ্যাঁ—তিমিরের চাকরীর ব্যাপারে বলেছিে কাউকে? মা তো প্রায়ই বলে।

আবার মা মেয়ের মধ্যে সহজ স্বাভাবিক অবস্থাটা ফিরে এসেছে।

ওদের মাঝে একটা বন্ধন গড়ে উঠেছিল, কল্যাণীও আসে মাঝে মাঝে এবাড়িতে প্রতিমাও আসে দিদির কাছে। চঞ্চল তখন কাজে ব্যস্ত। লেখার জন্য তার গতায়াঃ অনেক ঠাঁই, বাংলার দূর পল্লী অঞ্চলে, বাংলার বাইরে যত্রতত্র ঘোরে। প্রতিমাবে দেখে অভ্যর্থনা জানায় চঞ্চল।

—এসো এসো, সুষমা কে এসেছে দেখ? কি ভাগ্যি প্রতিমা হাসে—বাব্বা এত খাতির?

···সুষমা গান গাইছে, বোনকে দেখে এগিয়ে আসে।

প্রতিমাকে সুষমাই এটা ওটা দেয়। বোনের পরণে সাধারণ শাড়ি, জামা।

সুষমার ভালো শাড়ি পরার সামর্থ্য আছে, সেও বোনকে দেয় দু একটা শাড়ি—জামা।

—নে!

প্রতিমা প্রথম থেকে দেখেছে দিদির ভাগ্যকে। কি দুরবস্থার মধ্যে মা তাকে যেদিন বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল. আজ তার ভাগ্য উথলে উঠেছে। প্রতিমা এখন দাদার দয়ায় বাস করছে, খাওয়া পরা যা—তা অতি সাধারণ।

দিদির কাছে এসে সেই পার্থক্যটা বুঝতে পারে। প্রতিমার মনের অতলে কোন নারীমন নীরব একটা আগুনের যেন জ্বালা বোধ করে। হাত পেতে তবু ওর দান দিতে বাধ্য হয়।

কল্যাণীও হাসে। সুষমা মাকেও সাহায্য করে কিছু। কল্যাণী আজ মেয়ে জামাইকে মেনে নিয়েছে। সুষমার মনের শান্তি ফিরে এসেছে। মনে মনে ভাবে সে ঠকে নি। এ তার নিজেরই আত্মপ্রসাদ।

চঞ্চলের মতো বেপরোয়া তরুণকে নিজের বাঁধনে বেঁধেছে। তার সাহিত্যকৃতিতে সুষমার নিজেরও নীরব দান রয়ে গেছে। এ তারই গৌরব। বাড়ির কাজ সুরু হয়েছে। ঘটা করে ভিতপুজো করে বাড়ি তুলছে। চঞ্চলও আশা করছে তিমিরের চাকরিটা হয়ে যাবে।

চঞ্চল জানে ওটা করার দরকার, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার—ওই সুষমার ওবাড়িতে হারানো সম্মান ফিরে পাবার ওইটাই পন্থা।

সুষমা মাকে সান্ত্বনা দেয়।

-চাকরী হয়ে যাবে তিমিরের।

কল্যাণী মেয়েকে ক্রমশঃ কাছে পায়। ওবাড়ির সবারই মাথা নীচু করেছে সে। হারে নি একজনের কাছে; চঞ্চলও সেটা পদে পদে অনুভব করে। সমীর বিয়ের পর একদিনও এখানে আসে নি। সুষমাকেও এড়িয়ে গেছে। সে প্রতিবাদ করে না গলা ফাটিয়ে—কিন্তু তার চালচলনে দেখা যায় তার মনের সেই উৎকট ভাবটা। স এদের এই উন্নতি-প্রতিষ্ঠা-ভালবাসাকেও আমল দেয় নি।

···আজ হঠাৎ সেই বিভেদের পাথরটা কেমন যেন নরম হয়ে আসে। সুষমার জীবনে এসেছে পূর্ণতার আবেশ। এতদিন সে ব্যর্থ হয়েছিল। আজ তার বাড়ি তরী হয়েছে, চঞ্চলের নামডাক বেড়েছে। সাহিত্যের দরবারে তার স্বীকৃতির শরোপা মিলেছে।

সুষমাও মা হতে চলেছে।

···গঙ্গার জলধারার বুকে সেই ঝড়ের আবর্ত মুছে গিয়ে আবার তাতে এসেছে পূর্ণতার আভাস।···ওরা সুখী হয়েছে। আজ চঞ্চল আর সুষমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে কল্যাণী নিজেই এগিয়ে যায়।

—আয় বাছা। এসো বাবা!

তিমির নিজেই আজ এগিয়ে গিয়ে চঞ্চলকে আর দিদিকে প্রণাম করে। চিঠিখা দেখিয়ে জানায়।

—চাকরিটা হয়ে গেল চঞ্চলদা। বুঝলি বড়দি, চঞ্চলদার কিছু ক্রেডিট আছে লিখিয়েদের এত মান-খাতির তা জানতাম না। হাসে চঞ্চল। সুষমা গর্ব বে করে মনে মনে।

সমীর বাড়িতে ঢুকেছে। সেও ওদের দুজনকে দেখে চেয়ে থাকে। চঞ্চলে পোষাকও বদলে গেছে। দামী দিশি ধুতি, আর দুধে-গরদের পঞ্জাবী পরা চেহারা সুষমার পরণে মুর্শিদাবাদ সিল্কের বাতিকের কাজ করা শাড়ি। তিমির সমীরে কথাটা জানিয়েছে মাত্র, কিন্তু তাতে কোন কৃতজ্ঞতার ছাপ নেই। থাকবেই বা কেন সে তো কিছুই করে নি তার জন্য। কল্যাণীও মেয়ে-জামাইকে কোথায় বসা খুঁজে পায় না।

তারস্বরে শোনায় স্বামীকে।

—ওগো. সুষি আর চঞ্চল এসেছে।

সমীর প্রতিমাও বের হয়ে এসেছে। সমীর এই উৎসবমুখর পরিবেশ থেকে স চলে গেল তার সেই সিঁড়ির নীচেকার ঝুপসি ঘরের মধ্যে।

ব্যাপারটা সুষমার নজর এড়ায় না, চঞ্চলেরও।

কল্যাণীও দেখেছে ওদের মুখে চোখে সেই ভাবান্তর। ব্যাপারটাকে সহজ করা জন্য বলে।

—সমীরের কথাই আলাদা মা। ও অমনিই। তোমরা বস বাবা। ও সু কাপড়টা বদলে ফেল বাবা। তোরা আজ এইখানেই খাবি। প্রতিমা যা দিদিে একটা শাড়ি দে।

কল্যাণী কি ভেবে ছেলের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

সমীর তার সেই মড়মড়ে তক্তপোষের উপর গুটোনো সতরঞ্চিটা পেতে যত্ন কে একটা বিড়ি ধরিয়ে টানছিল, মনে হয় সদানন্দবাবুর কথাই সত্যি। ওদের মনে লোভের আর নিশ্চিন্ততার বীজটাকে সে দূর করতে পারবে না। নিজের এই সবকিছ থেকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।

মাকে ঢুকতে দেখে সমীর ব্যাপারটা বুঝতে পারে। নিজেই তাই শুধোয়।

কিছু বলবে?

কল্যাণী ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। ওর মুখে অনুনয়ের নীরব আকু মেশানো। কাউকেউ সে চটাতে সাহস করে না। সমীর বলে।

—কি বলবে তা জানি। তোমরা সবকিছু মানতে পারো, আমার পক্ষে সে সম্ভব নয়। ব্যাপারটা কতটা সত্যি তা এখনও বুঝে উঠতে পারি নি মা তোমাদের দুঃখ দিতে চাই না।

সমীর উঠে দাঁড়াল। কি ভেবে এগিয়ে গেল ওপাশের ঘরের দিকে।

প্রতিমার আশ্রয় এটা। একদিকে এর ভাঁড়ার ঘর। তৈজসপত্র—এটা সেটা
ালের ড্রাম—আটার টিন—তরকারির চুবড়ি রয়েছে এক পাশে। অন্যদিকে একটা
ক্তপোষ, বহু পুরোনো বিবর্ণ হয়ে গেছে সেটা। প্রতিমা তার পাশেই একটা রং
ঠা টেবিলে বইপত্র রেখেছে, আয়নায় নিজের হাতে তৈরী একটা লেসের কাজকরা
র্দাও লাগিয়েছে। পুরোনো—পারাওঠা চটাছাড়া আয়নার তুলনায় পর্দাটাই
ালো, ছোটো ছোটো দুটো জানলাতেও রঙীন পর্দা বানিয়ে নিয়েছে। সব দৈন্য আর
গ্র অভাবের মধ্যেও প্রতিমার সৌন্দর্য-পিয়াসী মনের রূপটা ওখানে ফুটে উঠেছে।
স্তা নকল করার প্রবণতা তবু চিরকালের—তাতে মিশেছে একটা অক্ষম লোভ।

চঞ্চল সুষমা আর প্রতিমা গল্প করছিল, চঞ্চল এখানে নায়ক। তার কাছে
ুষমার মোহ তখনও মনকে ছেয়ে আছে, তবু অচেতন মনের একটা ক্ষীণ লোভের
ায়া পড়েছে ওর দুচোখে। প্রতিমার সারা দেহে এখন যৌবনের উদ্দাম লাবণ্য।
ঞ্চলের মনে হয় সুষমা তার কাছে একটা পড়ার বই। তার ভিতরের সব অধ্যায়—
রিত্র তার জানা হয়ে গেছে। গোপন রহস্যও তার জানা। কেমন যেন পানশে
াগে।

সুষমার দেহের সেই লাবণ্য আর নেই। তার আসন্ন মাতৃত্বের চিহ্ন চঞ্চলকে
ঠাৎ কেমন চিন্তিত করে তুলেছে, তার সামনে আসছে বন্ধন; কঠিন দায়িত্ব।
াথায় তার মুক্ত মন বাঁধা পড়ে গেছে। সেই উদ্দামতা—আর মুক্তির সব
বিকাশকে ওই সুষমা শেষ করে দিয়েছে।

ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছে প্রতিমার ফর্সা নিটোল
ুখে। গলাটা ওর লালাভ, নাকটা ওই সুন্দর পটভূমিকায় সুঠাম হয়ে উঠেছে,
ায়ত চোখের পাতাগুলো দীর্ঘ—চোখ বোজার পরও সেগুলো চোখের ওপর কালো
ূক্ষ্ম রেখায় কাজল রং-এর ছোঁয়া আনে।

পাতলা ঠোঁট দুটো হাসির ঝলকে ঝলসে ওঠে, মুক্তোর মতো কয়েকটা দাঁত
াই হাসিটুকুকে সজীব-প্রাণময় করে তোলে, নিটোল গালে দুটো টোল দেখা
ায় হাসলে।

চঞ্চল মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে প্রতিমাকে। প্রতিমা হাসে, লাস্যভরা চাহনিতে
ল।

—কি দেখছেন? আমায় নিয়ে আবার গল্প ফাঁদবেন নাকি?

চঞ্চল জবাব দেয়।

—নায়িকার মতো চেহারা সত্যি তোমার, তবে মনের খবর জানলাম কই?

প্রতিমা বলে—মনের মানুষ পেলাম না, সুতরাং কোন খবরই নেই।

—আপশোষ হচ্ছে? চঞ্চল সহজভাবে প্রশ্ন করে।

প্রতিমা জবাব দেয়।

—তাহলে করুণাদিকে নিয়েই গল্পটা শেষ করুন। বেচারা!

ব্যর্থ প্রেমের উপ্যাখ্যানটা কিন্তু জমবে ভালো। কি বল দিদিভাই? চ
হাসছে। মেয়েদের সামনে এসব পরিচয় মনে হয় তার কাছে গৌরবের। সুষ
মনের সেই চাঞ্চল্য আজ চাপা পড়ে গেছে। তার মনে হয় মানুষটাকে সে হা
এনেছে। তাই কোন কৌতূহল উৎকণ্ঠা তার নেই। বোনকে ধমকে দেয় সুষমা।

—কি ফাজলামি করছিস্ প্রতিমা।

প্রতিমা খুশীতে মেতে উঠেছে, কালো চোখ দুটোর কাল্পনিক ভয়ের সা
ফুটিয়ে বলে সে।

—বুঝলেন চঞ্চলদা, দিদির কিন্তু এখনও আপনার সম্বন্ধে রীতিমতো
আছে।

…হঠাৎ সমীরকে দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে দেখে চুপ করল প্রতি
চঞ্চল-সুষমাও অবাক হয়েছে। সমীর ভূমিকা না করেই বলে।

—তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ চঞ্চল। তিমিরের চাকরির ব্যবস্থা করেছে
নানাভাবে তোমার সাহায্যও আসে এ সংসারে। মাও খুশী হয়েছে। আমরাও।

চঞ্চল ওর কণ্ঠস্বরে অবাক হয়। সুষমাও। ভেবেছিল সমীর আরও কি
বলবে। ব্যাপারটা সহজ হয়ে উঠবে। চঞ্চলও ভাবে আগেকার সেই সহ
স্বাভাবিক সম্পর্কটা আবার গড়ে উঠবে।

কিন্তু ও কথাগুলো বলেই চলে গেল, যেন পাখীর মতো আউড়ে গেল কথাগুলে
চঞ্চল চুপ করে থাকে। মনে হয় সমীর কৃতজ্ঞতা জানালো, না তাকে ঠাট্টা ক
গেল বুঝতে পারে না। তবু চঞ্চল হাসি দিয়ে ব্যাপারটাকে সহজ করার চে
করে। চুপ করে থাকে সুষমা। কল্যাণীও ছেলের পিছনেই এসেছিল, ওকে
কথা স্বীকার করতে দেখে খুশী হয় সে।

প্রতিমাকে বলে।

—চাটা এনে দে মা। চঞ্চল তুমি বাবা নেয়ে নাও চা খেয়ে। আমার রান্না
আসছে। তিমিরকে ডাকি বেলা হয়ে গেল অনেক। সুষমা দাদার সেই কথাগ
কিন্তু ভোলে নি। এতদিন পরে হঠাৎ ওই ভাবেই বা কথাগুলো বললো কেন
বুঝতে পারে না।

চঞ্চলের একটা বইএর চিত্ররূপ এসেছে এখানের সিনেমায়। ছবিটা এমনি
নাম করেছে প্রচুর। খ্যাতি এবং অর্থ দুই-ই পেয়েছে চঞ্চল।

প্রতিমাই বলে।

—ছবিটা দেখি নি, চল না দিদিভাই দেখে আসি আজ। ও চঞ্চলদা দেখবে
ছবিটা?

চঞ্চল হাসে।

—তোমার দিদিকে বলো।

সুষমার এই অবস্থায় বাইরে যেতে মন চায় না। দেখেছে রাস্তায় ঘাটে চঞ্চ

গতদের অনেকেই চেনে। তার সম্বন্ধে একটা কৌতূহলও রয়েছে : ওকে চঞ্চলের দেখে অনেকেই হয়তো অনেক কথা বলে। তাদের আলোচনা কিছু কানেও ছে। সেটা খুব সুখশ্রাব্য মোটেই নয়। ওই সুষমার মতো বাজে মেয়েই ক চঞ্চলের মতো এতো নামকরা একজন লোককে পাকড়ে বিয়ের জালে বন্দী রছে।

কথাটা শুনতে সুষমার ভালো লাগে নি। তাছাড়া এই অবস্থায় নিজের রাও বিশ্রী হয়ে গেছে। মাতৃত্বের ছায়া তার সেই উদ্ধত রূপের সায়রে একটা তা এনেছে।

মেয়ে হয়ে মনে মনে সে খুশী হয়েছে। চঞ্চলকে জয় করেছে সে। আজ তার ড় হয়েছে—মা হতে চলেছে। ওই বেপরোয়া উদ্দাম মানুষটিকে বেঁধেছে কিছু দিয়ে।

চঞ্চলের কথায় সুষমাও খুশী হয়। তার অনুমতি চায় সে।

সুষমা বলে।

—যাও না, ও দেখেনি ছবিটা।

—তুমি যাবে না? প্রতিমা দিদিকে অনুরোধ করে।

—পাগলী! যা না তুই ওর সঙ্গে।

চঞ্চল অগত্যা রাজী হয়। প্রতিমার মন অজানা খুশিতে ভরে ওঠে। সাজলে আরও সুন্দর লাগে। রূপ যৌবন সবই তার আছে, গালের লালিমা সামান্য নেই মুখর হয়ে ওঠে।

ষমার ধানিরং শাড়িখানায় প্রতিমাকে মানিয়েছে চমৎকার। ওঘর থেকে জে এসেছে সে। নিটোল বুকের উপর লাল রং-এর কাজকরা পাড়টা রখায় নেমে এসেছে। পেঁচিয়ে শাড়িখানা পরেছে, চঞ্চল ওকে দেখেছে। ওই র টান উদ্যত ভঙ্গীতে তার অন্তরালের যৌবনবতী দেহের আকর্ষণীয় সব লো স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। ফর্সা কপালে পরেছে একটা গোলাপী কুমকুমের চোখের পাতায় কাজলের কালিমা; অবাক হয় চঞ্চল, অন্ধকারের মাঝে কোথা এক ঝলক আলো এসে পড়েছে।

ঞ্চল বিস্মিতকণ্ঠে বলে।

—একি।

—কেন? অবাক হবার ভাণ করে প্রতিমা। ওর চোখে তাকে ভালোলাগার টুকু জেনেছে তার নারীমন। চঞ্চলের মনে হয় হঠাৎ যেন অতীতের সেই নর প্রথম দিনগুলোতে ফিরে গেছে সে। সুষমার দেহ ঘিরে সেদিন ছিল লাস্য, যাকে তার তরুণ মন সারাক্ষণ কামনা করেছিল।

আজও সেই মন মরে নি, সব রূপ রস বর্ণ তৃষ্ণা নিয়ে সজীব হয়ে আছে। দেহে মনে তার একটা সাড়া জাগে। চাঞ্চল্য জাগে আলোড়ন জাগে। চঞ্চল

নিজের চাপাপড়া সেই মনটাকে আজ চকিতের জন্য আবিষ্কার করে। স
এসব কথা ভাবে না। সে তার খুশি আর পূর্ণতার জগতে আজ সমাহি
বলে,

—দেরী হয়ে যাচ্ছে। টিকিট পাবে তো ?

প্রতিমা হাসতে হাসতে বলে।

—বেশ হয় কিন্তু, লেখক নিজের ছবি দেখতে গিয়ে ঠাঁই না পেয়ে ফিরে এলে আমি কিন্তু লোককে বলে দোব—এই সেই চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়। ওর কথাগু যেন ওই অগ্নিপুঞ্জ থেকে ছিটকে পড়া শিখার কণিকা, উজ্জ্বল—প্রাণময়—বর্ণম চঞ্চল ও প্রসঙ্গ ভুলতে চায়! বলে, চলো। দেরী হয়ে গেছে।

ওরা বের হয়ে গেল দুজনে। প্রতিমার মনে গুন গুন একটা সুর ওঠে। চ চলেছে চুপ করে। ওর পাশের বাতাসটুকুও যেন নীরব একটা বিদ্যুৎ প্রভ প্রভাবময়।

প্রতিমা বৈকালের পড়ন্ত রোদের হলুদ আভালাগা গাছগুলোর নীচে দি চলেছে। দমকা বাতাসে তাদের গায়ে মাথায় ঝরে পড়ে গুলমোহর ফুলগুলে কি এক স্বপ্নময় জগতের পথে দুজনে যেন হারিয়ে গেছে। প্রতিমা নিরপেক্ষ দিকে চেয়ে।

—কি হল ? কথা বলছেন না যে ?

চঞ্চল হাসবার চেষ্টা করে। তার মুখে কথাটা যুগিয়ে যায়। জানায় সে

—নেশায় বুঁদ হয়ে চলেছি।

চমকে ওঠে প্রতিমা। ও জানে শুনেছেও চঞ্চল মদ খায়। এখনও খেয়ে নাকি কে জানে। সাধারণ মেয়েদের মনে মাতাল সম্বন্ধে একটা আতঙ্কই থাকে তাই জিজ্ঞাসা করে।

—ওমা, মদ খেলেন কখন ?

—না। মদের চেয়েও এ সাংঘাতিক নেশায় বুঁদ হয়ে আছি।

—কি রকম। প্রতিমা ভয় কৌতূহল জড়ানো কণ্ঠে প্রশ্ন করে! চঞ্চল সহ হবার চেষ্টা করে।

এই সুন্দরী সবুজ পৃথিবী আর এমনি সুন্দরী একটি নারীর নেশায় মত্ত হ আছি প্রতিমা।

প্রতিমা হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে।

—ও বাবা! না; সাহিত্যিক না হয়ে কবি হওয়াই উচিত ছিল আপনার কবিতা টবিতা লেখেন নাকি!

—ওটা সকলেই করে। অবশ্য গোপনে ঠিক অবৈধ প্রেম করার মতো। স ছেলেমেয়েই একআধটু করে। কেউ সাক্সেসফুল হয়ে কেউ আউট হয়ে যায় কি বলো ?

প্রতিমা মিষ্টি ভঙ্গীতে জানায় সুন্দর চোখ দুটো কুঁচকে।

—না মশাই, ছেলেদের খবর জানি না। তবে সব মেয়েরাই অমন নয়।

একটু চিমটিকাটার মতো ভঙ্গীতে বলে প্রতিমা।

—অবশ্য করুণাদির মতো মেয়ের অভাব নেই। তাদের দিয়ে বিচার করবেন না।

প্রতিমা কথাটা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতেই জানাল। চঞ্চল একবার ওর দিকে চাইল। মনে হয় ওই রহস্যময়ী নারীর মনের খবরটাও সে জেনে ফেলেছে। এ তার কুমারী মনের গর্ব আর কৌতূহল।

চঞ্চল নিজের বুকের মধ্যে বিচিত্র সেই সাড়াটার খবর পায়। নিজেকে সে বিশ্বাস করতে পারে না, বর্ষায় মেতে ওঠা গঙ্গার মতো তার কুলে কুলেও ভাঙ্গনের সাড়া ওঠে। একটা দুর্বার জ্বালা আর মত্ততা জাগে যে সব কিছুকে নির্মম আঘাতে শুধু ভেঙ্গেই ফেলতে চায়। তছনছ করে সব বাঁধনের সীমা হারিয়ে অসীম মুক্ত জগতে নিজেকে খুঁজে পেতে চায়। প্রতিমা ওর মনের অতলের সেই নোংরা লোভী মনটার খবর জানে না।

ছবিঘরের দিকে এগিয়ে যায় তারা।

ভিড় হয়েছে। সিনেমার ওখানেই সহরের বহু মানুষ, মেয়েছেলে এসে ভিড় করে ছুটির দিন। ওদিকে খচাঁর বেড়া মতো করা, সেখানে লাইন দিয়েছে নীচেকার টিকিটের দর্শকরা।

সিটি দিচ্ছে তারা। হৈ চৈ করছে কাউণ্টারের সামনে।

অনেকেই কৌতূহলী চোখে চেয়ে দেখছে চঞ্চলকে। প্রতিমা অনুভব করে মেয়েদের চোখে চঞ্চলকে ঘিরে আজ কি বিচিত্র একটা দৃষ্টি। চেহারাটাও সুন্দর চঞ্চলের। পাটভাঙ্গা দিশী ধুতি, গরদের পাঞ্জাবীতে মানিয়েছে চমৎকার।

ষ্টেশনারী দোকানদার মদনও এসেছে ছবি দেখতে।

সেই-ই এগিয়ে আসে—চঞ্চলদা, ছবি দেখবেন নাকি?

চঞ্চল হাসিমুখে জবাব দেয়।

—প্রতিমা দেখে নি ছবিটা তাই এলো। টিকিট আছে?

ম্যানেজারও চেনা। তিনিও মদনের বেশ মাইডিয়ারগোচের বন্ধু। চোখ দুটো ফোলা ফোলা। হাতে কয়েকটা আংটি। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী পরা। কিশোরীবাবুই এগিয়ে আসে।

আর টিকিটের দরকার কি? এসেছেন দয়া করে! আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি! আসুন।

প্রতিমাও এই খাতির, আর অভ্যর্থনার বহরে অবাক হয়। চঞ্চলদাকে এরা সকলেই মানে। তার জন্য কেউ কিছু করতে পারলে যেন কৃতার্থ বোধ করে।

পাটকলের দত্তসাহেবও সস্ত্রীক এসেছেন। তাঁরাও চঞ্চলকে নমস্কার জানায়। মিসেস দত্তর দিকে চেয়ে থাকে প্রতিমা।

ভদ্রমহিলার রূপ এককালে ছিল, এখন দেহ মাংসল হয়ে উঠেছে। তবু উৎব প্রসাধন আর লো-কাট ব্লাউজ পরে এখনও নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। মিসে দত্ত চঞ্চলের গায়ে যেন ঢলে পড়ে। হাসির আবেগে তার বুকটা ওঠা-নামা কর বিশ্রীভাবে। লো-কাট ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে একডাল মাখনের মতো হলুদ আভাভ হাতটা বের হয়ে আসে, মাংসল বুকের কিছুটা ঠেলে উঠেছে।

মিসেস দত্ত বলে।

—আপনার মিসেসকে তো দেখালেন না, দেখলাম তার বোনকে। তা অনেকদি আসেন নি। একেবারে গুডবয় হয়ে গেলেন নাকি চঞ্চলবাবু? মিস চ্যাণ্ডিব আপনার কথা প্রায়ই বলেন। আমি তো ভাবলাম ইউ হ্যাভ হিপ্নোটাইজড্ হা কম্প্লিটলি! প্লিজ ডু কাম ওয়ান ডে মাই ডিয়ার!

চঞ্চল হাসছে। প্রতিমা চুপ করে বসে আছে। চঞ্চলের মনের অতলে কি যে রহস্যময় একটা জগত আছে সেটা বর্ণময়, বৈচিত্র্যময় কামনামদির, প্রতিমা তে ওদের দেখেই বুঝতে পেরেছে। চঞ্চলের তার দিকে নজর দেবার সময় যেন নেই।

পর্দায় ছবি শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে ছবির জগতে হারিয়ে যায় প্রতিমা একটি কুমারী মেয়ের প্রেম জন্ম নিচ্ছে তার নিভৃত অন্তরে, সদ্যজাগর একটি শতদলে সুরভি নিয়ে, একে একে সে তার এক একটি পাপড়িকে মেলে ধরেছে।

প্রতিমার মনে হয় এ যেন তারই কথা। সেও এমনি করে নিভৃত নির্জনে কা ভালোবেসে সার্থক হতে চেয়েছিল, তাকে দেখেছিল অতীতের একটি বর্ষণমুখ রাত্রে, সেই তার প্রথম পুরুষকে দেখা, সেদিন বোঝে নি—অনুভব করে নি তা মনের সেই কামনাকে। হঠাৎ সেই দিনের ক্ষণিকের ভালবাসার মূলে যে তা অজানতেই প্রতিমার মনে ঠাঁই নিয়েছে এটা আবিষ্কার করেছে অনেক বেদনা মধ্য দিয়ে।

ছবির জগত তার সামনে প্রাণময় হয়ে ওঠে। তেমনি একটি অভাবের সংসা একটি নারীমন বাঁচতে চেয়েছে। এই সবই যেন তার চেনা, চঞ্চলের লেখার মধে নিজেকে যেন খুঁজে পেয়েছে, এই অতিবড় মিষ্টি একটা সত্যকে সে আবিষ্কার ক বিস্মিত হয়েছে।

—একটু আসছি।

চঞ্চল ওকে কি বলে বের হয়। দোতলার বারান্দা দিয়ে এসে ঢুকলো ম্যানেজা কিশোরীবাবুর ঘরে।

কিশোরীবাবু করিতকর্মা লোক, এখানের রসিকজনের তিনি অন্যতম দত্তসাহেবও এসেছেন। ইতিমধ্যে বের হয়ে এসেছে মদন। কেবিনের আড্ডার বন্ধ তিনকড়ি এসে পড়েছে। সন্ধ্যার দিকে বাজার ভালো চললে কিশোরীবাবু অতি বন্ধুদের আপ্যায়িত করে।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ওরা বসেছে।

গরম গরম কাটলেট, তাতে আবার বিশেষ করে কাঁচালঙ্কা দেওয়ানো হয়েছে। মদের মুখে ঝালটা ভালোই লাগে।

—নিন চঞ্চলবাবু!

চঞ্চল অনেকদিন এসব খায় নি। তা ছাড়া সঙ্গে প্রতিমা রয়েছে। বলে সে।

—আবার এখন এসব! না—না।

হাসে মদন—অমৃতে অরুচি কেন দাদা?

চঞ্চল বলে—সঙ্গে প্রতিমা রয়েছে। ছোট শালী—কি ভাববে!

সকলেই ওরা হো হো করে হেসে ওঠে। এটা তাদের কাছে যেন বিচিত্র ঠেকে। অবশ্য এর আগে চঞ্চল ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মদ হজম করতে পারতো। আজ তাকেই এমনি সংযত হতে দেখে বলে তিনকড়ি।

—তবু যদি স্ত্রী হতো। স্ত্রীর বোন শালী, তায় ওমনি চলে চলে, তা বরাত ভালো চঞ্চলের! আসলের চেয়ে ফাউই তো সরেশ। কি বলেন মিঃ দত্ত?

—তাই তো দেখলাম।

তিনকড়ি বলে—চালাও গুরুদেব। মদ খাও তাতো জানে। মেয়েরা আবার মাতালদের বেশী ফেভার করে কিন্তু।

তিনকড়ি তার আগেই বেশ খানিকটা গিলে টর হয়ে বসে আছে। ওরা খাচ্ছে। তিনকড়ি বলে চলেছে।

—দেবদাস ফিলিম্ দেখেছিস কিশোরী? বল তালে ওই লেখককে মাতাল দেবদাসের জন্য বাজারের বাঈজীর কি লভ; পার্বতী, মানে পারুর কি কান্না দেবদার জন্যে? কাঁদতো? দেবদাস মদ না খেলে কান্‌তো? বল—বল কিশোরী। মেয়েদের অবধি দেবদাস ফিলিমের জন্যে কি ভিড়? এ্যাঁ।

মদনও এসবের পথিক। অবশ্য তার এটা চলে গোপনে। তার আবার পাটকলের ইউনিয়ন আছে। দত্ত সাহেব সেখানের লেবার অফিসার। মিঃ দত্ত বলেন।

—তুমি সেদিনের লেবারদের ওই আন্দোলনটাকে ম্যানেজ করো কিন্তু মদনবাবু!

মদন হাসছে। এসব তাদের সমঝোতা আছে। মিঃ দত্ত বলেন।

—কাল পরশু বাসায় আসবে কথা হবে। বড় সাহেবও তাই চান।

মদন মাথা নাড়ে—হবে ওসব। আপনারও চাকরি থাক—আমারও নেতাগিরি থাকুক। বুঝলেন না?

হাসছে ওরা। অলক্ষ্যে বন্ধদরজার আড়ালে মদের টেবিলে অনেক নীতি নিয়েই ওরা আলোচনা করে, পথ নির্ধারণ করে।

চঞ্চলের সারা শিরাতন্ত্রীতে ঝাঁঝালো পানীয়টা কি বিচিত্র সাড়া আনে। সেই আগেকার ভুলে যাওয়া উন্মাদনাময়, দিনগুলো তার মনে একটা চাঞ্চল্য কেন, কেমন সাড়া জেগেছে তার মনে মনে।

চঞ্চল উঠে অন্ধকারেই আবার সিটে এসে বসল।

মিসেস্ দত্তর মাংসল দেহটার দিকে চেয়ে থাকে। প্রতিমার দুচোখের তারায় কি আবেশ। প্রজেক্টারের আলোর রেখাটা অন্ধকার হলে একটু ক্ষীণ আলোর আভাস এনেছে প্রতিমাকে দেখছে চঞ্চল কি নোতুন চোখে!

মিসেস দত্ত ওর দিকে চেয়ে আছে। ওর কঠিন মুখে একটু বিশ্রী হাসির নীরব অস্তিত্ব ফুটে ওঠে। চঞ্চল তার দিকে নয়—ওই সুন্দরী পূর্ণ-যৌবনা কুমারীর অনাঘ্রাত রূপের দিকে বুভুক্ষু দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

প্রতিমার কোনদিকে খেয়াল নেই। পর্দার বুকে গড়ে ওঠা সেই স্বপ্নজগতে সে হারিয়ে গেছে। ছবি শেষ হল তখন প্রতিমার মনে নীরব একটা শ্রদ্ধা, ওই মানুষটিকে ঘিরে। বেদনা ফুটে ওঠে ছবির সেই নায়িকার জন্য। জীবনে সে সবকিছু দিয়ে গেল পেল না কিছুই।

শো ভাঙ্গার পর ভিড় চলেছে রাস্তা দিয়ে স্রোতের মতো।

ওরা দুজনেও বের হয়েছে, প্রতিমা আর চঞ্চল। প্রতিমার সারামনে নীরব বেদনা আর আনন্দের ছায়া। চঞ্চলের মনের অতলের একটি ভিন্ন মানুষকে সে আজ আবিষ্কার করেছে।

বলে প্রতিমা।

—চলুন একটু ঘুরে যাবো। এত সকাল বাড়ি ফিরে কি হবে!

—ভাববে না?

হাসে প্রতিমা। জবাব দেয়।

—আমার জন্য কেউ ভাববে না। অবশ্য দিদি কি ভাববে জানি না। ভয় হচ্ছে নাকি আপনার?

চঞ্চল ওর কথায় হাসতে থাকে। বিচিত্র একটু সাড়া জাগানো হাসি। প্রতিমা ওর দিকে চাইল। কাছে এসে একটু কঠিন স্বরে চাপা কণ্ঠে বলে।

—আবার মদ খেয়েছেন? কেন যে ছাই পাঁশ গেলেন।

জবাব দিল না চঞ্চল। দুজনে এগিয়ে চলে সামনের রাস্তা দিয়ে গঙ্গার দিকে। আকাশে একফালি চাঁদও দেখা যায়। এদিকটা এখনও নির্জন। ভিড় থেকে বাইরে এসে ওরা যেন স্বস্তি আর মুক্তির নিশ্বাস ফেলে।

সুষমা বাড়িতেই রয়ে গেছে। তার মনে তখনও সমীরের কথাগুলো পাক দেয়। বৈকাল হয়ে গেছে। বাড়ির সামনের মাঠে এখনও পাড়ার ছেলেমেয়েরা খেলা করে। তাদের কলরব শোনা যায়। সুষমাও ছেলেবেলায় ওখানে নুনচোর খেলেছে। লুকোচুরির খেলায় কেবল হেরে যেতো সে।

আজ যেন জিতেছে। কিন্তু দাদার কথাগুলো তার মনে কি একটা সাড়া এনেছে। তার পাওয়াটা যেন ওর কাছে মূল্যহীন। কিন্তু তৃপ্ত সে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে রাস্তার আলোগুলো জ্বলে ওঠে। এ বাড়িতে জ্বলেছে ম্লান হ্যারিকেনের আলো। চঞ্চল আর প্রতিমা বের হয়েছে সেজেগুজে।

সমীর আজ বাড়িতে চুপচাপই রয়েছে। ছুটির দিন সারা সপ্তাহের পরিশ্রমের পর এই দিনটি তার অবকাশের। দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘুমোয় এইদিন, আজ তাও পারে নি।

ওঘর থেকে প্রতিমার হাসি আর গানের সুর কানে এসেছে। সেই সঙ্গে ভেসে এসেছে চঞ্চলের হাসির সাড়া। সুষমা ওদের থামাতে চেষ্টা করেছে।

সমীরের ভালো লাগে নি। তার বোধহয় মনটা কেমন সিনিক হয়ে উঠেছে। জীবনে তার কাছে এই খানিক আনন্দটুকুরও কোন দাম নেই—অর্থ নেই। চঞ্চলের সম্বন্ধে তার মনে একটা অন্য ধারণা জন্ম নিয়েছে। কথাগুলো বলেছিল আজ সকালে মায়ের অনুরোধেই। মেয়েদের ওপর তার ধারণা বদলে গেছে। ওরা এত বোঝে না। মনে করে কথার মধ্যেই সবকিছু জানানো যায়, কৃতজ্ঞতা আর ভদ্রতা। তাই জানিয়ে মাকে খুশী করতে চেয়েছিল সে।

সুষমাকে দেখে ফিরে চাইল। এঘরে তাকে ঢুকতে দেখে ওর দিকে চাইল সমীর হাতের বইটা নামিয়ে। সুষমার মুখে পড়েছে হ্যারিকেনের ম্লান আলো। অনেকদিন পর সমীর ওকে দেখছে। অবাক হয় সে। ওর চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেছে! সুন্দর রংটাও মলিন হয়েছে সুষমার, টিকলো নাকটা মুখের শীর্ণতাকে প্রকট করে তোলে। একটু বেশী বয়সেই মা হতে চলেছে। চোখ দুটোর ম্লান ক্লান্তি আর পাণ্ডুরতা। দেহটা ফুলে উঠেছে, সব শ্রী, সৌন্দর্য হারিয়েও পরিণত হয়েছে অন্য কোন মেয়েতে। সেই কাঠিন্য তার হারিয়ে গেছে।

অনেকদিন পর আবিষ্কার করে সমীর সুষমা কোথায় যেন একা, অত্যন্ত অসহায়। এও মনে হয় সমীরের সঙ্গে তার কোন বিদ্বেষ নেই। ওরা দুজনেই দুজনকে অনেক নিবিড় করে চেনে। আগেকার ভাইবোনের সেই সহজ ভাবটা এতদিনের অভিমান ভুল বোঝা-বুঝির পর ধীরে ধীরে ফিরে আসে। সমীর বলে।

—আয়, বোস!

সুষমা এতদিন তার মনের মাঝে দাদার উপর একটা পুঞ্জীভূত অভিমানই পুষে রেখেছিল। সে ভেবেছিল আর কেউ ক্ষমা তাকে না করুক—দাদা তাকে ক্ষমা করবেই। কিন্তু দাদাই তার সঙ্গে কথা বলে নি—কোন সম্বন্ধও রাখে নি।

আজ এতদিনের সেই অভিমানটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অবাক হয় সমীর সুষমার দুচোখে জল দেখে।

—কিরে কাঁদছিস?

—সুষমা শোনায়।

—তোর কাছে আমি অনেক বড় দোষ করেছি। কিন্তু তুই তো আমার

সেদিনের অবস্থা জানতিস ; কোথাও ঠাঁই পান নি। এছাড়া আর পথ কি ছিল বল ! কোন অন্যায় আমি করি নি। অথচ তুইই আমাকে ভুল বুঝলি !

সমীর ওর কান্না দেখে নিজেই যেন কষ্ট পায়। তার এই সরে থাকার জন্য সুষমাও দুঃখ পেয়েছে। সমীর কথাগুলো বলতে চায় নি। তবু বলে।

—অন্যায় তুই করিস নি সুষি, মনে হয় ভুল বোধহয় করেছিস। টাকা বাড়িও পেয়েছিস। কিন্তু যাকে নিয়ে ঘর বাঁধলি এত দুঃখ সয়ে, এত বড় অপবাদ মেনে নিয়ে, তার ওপর আমার কোন ভরসা নেই। সত্যিই কোন ভরসা নেই।

অবাক হয় সুষমা, দুচোখে ওর বিস্ময় আর অজানা ভয়।

—দাদা ! না, না ; ও বড় ভালো রে ?

—ভালো হলেই ভালো। তবে মনে হয় কি জানিস ; আগুন নিয়ে খেলছে চঞ্চল। নিজের সারা মনে ওর শুধু লোভ আর লালসা, খ্যাতি—টাকা—এসব ওকে আরও বিভ্রান্তই করবে।

নিজের উপর তার কোন ভরসা নেই—নিজেও জ্বলবে, আপপাশকে জ্বালিয়ে দেবে—এই আমার ভয়।

সুষমা আজ নিজের সবকিছু নিয়ে আকড়ে ধরে বাঁচতে চায়।

তাই দাদার কথায় মন থেকে সে সান্ত্বনা আর আশ্বাস খোঁজে। বলে সে—না, না। ও ভালো ; তোর একটা অহেতুক রাগ রয়ে গেছে ওর ওপর। অথচ তুইই একদিন ওকে বাঁচিয়েছিলি মরণের হাত থেকে, এবাড়িতে এনেছিলি। এখানে ঠাঁই করে দিয়েছিলি। তুই ওকে ভালবাসিস না ?

সমীর জবাব দেয়।

—ভালবাসতে ওই-ই জানে না। ওর যা আছে সেটা হচ্ছে মোহ। সেটার স্থায়িত্ব কতক্ষণ। সে শুধু জড়ায়—এক জাল ছিটকে অন্য জালে নিজেকে জড়াবে আর মুখে বলবে জীবনানুসন্ধান করছি সৃষ্টির তাগিদে। বড় পাশপোর্টখানাও বাগিয়ে নিয়েছে, অনাচার বিশ্বাসঘাতকতা করার পাশপোর্ট পেয়েছে তথাকথিত শিল্পী হয়ে গিয়ে।

হাসছে সুষমা। অনেকদিনের পর হাসছে সে সহজভাবে। সমীর ওর দিকে বেদনাভরা দৃষ্টি মেলে চাইল ? মনে হয় সুষমা বড় অসহায়, অনেক সরল—তার ভালবাসায় ফাঁক নেই। কিন্তু তার জন্য তাই বেদনা বোধ করে মনে মনে।

সুষমা বলে—তুই বোস দাদা, একটু চা করে আনি। আমার বাড়িতে হিটারে করেছি, কফি বানাবার ভারি সুবিধে হয়েছে, এইবার একটা ফ্রিজেডিয়ার কিনবো, আইসক্রীম খাওয়াবো বুঝলি। যাবি তো ? না রাগ এখনও পড়ে নি, তোর, এ্যাই দাদা !

সমীর হারানো সেই দিনগুলোকে খুঁজে পায়। মনে হয় তার নিজের মনের প্যাঁচালো ভাবনা আর ভবিষ্যৎ দর্শন সব ছেড়ে দেবে, ওরা তবু হেসে-খেলে সুখী

হোক, সেও খুশী হবে।···হাসছে সমীর অনেকদিন পর আবার সব ভবিষ্যতের অমঙ্গল চিন্তা ছেড়ে বর্তমানের খুশীটুকু দিয়ে শূন্য মন পূর্ণ করে নিতে চায়।

চাঁদের আলো পড়েছে ঘাটের ওদিকে বটগাছের উপর, দু এক জায়গায় গঙ্গার বুকে সবুজ ঘাসের গালচে পাতা, ওরা দুজনে বসে আছে চঞ্চল আর প্রতিমা। গঙ্গার জলে রুপোর চুমকির মতো চিকচিকে আভা লেগেছে; দু একটা নৌকা কালো বিন্দুর মতো বয়ে যায়—হারিয়ে যায় তারা উজান-ভাটির দেশে, ওপারে শহর-গ্রাম-কলকারখানার কালো যবনিকা; মাঝে মাঝে আলো জ্বলছে।

···খেয়া নৌকার পারাপারের ঝামেলা কমে এসেছে। কদমের এখনই অবসর। তাই চেয়ে থাকে চঞ্চল আর ওই মেয়েটির দিকে। চাঁদনী রাতে এখানে অনেকেই আসে।

তারা যে গঙ্গার ধারে রাত নির্জনে ভাগবতকথা আলোচনা করতে আসে না সেটা কদম ভালো করেই জানে। অনেকেই আসে রাতের নির্জন অন্ধকারে ওরা এখানে নানা স্বপ্ন দেখে, দেখেছে সহরের অনেক বাবুদের বাড়ির বৌ-ঝিরা আসে কোন পরপুরুষের সঙ্গে মা-গঙ্গা আর শ্মশানের এই ফাঁকটুকুকে ওরা লীলাক্ষেত্রে পরিণত করেছে।

কদমের তৃষ্ণার্ত মন মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কাছে এসে কদম ওদের দেখে অবাক হয়।

—বাবু যে গো!

চঞ্চল ওকে দেখে এগিয়ে আসে।

—ভালো আছিস!

কদম দেখছে প্রতিমাকে। সুন্দরী একটি মেয়ে, ওকে ঠিক চেনে না। অবাক হয়েছে কদম। জানে ও চঞ্চল কয়েক বছর আগেই নানা ঘটনার পর বিয়ে করেছে একটি মেয়েকে; তাকে দেখেছে কদম এই পারঘাটার ওপাশে রাতের অন্ধকারে। আজ আবার চঞ্চল এনেছে অন্য একটি মেয়েকে। কদমের ঠিক ভালো লাগে না। ভদ্দর লোকের ধাতই এমনি, একটাতে খুশি নয়। ওরা হ্যাংলার মতো কেবল শোঁক শোঁক করে কুকুরের মতো।

···কিরে কদম!

কদমের মুখে স্বভাবজাত হালকা হাসি ফুটে ওঠে। জিবের ধারও একটু বেশী। সেই সঙ্গে দেহের লাস্যটাও আছে। জবাব দেয় কদম।

ভালোই আছি।' আপনার খবর ভালোই দেখছি। খুব নাম ডাক—সেই সঙ্গে বরাতও ভালোই বলতে হবে।

চঞ্চল একটু অবাক হয় তার কথা শুনে। প্রতিমা মেয়েটিকে দেখছে। নিটোল অফুরান স্বাস্থ্য, ওর দেহটায় উপছে পড়েছে কি কমনীয়তা। বয়স কতো তা সঠিক অনুমান করা যায় না, তবে তার তুলনায় ও অনেক কাঁচ। চোখদুটো ওর হাসি আর কৌতুকের আভায় চকচক করছে।

চঞ্চলই পরিচয় করিয়ে দেয়।

—আমার স্ত্রীর ছোট বোন।

কদমের হাসিটা উছলে উঠে, তাই নাকি! প্রতিমাই উঠে পড়ে—চলুন' রাত হয়েছে।

তার যেন এখানে কেমন ভালো লাগে না। কদম হাসছে। প্রতিমাকে চোখে কি লোভ আর নেশা, সেটাকে দেখতে ভুল করে নি কদম। সে জানে চঞ্চলকেও; ওর মতো মানুষ জীবনে কোন কিছুতেই বিশ্বাস করে না। চঞ্চল ওর কথায় দাঁড়াল, কদম বলে।

—বাবু কি এখনও খুঁজছেন গো! মনের মানুষ খোঁজা সারা হ'ল না? চটে উঠেছে প্রতিমা। চঞ্চল কথাটা ওকে বলেছে এর আগেও, নিজেও জানে না আসলে এর অর্থ কি! মনের মানুষ নয় নিজেকেই চেনবার চেষ্টা করেছে বারবার তার জন্যই বোধ হয় তার সব দেখা সব অন্বেষণ।

মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যায় বাউল দলের মাঝে ও মিশেছে। দোলের সময় মাঠ ভেঙ্গে গেছে ঘোষ পাড়ার সতীমায়ের মেলায়; দেখেছে আউল বাউল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অনেককে। ওদের সাধন ভজন আত্মানুসন্ধান কোন বিরাটকে স্পর্শ করার সাধনা।

চঞ্চল এক জায়গায় ক্ষণিকের জন্য বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। কিসের জন্য ওরা পথে পথে মুক্ত আকাশতলে ঘোরে, সঙ্গ থেকে সদু খোঁজে, নিজের হারানো সেই সত্ত্বা যে বিরাট প্রকৃতির মাঝে মিশিয়ে আছে তাকেই যেন ফিরে পেতে চায়।

তাই কি চঞ্চল বারবার নিজেকেই অন্বেষণ করেছে করুণার মধ্যে—ওই আধুনিকা মিস্ ক্যাণ্ড্রির মনের ছবিতে, মিস্ দের অফুরাণ যৌবনের স্রোতে, সুষমার মাঝে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে, সেই চঞ্চল মন আরও অন্বেষণ করে—প্রতিমাকে ভালো লাগে!

•••মনে মনে ভেবেছে কথাটা চঞ্চল। এ তার নেশাই, রূপের নেশা। মদের ঘোরে মাতাল হয়ে সে শুধু নিজের তৃপ্তিই অন্বেষণ করেছে, কি একটা প্রচণ্ড পশুশক্তি তাকে জৈবিক ক্ষুধার জ্বালায় তাড়িয়ে চলেছে। সব রীতি শালীনতার বাইরে নিয়ে যেতে চায়। সেই উমাদনাকেই তার ভণ্ডমন নাম দিতে চায় অদ্বৈত সাধনা আত্মানুসন্ধান।

হাসি আসে, হাসছে চঞ্চল। গঙ্গার জলো হাওয়ায় কিশোরীর সেই মদটা এইবার কোষে কোষে সজীব, থরো থরো একটা আবেগ আর উত্তেজনা আনে।

কদম চলে গেছে ওদিকে। বোধহয় নেশার দরকার তার!

অন্ধকারে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে তারা দুজনে চঞ্চল আর প্রতিমা। প্রতিমা অবাক হয়। চঞ্চলের মুখ চোখের ভাব বদলে গেছে। চোখ দুটো লালচে, একটা ক্ষুধিত শ্বাপদ যেন তার সামনে দাঁড়িয়েছে তার নখদন্ত আর বিরাট মুখখানা হাঁ করে।

—চঞ্চলের সারাদেহে সেই আলোড়ন, পাশবচেতনাটা তার মনকে কি দুঃসহ জ্বালায় কুরে কুরে খাচ্ছে, অতৃপ্তি আর জ্বালা।

—প্রতিমা!

লাফ দিয়ে উঠেছে মত্ত একটা জানোয়ার! ওকে কঠিন নিষ্পেষণে যেন পিশে ফেলবে। প্রতিমা এমনি আক্রমণের জন্য তৈরী ছিল না। চঞ্চল তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে। ওর সারা শরীরের সেই তীব্র জ্বালাটা যেন সংক্রামিত হচ্ছে প্রতিমার দেহে-মনে।

প্রতিমার মনের অতলে জন্ম নিয়েছিল কামনার একটি শতদল। সে চঞ্চলকে ভালবাসতে সুরু করেছিল। কিন্তু সেই চঞ্চল যে দুর্বার দুর্মদ একটা দানবের মতো তার সব স্বপ্ন দেহের শুচিতাকে এক নিমিষের মধ্যে এমনি করে তছনছ করে দেবে তা ভাবে নি। প্রতিমার অনভ্যস্ত মন শিউরে ওঠে। নিজেকে ওই দানবটার হাত থেকে—মুক্ত করার চেষ্টা করে। হাঁপাচ্ছে প্রতিমা; চঞ্চলের মুখে তীব্র একটা গন্ধ, ওর মনের সব পাপ সেই গন্ধে ফুটে উঠেছে।—চঞ্চলদা!···

নিজেকে প্রাণপণ চেষ্টায় মুক্ত করে নিল প্রতিমা। অস্ফুট কণ্ঠে প্রতিবাদ করে।

—ছিঃ! কি আপনি!

চঞ্চল হাঁপাচ্ছে, তার নিজের বিবেক আর চেতনার অগোচরেই কি একটা অন্যায় করে ফেলেছে সে। অন্যায়ই। সামাজিক রীতি শালীনতা নীতির চোখে এটা অন্যায়।

সেই মাতাল মনটা তবু থামে না। সে যেন কানে কানে বলে এ স্বাভাবিক। তবু প্রতিমার মধ্যে কি একটা নীরব ব্যক্তিত্ব দেখেছে চঞ্চল। হাসতে গিয়েও পারে না। সব শুভচেতনাকে সে ব্যঙ্গের হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। আজ চেষ্টা করেও পারল না। তার মনের গহনে কোথায় তাহলে পাপ পুণ্য বোধটাও লুকিয়ে ছিল, এই সুযোগে সেটা মাথা তুলেছে।

দুজনে বাড়ির পথ ধরে। রাত হয়ে গেছে।

মিল এরিয়া। ওদের জীবনযাত্রায় উচ্ছলতা থাকে—রাস্তায় লোকের ভিড় থাকে রাত দশটা অবধি। দশটার ভোঁ পড়লেই ওরা যে যার ঘরে ফেরে বিছানায় যায়। কাল ভোরের ভোঁ পড়লেই আবার কাজ সুরু করতে হবে।

রাস্তায় দুএকজন ঘরে ফিরছে। ওদিকে পাটকলের কুলি বস্তি থেকে ঢোলের শব্দ ওঠে! ওদের গান তখনও পুরোদমে চলছে। প্রতিমা গম্ভীর হয়ে গেছে। চঞ্চলের নিজের কাছে কেমন বিশ্রী লাগে। ওরা দুজন যেন দুটি বিভিন্ন সত্তা। অন্তরের দিক থেকে দুজন দুমুখী।

চঞ্চলের মনে হয় প্রতিমার মনের লোভটাকে আজ দেখেছে সে। সেও পুরুষকে তার দেহ তুলে দিতে যদি জানতো সে তাকে আশ্রয় নির্ভর সবকিছুই দেবে।

সে ক্ষমতা তার নেই। চঞ্চল নিজের মক্ষিকা মনকে কোনদিন তার নিজের ভুলেই বন্দী করে ফেলেছে।

—প্রতিমা !

প্রতিমা সাড়া দিল না। মনের ভিতর একটা চাঞ্চল্য তখনও উতরোল করে তুলেছে তাকে। চঞ্চল ওর চোখের দিকে চেয়ে চোখ নামালো। ও বুঝেছে প্রতিমার মনের দুর্বলতা, রাগ সেখানে রয়েছে। রয়েছে অপমানের জ্বালা। কিন্তু সেটার দাম কতখানি তাও সে জানে। ও শুধু লাভ ক্ষতিরই হিসাবই খতিয়ে দেখেছে।

বাড়িতে একটা স্তব্ধতা জাগে।

কল্যাণী ভাবছে। দুজনে বের হয়েছে এখনও ফেরে নি। সুষমার মনের কোণেও একটা কথা উঁকি দেয়; নীরব একটা ভাবনা। দাদার কথাগুলো সুষমা ভেবেছে। সমীর চঞ্চলকে চিনেছে, আজ সুষমার মনে হয় চঞ্চলের মনের অতলে একটা দুর্বার পাশব প্রবৃত্তি আছে। যে সবকিছুকে গ্রাস করে নিয়ে নিজেই শুধু বাঁচতে চায়। ওর কাছে নিজের সত্ত্বাটাই নিজস্ব তৃপ্তি আর স্বার্থই বড়ো।

তাই তার জীবনে কোন আদর্শ নেই, সব নীতিবোধকে সে পায়ে দলিত করেছে, নিজের বিবেক দংশন সে ভুলতে চেষ্টা করে মদের নেশায় মাতাল হয়ে।

কোন নারীই তার জীবনে বেশীদিন টিকে থাকতে পারে নি। মেয়েরা চায় পুরুষের মধ্যে আশ্রয় আর নির্ভর। তাই নীতি বিবেক অনুশাসন ঘর—এসবের বন্ধন। যে পুরুষ বেপরোয়া—আত্মসুখী—সে কোনদিন ওসব মানে না। তাই স্থিতিশীল মেয়েদের ও জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলে।

…প্রতিমাও তার বোন। রূপের দিক থেকে তার নেশা এমন অনেক বেশী। সুষমা নিজের চেহারাটা দেখেছে। অনেক কুশ্রী হয়ে গেছে সে। অন্তরের দিক থেকে যার বাঁধন নেই, তাকে বাঁধা যায় বাইরের রূপের নেশায়। সেদিক থেকে আজ সুষমা হৃতসর্বস্ব। শুধু জোর তার ওই চঞ্চলের সন্তানের মা হতে চলেছে। কিন্তু ভয় হয়, যে কোনকিছুই মানে না তাকে সন্তানের দুটো ছোট্ট হাতের বাঁধন, আর ভাষাহীন অস্ফুট কাকলি থামাবে কি করে।

নিজের জন্য যে আসছে তার জন্য আজ সুষমার সাবধানী মন কেমন ভাবনায় পড়ে। কল্যাণী বলে।

—তুই খেয়ে নে সুষি, শরীর খারাপ। রাত করিস না।

সুষমা বলে আসুক ওরা একসঙ্গেই খেতে বসবো।

সমীর ওঘরে পড়ছিল, কল্যাণীর ডাকে বের হয়ে আসে। মা ভাবনায় পড়েছে

—একটু ওদের দেখ না বাবা !

সমীর বলে কোথায় দেখবো ! ছবি তো শেষ হয়ে গেছে।

সুষমাই বেশ কঠিন স্বরে বলে।

—থাক দাদা, তোকে আর যেতে হবে না। কোথায় খুঁজবে রাত দুপুরে !

নিজের উপরই রাগ হয়। সমীরের কথাগুলো মনে পড়ে, মনে হয় ও সা

লেছিল। চঞ্চলকে চেনে, তাই বোধ হয় সে তার এই ভুলটাকে স্বীকৃতি দিতে য় নি।

ওরা ঢুকছে সুষমা স্তব্ধ সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওদের দিকে। প্রতিমার সা মুখে রক্ত যেন জমাট বেঁধে আছে, কি উত্তেজনার আবেশ তখনও তার মুখে চোখে। সুষমার সেটা দৃষ্টি এড়ায় না।

চঞ্চলের দিকে চাইল। মনের সেই পাশবিকতার ছাপে সব উত্তেজনা ঢেকে গেছে। সে স্বাভাবিকই। শুধু চোখ দুটো কেমন চকচক্ করছে মাছের চোখের তো, গালে একটু সতেজ ভার।

সুষমা চমকে ওঠে। কাছে আসতেই টের পায় মদ খেয়েছে সে। পা দুটো একটু টলছে। রাগে লজ্জায় সুষমার চীৎকার করতে ইচ্ছে করে। দাদার দিকে চাইল। সমীর ব্যাপারটা দেখেছে, তার কাছেও ভালো বোধ হয় নি। তবু সরে গেছে সে।

কল্যাণী এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। তার মনে আবার শান্তি ফিরে এসেছে, ওরা এসেছে। তিমিরের চাকরি হয়ে গেছে। সবদিকই ঠিক আছে তার সংসারে। বলে কল্যাণী।

—হাত মুখ ধুয়ে নাও চঞ্চল, প্রতিমা কাপড় চোপড় বদলে নে। রাত হয়ে গেছে। খাবার জায়গা করছি।

প্রতিমা মায়ের কথাটা যেন শোনে না, দিদির চাহনির সামনে আজ বিব্রত বোধ করে সে। তার মনের অন্যায়টা ওর কাছে বোধ হয় পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। সেইতো নিজে উপযাচক হয়ে আজ বের হয়েছিলো চঞ্চলকে নিয়ে। প্রতিমার কাছে দিদির ওই চাহনিটা বিশ্রী ঠেকে। দিদির মনের স্বার্থপর নীচ মনটা তার কাছে াজ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। প্রতিমা জানে ও কি ধারণা করে নিয়েছে। প্রতিমা ার নিজের দোষ মুক্ত করার দাবি নিয়ে সত্যি কথাটা জানালেও দিদি হয়তো শ্বাস করবে না। তাই সরে গেল ওঘরে। সুষমা চাপা স্বরে শাসায় লকে।

—লজ্জা করে না তোমার? এখানে এসেছো ওই সব গিলে। মা দাদা কি বেলো বলদিকি? কোথায় ছিলে এত রাত অবধি?

চঞ্চল চকিতের মধ্যে কঠিন হয়ে উঠতে গিয়েও কি ভেবে থামল। জবাবই দিল ওর কথার। চঞ্চলের আগেকার সেই স্বরূপটা ক্রমশঃ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। টাকে সে এতদিন ভুলেছিল। সুষমার দিকে চাইল।

একটা বাজে চেহারার মেয়ে, চঞ্চল চুপ করে একটা নড়বড়ে চেয়ারে বসে সিগ্রেট ালো, দেশলাই-এর আগুনের আভায় দেখা যায় ওর মুখের সব কমনীয়তা পরিণত য়েছে কাঠিন্যে, চোখ দুটো মাছের আঁশের মতো বিবর্ণ আর ঘোলাটে।

সুষমা যেন নোতুন একটা মানুষকে দেখেছে।

চঞ্চলের মনে হয় ও একটা বিশ্রী মেয়ে মানুষ। এতদিন ওকে দেখে ভুলেছি ঘর—সতীত্ব—স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা সবকিছু তার কাছে অর্থহীন বলে মনে হ ও শুধু নিশ্চিন্ত স্বার্থপর জীবন যাপনের জন্য মেয়েদের মনগড়া বাঁধন, তাই দিয়ে পুরুষকে বাঁধতে চায়।

নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে ওরা নিমেষের মধ্যে বদলে যায়, ক্ষেপে ওঠে ফণাতোলা সাপের মতো তীব্র বিষজ্বালা নিয়ে ছোবল মারে। সুষমা তাই আ তাকে ঘৃণা করে—আঘাত করে।

এখানের পরিবেশে তার ভালো লাগে না। সমীরের সেই নীতি-কথাগুলো সুষমাই আওড়ে চলেছে।

—ঘর সংসার করেছো, এইবার একটু ভদ্রলোক হও।

বারুদের স্তূপে দেশলাই কাঠি জেলেছে সুষমা। দপ করে জলে ওঠে চঞ্চল

—ভদ্দর লোক! সব্বাই ভদ্দর লোক—ছোটলোক শুধু আমিই না?

সতীত্ব! কতবড় সতী সব আমার জানা আছে।

—কি বলছ যা তা? সুষমা চমকে ওঠে। তার মুখেই যেন প্রচণ্ড এক আঘাত করেছে চঞ্চল। সেও জীবনে অনেক অপমান সয়েছে। স্বামীর ঘর করেছি অনেক আশা নিয়ে, কিন্তু সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়। বিতাড়ি বিড়ম্বিত জীবনে কোন আশ্রয়ই দিল না, ওই চঞ্চলই তাকে স্বীকৃতি সম্মা দিয়েছিল। আজ তার নারীত্বের সব সাধ পূর্ণ হতে চলেছে। তবু কোথা নিজেকে মনে হয় অত্যন্ত অসহায়। ওর স্বভাবের সেই পরাজিত দিকটাকে লক্ষ করেই কথা বলেছে চঞ্চল।

চঞ্চল ওকে আঘাতই দিতে চেয়েছিল!

চুপ করে যায় সুষমা। চঞ্চল ওকে দেখছে। ওর মুখখানা বিবর্ণ পাংশু হয়ে গেছে। চাপা রাগ আর অপমানে ফুলছে সুষমা। হাসে চঞ্চল।

—তাই বলছিলাম দুনিয়াতে সবাই নলচে আড়াল দিয়েই তামাক খায়, এ নিয়ে এত কচকচি কেন?

যা হচ্ছে হোক। শুধু দেখবে যেন ঠকে না যাই ব্যস!

—ইতর! তুমি!

সুষমা ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে—সামনে প্রতিমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। ও চোখে মুখে সেই কাঠিন্য মুছে গিয়ে তাতে সহজ একটা ভাব ফুটে উঠেছে।

হাসছে সে। দিদির কথাগুলো শুনেছে, চঞ্চলের জবাবটাও কানে গেছে।

প্রতিমা না শোনার ভাণ করে বলে।

—খাবার দিয়েছে, চলুন চঞ্চলদা, চল দিদি।

সুষমার খেতে মন নেই। তবু প্রতিবাদ করে কেলেঙ্কারী বাড়াতে চায় তাই এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে।

ওদের কথাগুলো শুনেছে আর একজন, সে সমীর। তার ছোট্ট ঘরে পড়ছিল
'। দর্শনের একটা বই মাঝে মাঝে মনের চিন্তা আর সমস্যাগুলো জট পাকিয়ে
য়, তার কার্য কারণ সম্বন্ধে যখন কোন থই পায় না তখন পড়ে ওই বই ক'খানা।
শোপেনহাওয়ার আর নীট্শে পড়ছিল। বারবার পড়েছে ওগুলো।
াপেনহাওয়ারের মনে মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে, তার
ঃখ নৈরাশ্যবাদের মূল কারণগুলো অনুসন্ধানও করেছে। মনে হয় অবচেতন
নর গহনে যে ব্যথা আর বেদনা শৈশব থেকে লুকিয়ে থাকে সেগুলো মানুষের
বিষ্যৎ জীবনে কোনদিন মুছে যায় না। তার সব কর্মজারা চিন্তাধারাকে প্রভাবিত
র; নীট্শের সেই সুপারম্যানের তথ্য আংশিকভাবে সত্য, নীট্শের দর্শনে
পারম্যান হবার পটভূমিকায় সামাজিক বিবর্তনটাকে ধরা হয় নি, সেটা কতখানি
লাবে তার নির্দেশও ছিল না। তাই সুপারম্যান ছাড়া—আরও অনেক দিকের
কৃতম্যান গড়ে উঠছে।

আজকের চিন্তাধারার বিকৃতি জীবন সম্বন্ধে হতাশা আর লোভ তার সঙ্গে
শবের বিকৃত চেতনা সব মিশে বিচিত্র একটা মানসিক অসুস্থতা রোগ দেখা দিয়েছে,
র পরিণতিই বোধহয় ওই চঞ্চলের মতো শ্রেণীর। ওরা বড় হতে চায়—সে বড়
বার কেন্দ্রে রয়েছে লালসা—স্বার্থপরতা আর পাশবিক লোভ। নিজেকেই একমাত্র
লবাসে তাই তার নিজের তৃপ্তির জন্য কোন কাজকেই তারা পাপ বলে না।

সুষমার কথা মনে হয়। দুঃখ ও পাবে। কিন্তু তরে চেয়ে দুঃখবোধ হয়
ঞ্চলের জন্য। ও জানে না নিজের চারিদিকে কি সর্বনাশের প্রাচীর গড়ে
লছে সে।

চঞ্চলের হাসির শব্দ কানে আসে। প্রতিমা আর সে হাসছে। দেখা যায়
ষমা মুখ নিচু করে খেয়ে চলেছে ওপাশে। সমীর আবার পড়তে থাকে। আজ
প্তাহের একটা দিন সে পাটকলের মিস্ত্রী নয়। ভদ্দরলোক পড়াশোনা করিয়ে
নুষ।

···তাই ওসব কথা ভাবে।

চঞ্চল এবাড়িতে রাত্রিবাস করে না। তাছাড়া ওবাড়িখানি পড়ে আছে চাকরের
িম্মায়। রাতে কেউ না গিয়ে থাকলে হয়তো চুরি চামারি হয়ে যাবে। তাই চঞ্চলই
চ্ছে! কল্যাণী সুষমাকে যেতে দেয় না। বলে।

—এ অবস্থায় রাত-বিরেতে তুই আর যাস না। কাল সকালেই যাবি।

চঞ্চল এবাড়ির পরিবেশ থেকে বের হয়ে খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।
মাই আলোটা দেখিয়ে দেয়। চঞ্চল ওর দিকে চাইল না, প্রতিমার মুখে যেন
ট নেশা লাগানো হাসিটুকু তখনও লেগে আছে। ওর সেই বাধা দেওয়া মন
ড়তে এসে আবার সহজ হয়ে উঠেছে, ভালো লাগে চঞ্চলের। নেশা লাগে।

রাত হয়ে গেছে।

সহরের সীমান্ত। স্টেশনের ওদিকে যেতে হবে তাকে। লেভেল ক্রসিং হয়ে। আশেপাশে ছড়ানো সাইডিং লাইনগুলো—মাঝে মাঝে একচোখ আলোগুলো আশপাশ থেকে খানিকটা আলোর আভাস এনেছে কালো সমা ওই লাইনগুলোর উপর। মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা। চারিদিক হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ আসে—অন্ধকারে দু একটা গুলীর কানে আসে।

থমকে দাঁড়াল চঞ্চল।

জানে মালগাড়ির দরজা খুলে রাতের অন্ধকারে মালপত্র চুরি হয়ই ওটা নৈমিত্তিক ব্যাপার। সহরের অর্থনীতিতে ওদের দানও অসামান্য। অন্ধ ছায়ামূর্তির দল ছুটে চলেছে।

চঞ্চল এদিক দিয়ে স্টেশনের কাছে এগিয়ে যায়।

ওপাশে রিক্সা স্ট্যান্ড। ছেলেগুলো রিক্সা ছেড়ে দিনের রোজকারের পয় জুয়া খেলছে, ওদিকে কোন দল গাছের আবছা আঁধারে বসেছে চোলাই মদ নি দু একটা বাজে মেয়েও ঘোরাঘুরি করে, তাদের দু এককলি গানের সুর ও ইশারা করছে তারা ওই খদ্দেরদের।

অন্ধকারে মোটর বাইকের শব্দ ওঠে, একচোখ মেলে গাড়িটা তাকে দেখে দাঁড় তিনকড়ি স্বয়ং। ওকে দেখে লেব।

কোথায় চলেছো গুরুদেব ?

চঞ্চল ওর দিকে চাইল। তিনুর মুখে চোখে উত্তেজনা। জানে ও কোন গিয়েছিল, ওর অভিযান বোধহয় আজ ব্যর্থ হয়েছে। তিনু গজগজ করে।

—শালা সবাই সাধু বুঝলে। গোলমাল হলেই ব্যস ! তখন ডাঁট ! (একদিন শালার ডাঁট ভেঙ্গে। খতম করে দোব।

চঞ্চল হাসে। তিনকড়ির রাগটা বোধহয় ওই রেলওয়ে পুলিশের উপর তিনুর মেজাজ ভালো নেই। বলে।

—চলো গুরু। একটু মেজাজটা ঠিক করে আসি। ভালো জিনিষ আছে।

ওর ভাঁড়ারে ভালো মালই থাকে। তবু চঞ্চলের ভালো লাগলো না আজ। ব রাত হয়েছে, বাড়ি যেতে হবে।

হাসছে তিনু—হাসালে গুরু ! এসবে অরুচি হলে লেখাই যে পানসে হ যাবে। তুমিও সাধু হবে নাকি ? এ্যাঁ।

—শরীরটা ভালো নেই। অন্যদিন হবে।

চঞ্চল ওকে এড়াতে চায়। পা দিয়ে স্টার্টারে একটা লাথি মেরে তিনু ম রাগটাকে ইঞ্জিনের গতিবেগে সচল করে তুলে এক ঝলক পোড়া পেট্রলের রাশ (বের হয়ে গেল।

তখনও দাঁড়িয়ে আছে চঞ্চল। মনে হয় গেলেই ভালো করতো। ওর মনেও
য়নি একটি নিঃসঙ্গ নির্জনতা কালো ছায়ার মতো ঠেলে উঠছে।

নির্জনতাকে তার ভয় লাগে। মনে হয় সে হারিয়ে গেছে কোন অতল
ধকারে—সেখানে শুধু বিভীষিকার রাজ্য।

শেষ গাড়িটা ঢিমেতালে আসছে কলকাতা থেকে। ঝড়তি পড়তি সহরের কিছু
তল প্রাণী এতে ফেরে। অনেকে দিনের আলোয় বের হয় না—তারাই ফেরে এই
চন্দ্রপুরে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে।

ওদের অনেককে চেনে চঞ্চল। তবু আজ মনে হয় নিজের সেই অভ্যস্ত
। পথ থেকে সে অনেক দূরে সরে এসেছে। রাতের অন্ধকার নির্জনে নিজের
হুরের সাল তামামি হিসাব করতে ইচ্ছা হয়। কি করেছে সে? নোতুন
থা! তেমন কিছু হয় নি। লিখেছে মাত্র—তাও সমাদর পেয়েছে আগেকার
তির জোরে। অন্ধকারের অতলে হতাশাময় জীবনকে আজ সে ভয় করে, তার
র্ঘ রূপের মাঝে যে প্রচ্ছন্ন বেদনা আর সত্য আছে তাকে এড়িয়ে গিয়ে
জ ভদ্রলোক হতে চেয়েছে, সমাজে সতীত্বের—কর্তব্যের সুনাম কিনতে
য়েছে।

কিন্তু তার লেখার কোন নোতুন রূপ তাতে আসে নি। শুধু প্রকৃতির বর্ণনা
মানুষের মধ্যে সৎ হবার নীতি-কর্তব্য। মহা—মানবিক চেতনা এরই মহত্ত্ব
না করেছে। ব্যাটা ভণ্ড! মানুষ আর ভদ্দর লোক আছে?

…নিজেরই কাছে নিজের মনে হয় একটা মেয়ে—যার জন্য এই দোভাব অবলম্বন
রছিল—সেই কিনা আজ তাকে জানোয়ার মাতাল বলেছে।

খুব চড় খেয়েছে যাহোক! শরীরের সারা শিরা উপশিরায় একটা তৃষ্ণা অনুভব
র। তিনুকেও ফিরিয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ ওই অন্ধকার গাছতলায় কেষ্ট রিক্সাওয়ালাকে দেখে ইশারায় ডাকল।
লের মনে একটা তৃষ্ণা!

কেষ্ট ওর চেনা। কাছে আসতে চঞ্চল পকেট থেকে দু'টাকা বের করে দিয়ে
রায় দেখায়।

—একটা ছোট এনে দে!

কেষ্ট হাসে।…রিক্সার সিটের তলা থেকেই বোতলটা বের করে দিয়ে বলে।
নম্বর আছে!

তাই শুধু খুলে ঢক ঢক করে খানিকটা গিলতে থাকে চঞ্চল। আবার ভণ্ডামি
। শিলমোহর দেওয়া হয়েছে বোতলের মুখে,—থু থু করে সেগুলো মুখ থেকে
ল আরও খানিকটা গিলে—বাকীটা ওর হাতে ফেরৎ দিয়ে চঞ্চল এগিয়ে যায়;
তর বাতাসে বেশ তর হয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে সেই মনের অতলের জ্বালাটা কমে আসে, বোধহয় ভাববার সামর্থ্যটা

স্তিমিত হয়ে আসে, তাই ভুলে যায়। চলেছে তর হয়ে। হঠাৎ কার তীক্ষ্ন হাঁ
শব্দে থমকে দাঁড়াল চঞ্চল।

—তুমি!

তখনও হাসছে মেয়েটি। ওর হাসির ধমকে গা থেকে খসে পড়ে শাড়ি
সস্তাদরের আর্ট সিল্কের শাড়ি। লাল ব্লাউজটাও অস্বাভাবিক ভাবে ছোট, বু
রেখাটা পরিস্ফুট, কোমরের খানিকটা চকচকে মাখনের মত মাংস উৎকটভাবে
হয়ে আসছে।

চঞ্চলের নেশালাগা মন দেখছে ওকে। তার দেহমনের ক্ষুধাটা কেমন জা
হয়ে ওঠে। নির্জনরাস্তা—রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে মাঠের দিক থেকে। নিঃ
রেলকলোনী। ক্লান্ত ইঞ্জিনের আর্তনাদ কানে আসে, দূর আকাশে লাল
মেলে রয়েছে মিলের চিমনীর মাথায় সাবধানী আলো। মনের মাঝে ধীরে ধ
চঞ্চল তার আগেকার দুর্মদ বাঁধ ভাঙ্গা সেই সত্বাকে খুঁজে পায়।

—করুণা! তুমি!

করুণা ওর জড়িত কণ্ঠস্বর শুনেছে, দেখেছে চঞ্চলকে পা দুটো টল
লাইটপোস্ট ধরে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। দুটি জীবনের দুই ধ্বংসস্তূপ। কর
অনেক আশা নিয়ে বাইরের জগতে বের হয়েছিল। সেদিন তার নোতুন যৌ
স্বপ্নভরা চোখের সামনে দেখেছিল ওই চঞ্চলকে। তার অতৃপ্ত মন মাথা তুলেছিল
ওকে পেতে চেয়েছিল।

কিন্তু ওই চঞ্চলকে সেদিন চেনেনি পুরোপুরি। নিষ্ঠুর বিবেকহীন মানু
তাকে অতৃপ্ত নেশাভরা জগতের সন্ধানই দিয়েছিল, তার দেহমনে আগুন জেলেছি
কিন্তু সার্থক হতে পারে নি। ওর সব কিছু ঠকিয়ে লুটে নিয়ে ভোগ ক
করুণাকে ছিবড়ের মত দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

পূর্ব রাগ আর দুঃখে সে শুধু জলে আর জলেছে।

দেখেছে চঞ্চল ঘর বেঁধেছে ওই ঘরভাঙ্গা এঁটো মেয়েটাকে নিয়ে। দেখে
সেদিন সুষমাকে, মা হতে চলেছে সে। ঘর বেঁধেছে—বাড়ি করেছে চঞ্চ
লেখার ব্যাপারেও নাম হয়েছে, অর্থও পেয়েছে। সব দিক থেকেই সু
হয়েছে সে।

কিন্তু করুণা!

ধাপে ধাপে নীচেই নেমে গেছে। সেই আগেকার চাকরিটা রাখতে পারে নি
কিছুদিন করেছিল। কিন্তু ক্রমশঃ অনুভব করে ওই চাকরিতে তার পোষাবে না
হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। তারপর দায়িত্বও আছে। আর আছে উৎপাত। অনেকে
নজর এড়িয়ে বেঁচে থাকা যায় না। ক্রমশঃ সেও কিছু লোককে খেলাতে শু
করলো।

প্রথমে ভেবেছিল ওই করলে বোধহয় ওরা সরে পড়বে। কিন্তু খেলার নে

মেতে উঠলে তার থেকে ফেরা যায় না। জালে জড়িয়ে পড়েছে সে। কাঁচা টাকাও আসছে। নিজের দেহটাকে ঘিরে একটা অন্য জগৎ আছে—সেই অন্ধকার জগৎটাকে অনুভব করে সে। উন্মাদনাময় জগৎ।

এমনি করে পরিশ্রম করতে হবে না। এত উৎপাতও সইতে হবে না। নীতি ধর্ম এটা।···বিবেক ওসব মনে হয় তুচ্ছ সংস্কার। তাদের অফিসের অন্যতম কর্তা মিঃ চোপরাই ক্রমশঃ তার শিকারে পরিণত হয়।

করুণা দেখেছে এখানে ভয় করে থাকলে ওরা শাসাবে কিন্তু নীতি কর্তব্যনিষ্ঠা ইত্যাদির শাসনটাকে যেদিন ভাঙ্গতে পারে সেদিনই সে দেখে বিচিত্র এক আদিম জগৎ। এখানে নারীই সব।

পুরুষকে সে তখন হাতের মুঠোয় নিয়ে আসে।

মিঃ চোপরাকেই বধ করেছিল সে। আপিসে এ নিয়ে হাসাহাসি হয়। চোপরার ঘরে মাঝে মাঝে যায় করুণা, কাজের চেয়ে অকাজের কথাই বেশী হয়। একদিন চোপরাই বলে তাকে।

—আপিসের কাজ ছেড়ে দাও। এখানে তোমাকে মানায় না।

করুণা অবাক হয়—তাহলে চলবে কি করে?

—এখানের থেকে অনেক বেশী টাকা পাবে। সব ব্যবস্থাই করে দোব।

··· আবার অন্ধকার জগতে পা বাড়ালো করুণা। সেদিন তাকেও নেশায় পেয়েছিল। হোটেল-বার এর রাতের জীবনের উন্মাদনা অফিসের এই কড়াধাতের জীবন আর মুখ বুজে কাজ করার পরিবেশ থেকে আলাদা। এখানে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। বাইরের ওই রাতের জীবন তার কাছে আরও আনন্দময়। টাকার ভাবনা নেই। ওখানে টাকা হাওয়ায় ওড়ে।

প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের নির্জন পরিবেশে সবুজ গাছের দুএকটা এখনও আছে। মাটিতে ঘাস বুনেছে ওরা অনেক পরিশ্রমে। চোপরার ফ্ল্যাটেও যায় মাঝে মাঝে। করুণা দশটা পাঁচটার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে। তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে একটা ফ্ল্যাটের।

····· সব আশা কোনদিকে মরিচীকায় মিলিয়ে গেল। চোপরা ক'মাস পরই কি কারণে বদলি হয়ে গেল এখান থেকে সুদূর বোম্বাই-এ। এখানের অপিসে নানা কথা উঠেছিল। করুণা হঠাৎ আবিষ্কার করে তার পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। মদের নেশাটা তখন রপ্ত করে তুলেছে। নিজেকে এমনি করে একটা বিরাট পাহাড়ের শেষ সীমায় অতল খাদের সামনে এনে দাঁড় করাবে তা ভাবতে পারে নি। ওর রক্তে তখন মাতন—পথ তখন অনেক আগেই হারিয়ে গেছে, ফেরার পথও নেই।

সেদিন মাতাল হয়ে কি সব গালিগালাজ করেছিল চোপরাকে—সেই তাদের বিদায়ের রাত্রি।

তারপর! তারপরও সেই পথচলা থামে নি। করুণার কথা তখন অনেকেই জানে। তার চালচলন বেড়ে গেছে, একটা বিদ্যাই সে শিখেছে সে ওই ভেসেযাওয়া। দুর্বার স্রোতের সামনে দাঁড়িয়ে আজ মনে হয় করুণার এছাড়া পথ তার নেই।

·····কটা বছর চলেছে এমনি করেই। মনে মনে তাই নীরব একটা জ্বালা পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। চঞ্চলকে সে ভুলতে পারে নি, তার জীবনে ওই মানুষটিই একটি গ্রহ। তার সর্বনাশ করেছে সে। অথচ নিজে সুখী হয়েছে খ্যাতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সংসার বেঁধেছে।

ফিরছে করুণা। দুপুর বেলায় বের হয়—তার আস্তানার দিকে। একটা ঠাঁই তার আছে। দিনের আলোয় সে পাড়ার মানুষগুলো ঘুমোয়। রাস্তায় ঘাটে মানুষ যাতায়াত করে, পানের দোকানে ওরা কেনাবেনা করে, চায়ের দোকানে দু একজন পথচারী খদ্দেরপত্র চা খায়—চলে যায়।

সন্ধ্যার পর থেকেই এ পাড়ার ঘুম ভাঙ্গে। দোকানে দোকানে ওঠে মাংসরান্নার খোসবু। পানের দোকানগুলো জেগে ওঠে আলোর ঝলকে। বোতলে লেমনেড সোডাই নয়—আরও কিছু সতেজ পানীয় থাকে। রাস্তায় যারা আসা-যাওয়া করে তাদের সাজ মেজাজ আলাদা। বাড়িগুলোয় বাসিন্দারাও অন্য জাতের। করুণাও এসে আশ্রয় নেয়; তার ঘরখানাকে সে সাজিয়ে নিয়েছে নিজের মতো করে। বাড়িউলি মাসী ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—এত দেরী হলো তোর?

বাড়ির ঘরে ঘরে বাসিন্দা। কেউ এখানেই থাকে। তাদের সমাজে মুখ ঢাকা দিয়ে এখানে এসে অন্য জীবন যাপন করতে হয় না। তারা এইখানেরই লোক। করুণার মতো আগেকার জীবনের সেই মুখোসটাকে রোজই পরার দুঃসহ ভাণ করতে হয় না। করুণা নিজের ঘরে ঢুকে স্বল্প প্রসাধনপর্ব শেষ করে নেয়, বহু বল্লভা সে!

সেই ভেসে বেড়ানোর জীবনে তবু মাঝে মাঝে দু একজন আসে, তাদের ভোলা যায় না। জীবনের অনেক যুদ্ধে তারা ক্লান্ত; নির্জন নিঃসঙ্গ মানুষ।

অনেকে আসে শ্বাপদ লালসা নিয়ে, নিষ্ঠুর পশুর মতো মাংসল দেহটাকে ঠুকরে খেতে চায় শ্মশানে শকুনির মতো।

করুণা নিজের মনের অতলে মাঝে মাঝে একটা নির্জনতার আতঙ্ক ছায়া মেলে। সেও পথ হারিয়ে কোন নিঃসঙ্গ আদিম পৃথিবীর নীচে হারিয়ে গেছে। মদ খায়—নিজের সর্বনাশটাকে ভুলতে চায়।

বাড়ি ফেরে কোনদিন একটু আগে কোনদিন বা শেষ ট্রেনে। কোন কোন দিন ওইখানেই থেকে যায়। বাড়িতে বৃদ্ধা মা আর ছোট ভাই ওরা জানে দিদি কোন বান্ধবীর বাড়িতেই রয়ে গেছে। টুইশানি করে ফিরতে দেরী হলে সে রাতে ফেরে না।

হাসি আসে করুণার। টুইশানি—পড়ানো!

সব কেমন মিথ্যা কথা শেখায়। কেউ সেগুলো বিশ্বাস করে না। বই-এ লেখা থাকে—সদা সত্য কথা বলিবে। গুরুজনকে মান্য করিবে। চুরি করা মহাপাপ—ইত্যাদি।

……হাসছে করুণা। কেমন সব নীতি—সব বাঁধনগুলো মনে হয় আলগা হয়ে গেছে। ট্রেনে দেখেছে সুখী পরিবারকে। স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ের হাত ধরে কেনাকাটা করে ফিরছে। করুণা তার চোখের কোণে একটু হালকা হাসির আভাস এনেছে, ইচ্ছে করেই নিজের ওই যৌবন উছল দেহের একটু লাস্যের শুধু ইঙ্গিত দিয়েছে, দেখেছে সেই আদর্শ স্বামীর চোখে কি নেশার সাড়া।

মেয়েদের চোখেও দেখেছে সেই নেশা কোন অপরিচিত পুরুষের সামনে। সতীত্ব! হাসি আসে করুণার।

সবাই মুখ বুজে কেবল ভাণ করে চলেছে। সুখী হবার ভাণ—সতী হবার ভাণ—সৎ হবার ভাণ। দশ ভাণে গড়া এই সমাজটাকে সে আজ তার সব জ্বালা দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতে চায়।

হাসছে করুণা! তীব্র বিচিত্র সেই হাসি। ওই সাধু হবার ভাণ করা চঞ্চলের দিকে চেয়ে হাসছে। সংসারী মানুষ—বড় সাহিত্যিক…

—সমাজদরদী শিল্পী—স্রষ্টা!

—হাসছো তুমি!

করুণার হাসিটা চঞ্চলের মনে একটা জ্বালা আনে।

করুণা বলে।

—দেখছি মহাপুরুষকে! রিক্সাওয়ালার কাছ থেকে চোলাই মদ গিলছো—মেয়েছেলের সন্ধানে রাতের অন্ধকারে টর হয়ে পথে বেরিয়েছো, বেশ সুখে আছো না?

চঞ্চল করুণার দিকে চেয়ে থাকে। করুণা জড়িত কণ্ঠে শোনায়,—টাকা! কত টাকা আছে পকেটে?

চঞ্চল শুনেছে ওর কথা। ওর দেহ দুচোখ জানায় রাতের অন্ধকারের ওর সেই জীবনের গোপন কথা। চঞ্চলের নেশাটা যেন সরে যায়। মনের একটা অনুভূতি তীব্র হয়ে ওঠে। হঠাৎ মনে হয় করুণা ভুল করছে। শোনায় চঞ্চল।

—এত নীচে নেমেছো তুমি?

করুণা হাসছে। কথাগুলো নেশায় জড়ানো; খোঁপায় জড়িয়েছে একটা ম্লান রজনীগন্ধার মালা। চোখের কোলে কাজলটা একটু কালো—ক্লান্তির দাগই ফুটিয়ে তুলেছে। করুণাকে উপদেশ দিচ্ছে সে।

করুণা জবাব দেয়।

—তুমি বুঝি গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা দেবসেবায় লাগবে? নীতিজ্ঞান দিচ্ছ?

তবে তুমি বিয়ে-থা করেছো—সংসারী মানুষ, সুখী মানুষ। তুমি মদ খেয়ে রাতদুপুরে মেয়েমানুষ খুঁজছ কেন? ওয়াগন ব্রেকার ওই তিনুর সঙ্গে এত কি কথাবার্তা হয়?

—করুণা!

করুণা ওর আর্তকণ্ঠের ডাকে চমকে ওঠে নি। সহজভাবেই বলে,—পাপ! ওটা আজ হজম করে নীলকণ্ঠ হয়ে গেছি। তোমার সেই বাঁচার কথাটা—ভোগের কথাটা—দেহের নেশায় জড়িয়ে সারা মানুষের মনে লোভ জাগিয়ে তুলেছে; সমর্থন করেছো তাদের গোপন জানোয়ারের সেই মনটাকে। তুমি শয়তান। নিজের লোভ আর লালসাকে বলো সত্যানুসন্ধান। লজ্জা করে না। আমি দেহকে বেসাতি করি সমাজের এক গোপন কোণে, তুমি মনের কুৎসিত লালসাকে জাগিয়ে তোল তোমার লেখায়, মনের অতলে লুকানো পাপকে সমর্থন করো প্রকাশ্যে সত্য আর সুন্দরের সেবার ভাণ করে। কে বেশী পাপী তা মানুষই বিচার করবে একদিন।

চঞ্চল ওর কথাগুলো শুনছে। কেমন বিশ্রী লাগে—তার সম্বন্ধে এই সহজ উপলব্ধি তার ছিল না কোনদিন। নিজেকে চিনতে চায় নি। মনে হয় ওর কথাগুলো সত্যি। সে এমনিই একটা অপকর্ম করে চলেছে। নিজেকে ভুলেছে—শুধু লোভটাকেই টিকে থাকার একমাত্র বসে জেনেছে।

করুণা বলে দুচোখে নেশার কাঁপন তুলে।

—আমাকে ভালো লাগে না? দেহটাকে? এর দাম সামান্য কটা টাকা, এটাও তোমাকে দিয়েছিলাম, কিন্তু আরও দিয়েছিলাম তোমাকে, সেটা আমার মন ভালবাসা। আজ সেটার দাম তোমার সর্বস্ব দিয়েও তুমি দিতে পারবে না। সেটাকে তুমি হত্যা করেছো।

দেখছি সুষমাকেও এমনি করে টিপে পিষে মেরেছো, আরও অনেককে মারবে।

—করুণা।

—মারবে নাকি! দেহের শুচিতা নষ্ট করবে? সে ভয় আজ আমার নেই। তাই তোমার মত লোককে ভয় করি না, ঘৃণা করি। চোরকে সইতে পারি—ভণ্ডকে পারি না, ঘৃণা করি। আমার মত বেউশ্যেও ঘৃণা করে তাকে।

…করুণা চলে গেল পথ চলিত একটি রিক্সাকে ধরে। ওর কথাগুলো স্তব্ধ হয়ে শোনে চঞ্চল। ভাবছে। মনে হয় ওর সব কথাই জ্বালায় ভরা, তবু যেন সত্যি।

নিজেকে তার পথ থেকে কোথায় সরিয়ে নিয়ে গেছে চঞ্চল। কিন্তু এসবতো চায় নি। তার কাজের মধ্যে দিয়ে নিজের যন্ত্রণা আর মন্তব্যকেই বলতে চেয়েছে সেটা এমনি গাঁজলা হয়ে উঠবে জানে না। তার চারিদিকে আজকের পাপভরা মানুষগুলো তার সব চিন্তা ভাবনাকে বিকৃত করে তুলেছে।

সুষমাকে মনে পড়ে। জীবনে এতো সে চায় নি। অনেককেই মনে পড়ে—

তারা তার সারা মনে শুধু নেশা জাগিয়েছে। কান্তি মিসেস দে—ওই প্রতিমাও। বারবার কি অন্ধকার জগৎ তাকে হাতছানি দিয়েছে।

কিন্তু এতো সে চায়নি। কি দায় কোন্ দিকে তার পথ সে জানে না। শীতের হাওয়া লেগেছে চড় চড় করে হাত পা। মাথার মধ্যে একটা নিদারুণ বেদনা তাকে যেন চাবুক কসছে। চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে ষ্টেশনের দিকে চলে।

সে যেন তার কাছের অতীতের জীবনেই ফিরে গেছে। নিঃসহায় একটি তরুণ সব হারিয়ে পথে পথে ঘুরেছে, মনে তার দুর্বার জ্বালা। আজ সেই জ্বালাটাকে ভাবে অর্থহীনভাবে। আজ সে সন্ধান করতে চায় তৃপ্তি আর শান্তি। এখানে যে মন নিয়ে এসেছিল, সেই মন আজ হারিয়ে গেছে। সব আবার নোতুন করে পেতে চায় সে।

শয়তান। হয়তো সত্যি কথা! অনেক কিছু পেতে চেয়েছে সে; রাজ্যিজোড়া তার লোভ।

ভোর হয়ে আসছে।

ষ্টেশনের একটা বেঞে বসে আছে চঞ্চল। বাড়িও যায় নি। নেশার ঘোরে বার বার মনে হয়েছে পথটা হারিয়ে ফেলেছে। স্তব্ধ অন্ধকারের বুকে রাত্রির শেষ প্রহরের ক্লান্তি জেগেছে, দিনের আলোটুকু ওকে ঠেলে সরিয়ে ফুটে ওঠার পালা জুড়েছে। সুপ্ত পরাজিত রাত্রির বেদনা ফুটে ওঠে রাতজাগা ঘুমভাঙ্গা পাখীর ডাকে।

—বাবু যে গো?

শেষরাতের ট্রেনখানা আসতে দেরী নেই। চঞ্চল অবাক হয় রাতটা তার কেটে গেছে এইখানেই। কদমের ডাকে মুখ তুলে চাইল।

—ওমা! একি ঝুলঝাড়া চেহারা হয়েছে? সারারাত কি এইখানেই পড়েছিলে?

সন্ধ্যায় দেখেছিল ওকে একটি মেয়ের সঙ্গে কদম হাসছে। চঞ্চল বলে ওঠে—

—তুমি চললে কোথায়?

—গুরুদেবের পীঠস্থানে। দুহাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গীতে বলে।

—কেঁদুলিতে! বাউলের পীঠস্থান যে গো!

—তোর ঘাট দেখবে কে?

হাসে কদম—ওই শ্মশানের খাতাবাবু, দু'ঘাটেরই হিসাব রাখবে। শেষ খেয়াঘাটের আর আমার পারাপারির ঘাটের।

চঞ্চল কি ভাবছে। পথের সেই অতীত দিনের মানুষটাকে হঠাৎ আবিষ্কার করে সে। কি ব্যাকুল একটা সাড়া জাগে তার মনে।

—আমাকে নিয়ে যাবে?

তুমি যাবে? অবাক হয় কদম। ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—হাঁ! চল ঘুরে আসি ক'দিন।

কদম ওর দু চোখে দেখেছে কি নীরব বেদনা আর ব্যথা। ওর মনের ভিতরের সেই ঝড়ের মাতনের খবর সে জানে না। তবে মনে হয় ওর এই কথাটা অন্তরের ব্যাকুলতায় মাতানো। তবু হাসে কদম।

—তোমাকে নিয়ে যাবো—লোকে যদি কিছু বলে?

হাসে চঞ্চল।

—আমার সম্বন্ধে লোকে অনেক কিছুই বলে। সে ভয় আর নেই। অবশ্য তোমার যদি ভয় থাকে, সে কথা আলাদা।

কদমের এবার হাসি পায়। মিষ্টি একটু হাসি।···তার জীবন এসবে ভরা।

ওরা দুজনেই পথ হারানো ঘর ছাড়া দুটি মানুষ। সমাজ ওদের ইতিপূর্বে অনেক আখ্যায় বিভূষিত করেছে। তবু ওদের মাঝে মনের একটা কোথার যোগসূত্র আছে। সবাই জীবনের কক্ষ থেকে ছিটকে পড়া উল্কা। ওরা শুধু জ্বালায়—আর জ্বলে। কদম শুধোয়।

—বৌ জানে? এমনি করে পালাবার কথা?

চঞ্চল জবাব দিল না। সেই বন্ধনটাকেই বার বার মনে পড়ে। ভুলই করেছে সে। জবাব দিল চঞ্চল—আমি এমন পালাই মাঝে মাঝে।

—ঘর পালানো বাউল তাহলে—কিগো? কদম হাসছে।

সুষমার মনে কালো ছায়াটা ক্রমশঃ মনের সব মুক্ত উদার খুশিভরা আকাশটাকে কালো মেঘে ঢেকে ফেলে। সেই রাত্রিতে বের হয়ে গেছে চঞ্চল। প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিল সুষমা।

প্রতিমা দিদির দিকে চেয়ে থাকে।

তার মনের সব পাঁকটা ওর মুখে কুৎসিত বিবর্ণতা এনেছে। প্রতিমা ভেবেছিল তখনই, দিদি তাকে এতটুকু বিশ্বাস করবে না। হয়েছেও তাই।

প্রতিমা চঞ্চলকে বাধা দিয়েছে, তার ব্যবহারের প্রতিবাদ করছে।

এটা সুষমার কাছে মিথ্যা বলেই বোধ হয়।

রাতের বেলাই দুই বোনে একঘরে শুয়েছে। সুষমার সারা দেহমনে একটা অস্বস্তি। তার মাতৃত্বের গৌরবটুকু অসহায়ত্বে পরিণত হয়ে গেছে একটা সন্ধ্যার ঘটনাতেই। বলে সুষমা।

—তুই কেন গেলি ওর সঙ্গে?

প্রতিমা দিদির কথাগুলো সইতে পারে না। তাকে এমনি ভাবে অপমান করার কোন অধিকার দিদির নেই। বলে ওঠে প্রতিমা।

—যা বলবো কোনটাই বিশ্বাস করবে না, তহলে যা ভাবছো সেইটাই সত্যি বলেই ধরে নাও। এত যদি মনে পাপ আর অবিশ্বাস তাহলে মনে হয় গোপালবাবুকে ছেড়ে আসার মূলেও তোমার এইসব নীচতাগুলো ছিল।

সুষমার সারা দেহমন বিষিয়ে ওঠে।

সেই লোকটার কথা সে ভুলতে চেয়েছে, তার দেহটাকে নিয়ে নিষ্ঠুর একটা মানুষ মদ্যপ অবস্থায় রাতের অন্ধকারে ছিনিমিনি খেলছে। সেই যন্ত্রণাটাকে ভুলে আবার নোতুন করে বাঁচতে চেয়েছে সে, কিন্তু চঞ্চলও তাকে এমনি ইঙ্গিত করেছিল, আবার প্রতিমাও সেই জঘন্য কথাটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছে।

ওরা তার আড়ালে সুষমাকে ঘৃণা করে, অবিশ্বাসী নীচ বলেই ভাবে। সুষমা যা পেয়েছে সেটুকু যেন দয়া করে চঞ্চল তাকে দিয়েই, তাই নিয়ে এদের হিংসা।

চঞ্চলও সেই ভুলটাকে বুঝতে পেরে আবার মেতে উঠেছে নোতুন নেশায়। প্রতিমার কথায় সুষমা আর্তনাদ করে ওঠে।

—কি বলছিস্ তুই!

প্রতিমা রুখে দাঁড়িয়েছে চোটখাওয়া বেড়ালের মতো।

—আমাকে যা তা বলবে অপমান করবে, আর সয়ে থাকবার এতই যদি ভয় তাহলে সে পুরুষকে বাঁধবার যোগ্যতা থাকা উচিত ছিল! এত লোভ আর ভয় কেন বাপু?

প্রতিমা কথাগুলো ওর দিকে ছুঁড়ে মারে। সুষমা বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রতিমাই ঘোষণা করে বিনয়ীর মতো।

—রাত হয়ে গেছে, ও নিয়ে ভ্যাজোর ভ্যাজোর করো না। কাল ফিরে গিয়ে সব কথা তাকেই শুধিয়ো!

সুষমা সেই কথাটা ভেবেই চুপ করে গেল। প্রতিমা লেপটা মুখ অবধি ঢাকা দিয়েছে, মনে মনে খুশী হয়েছে তার কুমারী মন।

একটি পুরুষের মনে সে ঝড় তুলেছে। সব দিক থেকে একটা কথা তার পরিষ্কার হয়ে গেছে—ওদের দুজনের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দুজনের কেউ সেটাকে চিরস্থায়ী বলে ভাবে না। তাই এত ভয় ওদের মনে, দিদি তাই এত স্বার্থপর আর লোভী। সেই নিশ্চিন্ত আশ্রয় আর প্রাধান্যটা সে বজায় রাখতে চায়, ভালবাসা পরস্পরকে জানা-চেনার কথাটা সেখানে গৌণ। ওর কাছে ভালবাসা অর্থে ভালো একটা বাসা, এইটুকুই, এর বেশী আর কিছু নয়।

…সুষমা বাড়ি ফিরে ঘাবড়ে গেছে। চাকরটাই খবর দেয় বাবু কাল থেকে আসে নি। মাঝে মাঝে বইরে যায় চঞ্চল, দূর দূরান্তরে কোন সাহিত্য-সভায়, না হয় এমনি ঘুরতেও যায় এদিক ওদিকে। সেটা জানিয়েই যায়। কিন্তু এমনি করে না জানিয়ে উধাও হয়ে যায় না।

সুষমা ভাবনায় পড়ে। তার শরীর মন ভেঙ্গে পড়েছে। সেই রাত্রে কথাগুলো তাকে বলেছিল তিক্ত স্বরে, বেপরোয়া মানুষটা এক জায়গায় ধরা দেয় নি এটা বুঝতে পারে আজ। তার মনে তবু একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়, প্রতিমা তাকে সঠিক কথা বলে নি। তার মনেও পাপ ছিল, সেই-ই বোধ হয় প্রলুব্ধ করেছিল চঞ্চলকে। সেই লজ্জাটার জন্যে সে সরে গেছে কিছুদিনের জন্য।

কল্যাণী আসে খবর পেয়ে। সমীরও।

কল্যাণী বলে—খোঁজ-খবর কর সমীর।

—কোথায় খুঁজবো? তার ঘাঁটিগুলো তো আমি জানি না।

সাবই এসেছে, প্রতিমা আসে নি এবাড়িতে। সুষমার কাছে সেই না আসাটাই একটা রহস্য হয়ে দেখা দেয়। মাকে বলে সুষমা।

—প্রতিমাকে শুধিয়ো, ও যদি তার খবর কিছু জানে।

সমীর কথাটা শোনে মাত্র। জবাব দিল না। তিমিরের নোতুন চাকরি। সে কাজে চলে যায় সকালেই, ফেরে সন্ধ্যার পর। সমীরের তবু দিনে অবসর মেলে। সহরের ঘাঁটিগুলো খোঁজে। মদনের দোকানে—গোবিনের রেস্তোরাঁয়, তিনকড়ি-

শ্রীদামবাবুও জেনেছে চঞ্চলের উধাও হবার কথা।

তিনকড়ির সময় নেই, এবার ভোটে দাঁড়াচ্ছে সে। তার জন্য দৌড়-ঝাঁপ তো আছেই। তাছাড়া নানা কাজ তার। তবু বলে।

—যাঃ বাবাঃ গুরু ফেঁসেছে নাকি দ্যাখ আবার। ভোটের মুখে ভেবেছিলাম ক'টা গরম গরম বুলেটিন লিখিয়ে নোব বেশ সাহিত্য টাইত্যি নিয়ে, তা শ্লা শেয়ালের গুয়ে কাজ হলে শেয়াল তখন পম্বোতে হাগে।

ক্লিন্ কেটে পড়ল?

শ্রীদাম বলে গলা নামিয়ে।

—ওহে সমীর, তা একাই গেছে না কাউকে নিয়ে ভেগেছে মাইরী। ওই করুণা —নাকি, সেই যে ডব্‌কা ছুঁড়িটা— সেটা আছে কিনা খবর নিয়েছো?

সমীর সরে এল। চঞ্চলের বন্ধুবান্ধবদের কথাবার্তাই এমনি! সকলের ধারণাই এত নীচ, তবু ওরা পরস্পরকে বন্ধু বলে জানে। ভাবে বিচিত্র একটা সমাজের জীব হয়ে পড়েছে ওরা—কোথাও কারোও জন্য ভালবাসা-সম্মান সমীহ নেই। একপাল নেকড়ে শুধু একত্রে শিকারের আশায় বাস করে, সুযোগ খোঁজে কে কখন কার টুঁটি কামড়ে ধরবে।

করুণা অবশ্য নিজেই এসেছিল সেদিন খবর পেয়ে ওদের বাড়ি। সমীর ক'দিন যাওয়া আসা করছে। সুষমার এই অবস্থা—একা বোনকে ফেলে রাখতে ওর বিবেকে বাধে, খবরাখবর নেয়। ওর জন্য মায়া বোধ করে সমীর। তার কথাগুলো যে এত শীঘ্র সত্য হয়ে যাবে তা ভাবে নি। এতটুকু কর্তব্যবোধ ভালবাসা থাকলে এসময়ে চঞ্চল সুষমাকে এমনি করে আঘাত দিত না।

…করুণাকে আসতে দেখে অবাক হয় সমীর।

অনেকদিন পর ওকে দেখছে। শান্ত দুপুর। পথে লোকজন বিশেষ নেই। সাইডিং লাইন থেকে সাণ্টিং ইঞ্জিনের খস্ খস্ শব্দ আসে।

…দুপুরের রোদটা কেমন ম্লান উদাস। সুষমার শরীর ভালো নেই। বোধ হয় হাসপাতালেই পাঠাতে হবে।

ওকে ঢুকতে দেখে চাইল সমীর। করুণাও ওকে এবাড়িতে দেখবে ভাবে নি। তার নিজের অতীতটা যেন হঠাৎ তার সামানে সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে। ওর জন্যও কত সন্ধ্যা প্রতীক্ষা করেছে সে ব্যাকুলভাবে। সমীর অবাক হয়।

—তুমি !

করুণা এসেছিল সুষমাকে দেখতে। তার মনে আজ জ্বালা নেই। রাগই হয়েছে। চঞ্চলের উপর রাগ। সুষমা বোকার মতো ঠকেছে। মনে হয় জিতেছে করুণাই। জিতবেও সে। চঞ্চলের মতো মানুষকে আঘাত দিয়েই আনন্দ পায় সে। তাই খুশী মনে দেখতে এসেছিল সুষমার সেই পরাজয়।

কিন্তু সামনে সমীরকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে, নিজের অতীতের সেই শান্ত সোনালী মনের শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশ এখনও রয়েছে ওকে ঘিরে। আজ করুণার মনে হয় এই ক'বছর সে দুরন্ত জ্বালা বুকে নিয়ে ঘুরেছে আর নিজেকে তিলে তিলে পুড়িয়েছে—ধ্বংস করেছে কি নেশায়। আনন্দে নয় নেশায়—সর্বনাশা নেশায়।

সমীর এখনও তেমনি সহজ সুন্দর রয়ে গেছে। ওকে থমকে দাঁড়াতে দেখে সমীর বলে।

—সুষমা ভিতরে আছে।

অর্থাৎ তার সঙ্গে কোন দরকার—কোন কথা আর তার নেই। করুণা তবু জিজ্ঞাসা করে।

– ভালো আছো !

সমীর ওর দিকে চাইল। নিভৃত মনের কোণে একটু ফুরিয়ে যাওয়া সুরের অনুরণন ওঠে। একদিন সমীর নিঃশেষে ভালোবেসেছিল ওই মেয়েটিকে। অনেক স্বপ্নই রচনা করেছিল। কিন্তু কঠিন পৃথিবীর উত্তাপে সে সব শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে সেই সুরভি আজ অর্থহীন মিথ্যায় পরিণত হয়েছে।

জীবনে শুধু একটি গ্রহের মতো এসে পড়েছে এই চঞ্চল, ও যেন আজকের যুগের সব পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা, যা বার বার সমীরের মনের সব সুর ছিঁড়ে দিয়েছে। করুণার কথায় জবাব দেয় সমীর।

—ভালোই ! তুমি ?

হাসল করুণা। ওর দেহের উদ্ধত যৌবনকে ওর সামনে প্রকাশ করতে লজ্জা আসে, শাড়ীর আঁচল দিয়ে কাঁধ-বুক ঢেকে নেয় নিজের অজ্ঞাতসারেই। ম্লান হয়ে আসে চাহনি—নিজের সব পাপ আর ভুলের লজ্জাটা বড় হয়ে দেখা দেয়।

মনে হয় করুণার—সে নিদারুণভাবে হেরে গেছে। তবু জানায় ম্লান স্বরে।

—ভালোই !

সুষমা এসে দাঁড়িয়েছে ওর কণ্ঠস্বর শুনে। শুকনো বিবর্ণ চেহারা। দেহের সেই নোতুন সত্তাটা তার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে ওর মুখে চোখে···শীর্ণ দুটো চোখ।

করুণা সুষমাকে দেখছে। সুখী পরিবার! নিজের মনেই একটা বেদনা আসে—বিদ্রূপ নয়। সব নারীকেই চঞ্চল এমনিভাবেই ঠকিয়েছে। বলে করুণা।

—কথাটা শুনলাম। তাই খবর নিতে এসেছিলাম।

সমীর জবাব দিল না। তার বলার কিছুই নেই। হাসপাতালের চিঠিখান নিয়ে বের হয়ে গেল। সুষমা বলে।

—বোস। এলি কতদিন পর!

করুণা জানায়—আসার সময় কই সুষমা। আমরা যে সবাই হারিয়ে গেছি সব ভুলে গেছি।

সুষমা ওর দিকে চাইল। আজ মনে হয় ওরা সবাই একই অসহ্য যন্ত্রণা: ভুগছে, ওদের মনের সব সুন্দর এমনি করে মরে গেছে, ফুরিয়ে গেছে।

···তবু কোথায় এই মুক্তির অবাধ আনন্দ এখনও রয়েছে। লোভ আর অনে‹ বেশী চাওয়ার মধ্যেই আজকের যন্ত্রণা। চাহিদার ভিড়ে সুন্দর সহজকে ওরা হত্য করেছে। এরা তাকে বিরাট মুক্তির আনন্দ আপন করে পেতে চেয়েছে।

সংসার বলতে ওই কাপড়ের থলির দু মুখে দুটো গিট বেঁধে তাতেই একখান গেরুয়া পিরান-লুঙ্গি, আলখাল্লা, থলির অন্য প্রান্তে গিঁট বাঁধা সামান্য কিছ টুকিটাকি। হাতে একতারা আর ঘুঙুর বাঁধা, কোমরে বাঁধা ডুবকি।

মাটির রং এখানে গেরুয়া, ডাঙার প্রান্তে শস্যরিক্ত ধানক্ষেত। নীল আকা‹ এখানে মুক্ত। দূরে বিশাল অসীম শূন্যতার বুক চিরে ধূ-ধূ বালুচরের সংকেত অজয়ের রুক্ষ শূন্য বুকে মরা উলু বিন্না-ঘাসের বন—শরতের হাওয়ায় ওর পেতেছিল দিকজোড়া শ্বেত উত্তরী, আজ তা হারিয়ে গেছে শীতের ধোঁয়াটে আকাশে নীচে। তার ওপরে দেখা যায় সবুজ শালবন সীমা।

হাওয়া হাঁকে—ধুলো উড়ছে। গানের সুরগুলো মিলে মিশে ঐক্যতানের সৃ‹ করেছে। চঞ্চল পথ ভুলে কোন এক নোতুন রাজ্যে এসে পড়েছে।

—কেমন লাগছে গোঁসাই।

কদম একদিনেই মানুষটাকে চিনেছে খানিকটা। সেই রাত শেষের ট্রেনে ওরা উঠে এসে পৌঁচেছে পানাগড়ে, তারপর বাস-এর রাস্তা।

ভিড়ও তেমনি।

চঞ্চলের প্রথম অসুবিধা বোধ হয়।

—এতো ভিড়! উঠবে কি করে?

কদম হাসে—গাড়িতে চড়া অভ্যেস হয়ে গেছে না গো? তা প্রেমের দেবতা‹ তীর্থে পেঁছুতে গেলে কষ্ট একটু হবেই, গায়ে ধুলো কাদাও লাগবে। মানুষে‹ ভিড় এগিয়ে তো এপথে সাধন চলে না, তাই এত ভিড়। উঠে এসো।

ঠেলেঠুসে আগেই উঠল কদম। নিটোল স্বাস্থ্য—পথের ধকলে তার সে‹ চমকলাগা সৌন্দর্য তবু ঘসা কাঁচের মতো ঝলসে ওঠে।

—একটু সরে বসো বাবাজী! বসলো গোঁসাই!

তারই মধ্যেই কদম নিজে বসেছে—চঞ্চলকেও বসবার একটু জায়গা করে দেয়। খনও বাস ছাড়তে দেরী। ওরা ডেকে চলেছে।

—ইলামবাজার, কেঁদুলি—। জয়দেব!

বাসের মধ্যে ওই বাবাজী বোষ্টম বাউলদের সংখ্যাই বেশী। তারই মধ্যে ওরা জার ব্যবস্থা করেছে। বিশ্রী বিটকেল চিমসে গন্ধ ওঠে। চঞ্চলের এটা সহ্য করার ভ্যেস ছিল।

হাসে কদম—যে পুজোর যে মন্তর।

...বাসের যাত্রা সুরু হয়েছে। একটু গিয়েই বড় রাস্তা ছেড়ে শালবনের দিকে লল, ক্রমশঃ সুরু হয় শালবন সীমা। এককালে গভীরতর ছিল। ইতিহাসের কটি বিস্তৃত অধ্যায় গড়ে উঠেছিল একে কেন্দ্র করে। পাণ্ডুয়ায় তখন হোসেনশাহের ামল। গৌড়ের তিনিই সুলতান, সেই সেনাপতি লাউসেন—অন্যতম সামন্তরাজা ছাই ঘোষের রাজত্ব ছিল এইদিকেই।

বনের মধ্যে এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে ইছাই ঘোষের শ্যামারূপার মন্দির। আজও াকে বলে ইছাই ঘোষের দেউল। ঘন অরণ্যে চারিদিক আবৃত, এইখানেই ছিল ার গড়।

বাসটা চলেছে নানারকম শব্দ করে, তারই মধ্যেই ওঠে কলরব, কোন নোতুন াষ্টমীর নবপ্রেমাভিসার কোন তরুণ বৈষ্ণবের সঙ্গে। কেউ গান ধরেছে। সবাই ন সকলের চেনা। গাড়ির গতিবেগে আর ঝাঁকানিতে এ ওর গায়ে পড়ে, কোন য়ের গায়েই কে পড়ল ধাক্কার চোটে; হাসির সহজ ধারায় সেই মুহূর্তটা সজীব য়ে ওঠে।

কে ফোড়ন কাটে—জয় রাধে!

—বাবাজীর তো দেখছি নিবিড় রাধাভক্তি!

কথায় কথায় বাবাজী জবাব দেয়।

—ওই তো সার গো। সব ঠাকুরই ওরই সাধক, আমি তো নরাধম মাত্র।

...ক্রমশঃ মনে হয় চঞ্চলের এখানে সে এসেছে, কিন্তু কি এক নেশার ঘোরে এসে ড়েছিল; কিসের অন্বেষণে তা জানে না। ভালো লাগে নি তাই বের হয়ে সেছে।

কদমই আস্তানার সন্ধান করেছে। মেলা বলতে নদীর ধার ঘেঁসে জমা হয়েছে ষ্ণব আর বাউল আউল সাঁই কর্তাভজার সম্প্রদায়। সারা বাংলার দূর দূরান্ত কে তারা এসেছে। ওদিকে বসেছে সিনেমার তাঁবু, ছোটখাটো সার্কাসও এসেছে। রাগেটের ছাউনি দিয়ে বসেছে সারবন্দী মিষ্টি তেলেভাজা খাবারের দোকান, াধুনিক ষ্টাইলে রেস্তোরাঁও আছে। অন্যদিকে বসেছে শিলনোড়া শল্—মাদুর-

এর পটি ; মনোহারী দোকানও এসেছে অনেক। ওপাশে মাঠের ধারে বাগানের গাছতলায় কাঠের দরজা জানলা গরুর গাড়ির চাকা এসবও আছে।

মেলায় সন্ধ্যা থেকেই হেজাক পাম্পলাইট না হয় গ্যাসের আলো জ্বলে ওঠে। হেঁটে—গরু গাড়িতে দলে দলে আসে ছেলেমেয়ে প্রৌঢ় বৃদ্ধের দল, মেলা জমে ওঠে।

চঞ্চল ওসব দেখতেও আসে নি, তার জন্য আছে সহরের রোশনি—আর পালিশ করা সুন্দরী মেয়েদের ভিড়। এখানের সবটাতেই একটা খোলা মেলা মাটির গন্ধ মেশানো।

এপাশে গাছতলায় কদমখণ্ডীর মাঠের ধারে মন্দিরের আশপাশে বসেছে বাউলের আস্তানা, পালা করে তারা নাচগান চালিয়েছে, বাতাসে সেখানে ধোঁয়ার তীব্র গন্ধ। গাঁজা আর চরসের ঘোরে চোখ অনেকেরই লাল।

দুদিন এসেছে তারা। চঞ্চলকে কদম শুধোয়।

কেমন লাগছে গোঁসাই!

নামকরণটা কদমের। এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে আশ্রমের একপাশে। ভিড় না থাকলে মনে হয় চঞ্চলের জায়গাটা নির্জন, মনোরম। এখান থেকে ওই অজয়ের বিস্তীর্ণ বালিবাড়ির কোলে বয়ে চলেছে কাজল কালো জলরেখা। ওপারের শালবন সীমার উর্ধ্বে।

মাথা তুলেছে লাল মন্দিরের চূড়াগুলো, চারিদিকে এখন ওর গহন বন, শ্যামারূপার মন্দির। একদিকে প্রেমের সহজ সাধনমন্দির এই কেন্দুবিল্ব—অন্য তীরে শক্তি সাধনার মন্দির ওই শ্যামারূপার স্থান।

কিন্তু আজ তা ভক্তবর্জিত, পরিত্যক্ত। শক্তি আর দাপটের উপর হয়তো ওর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, আজ তার থেকে অনেক বেশী শক্তিমানরা বা আরও দামী মন্দির-নোতুন পীঠস্থান গড়েছে, ভক্তেরা গেছে সেখানে, তাই ওই মন্দির পরিত্যক্ত।

কিন্তু প্রেম আর সহজ সাধনার মন্দির—তীর্থ আর বোধ হয় গড়তে পারে নি মানুষ, তাই সে পথের অধম (অবশ্য আজকের দিনের বিধানে) সাধকরা ভিড় করেন এইখানেই।

চঞ্চল অনুভব করতে পারে না সে কেন এসেছে। এই ত্যাগ কষ্টের জীবন দূরে থেকে দেখা যায়, বাহবা দেওয়া যায়। কোন বিশেষ আকর্ষণে এর পিছনে কিছুদিনের মতো ঘোরা যায়, তারপর। ভালবাসা!

…সেটার কোন অস্তিত্বই সে খুঁজে পায় নি। সে চোখ হয়তো তার নেই। তাই ওদের ওই গান তার কাছে অর্থহীন, অন্তরের তন্ময় আকুতি তার কাছে কৃত্রিমতায় ভরা কোন সাময়িক নেশার বিকৃতি মাত্র।

—কি গো গোঁসাই?

চঞ্চল কদমের ডাকে মুখ তুলে চাইল। খড়ের ছাওয়া ঘরখানা। মাটির দাওয়া। টা উঠছে। কদম বলে।

—সরো চটখানা বিছিয়ে দিই। মন কেমন করছে না কি গো?

চঞ্চল হাসবার চেষ্টা করে। কদম বলে।

—হলো তো, মনের মানুষ পেয়ে গেছ। না হলে এত ভাবনা কেন?

—না। এমনিতে ভালো লাগছে না।

কদম ম্লান আলোয় ওর সামনে রেকাবিতে করে এনে দিল দুটো বোঁদের মিঠাই, ড়র তৈরী সঙ্গে চাট্টি মুড়কি। বলে নাও, ঠাকুরের পেসাদ।

খেতে থাকে চঞ্চল। সন্ধ্যা নামছে। মেলার ওদিক থেকে কলরব—গানের সুর স আসে, তাকে ছাপিয়ে আকাশে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে মাইকের গর্জন। ম ওকে দেখছে। একটি বিচিত্র মানুষ। ওর পারঘাটে ও রাতের অন্ধকারে ওকে খছে নানাজনের সঙ্গে। সহরে ওর সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলে।···নিজেও খছে কদিন। ঠিক চিনতে পারে নি ও মানুষ না অন্যকিছু। তবে মনে হয় নিজের মধ্যে একটা ভাঙ্গাগড়া চলছে, যার ছায়া ও দেখেছে চঞ্চলের মুখে, চোখের রব চাহনিতে।

নোতুন গোঁসাই!

চঞ্চল ওর দিকে চাইল। দুদিনের পাতাঘরে চঞ্চলেরও কদমকে ভালো লাগে। রঘাটায় যাকে দেখেছে এ সেই মেয়েটি নয়। আগুনের শিখার মতো রূপ— টাল থির যৌবন মদির দেহ নিয়ে ও কেমন দূরের মানুষ।

ওর ডাকে চাইল চঞ্চল।

কদম জিজ্ঞাসা করে।

—কোন দিন কাউকে ভালোবেসেছো তুমি? ভালোবাসা যাকে বলে র জন্য কিছু করতে মন চায় যার জন্যে সব হারাতে মন চায়। তেমনি লোবাসা?

চঞ্চল স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে। সারা মন তন্ন তন্ন করে খুঁজছে ল। একে একে মুখগুলো ভিড় করে আসে। কত অল্প দেখা চেনা, দেখা মুখ, তীতের সেই দেহবিলাসিনীদের মুখ, করুণা—মিস্ দে, মিস্ চাণ্ডি সুষমা প্রতিমা রও কতজন।

তার সারা দেহে ওরা ঝড় তুলেছে, কামনার আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাদের ছে পেতে চেয়েছে চঞ্চল। কিন্তু ভালোবাসা!

ওসব আজকের দিনে অচল। ওটা একটি উন্মাদ কামনা আর যৌন জীবনের স্তুতি; চঞ্চল হাসে।

—কেন? এ কথা শুধোচ্ছো কেন কদম?

—এমনই! তবে কি জানো খুঁজে পাওয়া ভার তেমনি মানুষ। দুনিয়ায় তাই

সবাই খোঁজে। মনের সব রূপ দিয়ে সব অনুভূতি দিয়ে তাই অনেককে বাজিয়ে নেয়, যেদিন সে সেই ভালোবাসার সন্ধান পায় সেদিন সে হয় সিদ্ধ।

তুমি কাউকে ভালোবেসেছো কদম? এমনি ভালোবাসা?

চঞ্চলের মনে কি একটা অন্য সুর বাজে। প্রদীপের ম্লান আলোয় সে ওই মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। ওর রূপের অতলে একটি কামনার প্রকাশ দেখেছে চঞ্চল, একটি ক্ষীণ অগ্নিশিখা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে; চঞ্চলের তপ্ত মনের জমা বারুদের স্তূপে যেন আগুন ধরাবে সে।

কদম হাসছে।

কাল সকালে মকরের স্নান। কবি জয়দেবকে মা গঙ্গা বর দিয়েছিল একদিন অজয়ের জলে উজান বেয়ে আসবেন মা গঙ্গা, সেই লগ্নে তীর্থ স্নান করলে সে হবে শুদ্ধ পাপমুক্ত। পাপমুক্ত হলেই তো ভালবাসা যায় গো, চল একটু ঘুরে আসি। দিনরাত এই ঝুপড়িতে বসে কি সব মাথা মুণ্ডু ভাবো!

চাদরটা জড়িয়ে নিল কদম, রঙীন চাদরের ফাঁকে ওর মাথার একরাশ কোঁকড়ানো চুলের কালো রেখার পরে ফর্সা নিটোল ঢলঢলে মুখখানা অনেক সুন্দর দেখায়।

চঞ্চল ওকে দেখছে। নাকটা সুগঠিত—কালো চোখ দুটোতে চির-যৌবনের মাধুর্য। ঠোঁটের হাল্‌কা ভাবটা বিনা প্রসাধনেই স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে রক্তিম হয়ে উঠেছে। কদমও চমকে ওঠে চঞ্চলের ওই চাহনিতে। বলে ওঠে কদম।

—কি দেখছো গোঁসাই? শ্মশানের ধারে পারঘাটায় বাস করে দেহটা শুধু আতরা হয়ে উঠেছে, খানিকটা মাংস মাত্র, শকুনির খাবার। মন বলে কোন বস্তু নেই, তাই তো কেঁদে মরি।

দুজনে চলেছে। মাঝে মাঝে আবছা অন্ধকার। কোথায় গাছের ডালে দুএকটা হ্যারিকেনের আলো ঝুলছে। কোন বাউলের দল গানের আখড়া বসিয়েছে। তাদের নাচগান চলেছে, তাকে ঘিরে কিছু লোকজন। কদম দাঁড়াল। চঞ্চলয় ওদের গানটা শুনছে। সুরেলা কণ্ঠে একটি পুরুষ আর নারী গাইছে। ও ভাষাটাই তাকে টেনেছে।

রাতের বাতাস বইছে শালবনের দিক থেকে, কনকনে বাতাস। নদীর বালুচর জমেছে কুয়াশার ফিকে আস্তরণ। বিচিত্র পরিবেশে বেদনাময় সুরটা ওঠে।

প্রেম করা হইল না।
মনের মানুষ খুঁজে পেলাম না।
মানুষ মানুষ অনেক আছে,
প্রেম মিলে কি যার তার কাছে,
মানুষ চিনে মানুষ—রতন
কখন মিলে না।
ভরে আছে আমার কামের গন্ধ,

কিসে প্রেমের হয় সম্বন্ধ
রসিকের সঙ্গ বিনে
গন্ধ যাবে না।
ওরে সেই মানুষের সঙ্গ পাইলে
হইতাম রে সোনা ॥
মনের মানুষ ধরতে পারলে করতে পারো
প্রেম সাধনা ॥

চঞ্চল স্তব্ধ হয়ে শুনছে, ওই গানের বাণী কোন অজানা কবির লেখা সুরটাও চিত্র। কোন ব্যাকরণের চেয়ে অন্তরের আকুতিকেই ওরা সজীব করে তুলেছে। ন হয় মানুষের এই অন্বেষণ চিরন্তন। সে কাকে কোন পাত্রে ভালবাসে তা জানে , তাই খুঁজেই বেড়ায়। পথে পথে, জীবনের বিচিত্র শোভাযাত্রায়।

আবছা অন্ধকারে একফালি আলো পড়েছে কদমের মুখে, তার সারা মনের ন্যতার ছবি ওতে পরিস্ফুট। জীবনে তার চাওয়া অতি সীমিত। তার কামনার ালাও নিভে গেছে মনে হয় জীবনভোর এই শূন্যতার বেদনাই তাকে আজ থে এনেছে।

চঞ্চলও বের হয়ে এসেছে ভিড় থেকে। ওপাশে নদীর দিকে কুয়াশার ঘন আস্তরণ, ঝে মাঝে দেখা যায় কাঠ খড়কুঠো জেবলে ওরা আগুন পোয়াচ্ছে—প্রতীক্ষা করছে াল ব্রহ্ম মুহূর্তের সেই পুণ্যক্ষণের, যখন অজয়ের স্রোতে উজান বইবে।

সঙ্গম হবে ত্রিবেণী স্রোতের। অজয়ের ধারা—গঙ্গার স্রোত আর ভক্তের ব্যাকুল ন্তরের কামনা। চঞ্চলের সারা মনে একটা ঝড় উঠেছে। ভালবাসার অন্বেষণ!··· ন্তু জীবনে একা সেই কি ভালোবাসতে চায় না? কই যারা এসেছিল তারা তো াকে ভালোবাসতে পারে নি। জীবনে সে জন্মাবধি মায়ের ভালবাসা পায় নি; ুনেছে তার মা নাকি মরে নি—সন্তানকে ফেলে রেখে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে র হয়ে গেছে। বাবাও তাকে ভালোবাসতে পারে নি। শূন্য ব্যর্থ জীবনের থম বঞ্চনাই তার দৃষ্টি বদলে দিয়েছে, তার পর যারা এসেছে শুধু দেহের ক্ষুধা ায়েই এসেছে।

···ভালোবাসা তার কাছে তাই অর্থহীন পরিহাস মাত্র!

—কদম!···

কদম ওর চোখে দেখেছে নিবিড় একটা তৃষ্ণা। নিজেকেও আজ বিশ্রী ঠেকে।··· র হাতখানা ওর হাতে। নদীর বালিয়াড়ির ধারে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। চঞ্চলের ই স্পর্শে সারা শরীরে একটা বিজাতীয় জবালা ফুটে ওঠে।

শিউরে ওঠে কদম।

—মদ গিলেছো তুমি!

চঞ্চলের ওটা দরকার। সঙ্গেই থাকে। ক'দিন না খেয়ে থেকেছে। আজ মনে

হয় ওসব তার কাছে ভণ্ডামি। ওদের মুখের গান আর অন্তরের সাধনার তফাৎ কতটুকু তা বোধ হয়েছে।

হাসে চঞ্চল—ওসব আমি বুঝি না কদম। বাঁচতে চাই। সব পেয়ে ভোগ করে বাঁচতে চাই।

…ওকে নিবিড় করে কাছে পেতে চায় চঞ্চল। তার দেহের কোষে কোষে বি বিকৃত তৃষ্ণা। কোন নীতি কোন দর্শনই তার কাছে ঠাঁই পায় নি। সে ভালোবাসে শুধু নিজেকে, সব পেতে চায় সে নিজের সামান্য ভোগের জন্যই।…কদম শিউরে ওঠে।

—তুমি কি মানুষ!—মদ গিলছো এই তীর্থে? কাল পুণ্যস্নান করবে না হাসে চঞ্চল—পুণ্যস্নান! এত পাপ ও জলে ধুয়ে যাবে না কদম। তাই আপশো করে লাভ কি?

—বাওছাড়! গর্জে ওঠে কদম।

চঞ্চলের সারা দেহে দ্বিগুণ মত্ততা এসেছে; সে ওর নরম হাতটা ধরে ওকে নিজে দেহের উপর এনে ফেলেছে, পিষে মেরে ফেলতে চায়। কদমের সারা মনে অসহ জ্বালা। একটা ধাক্কায় ওর দেহটাকে ছিটকে ফেলেছিল বালির উপর। চাপা স্বরে গর্জন করছে কদম।

—এখুনি এখান থেকে চলে যাও, নাহলে লোকজন জুটে গেলে বিপদ হবে আর আশ্রমে ঢুকো না।

চঞ্চল অতর্কিতে আঘাতে ছিটকে পড়েছে; নিষ্ফল রাগে জ্বলে ওঠে সে। বা পেলে ওরা রেগে ক্ষেপে ওঠে। কিন্তু কদমের উদ্ধত মূর্তির সামনে এগোতে ভ পায়। তবু নিষ্ফল গর্জন করে চঞ্চল।

—সতী! ঢের দেখা আছে।

কদম আর দাঁড়াল না। ঘৃণায় রাগে তার মন বিষিয়ে উঠেছে।

সরে গেল সে. অন্ধকার নদীতীর থেকে আশ্রমের দিকে চলেছে। চঞ্চল দাঁড়ি আছে।

ভালোবাসা!…

লোকটা যেন কি গাইছিল! নেশার আচ্ছন্নতা তা মনের মাঝে সব চিন্তা ঢেকে ফেলেছে! তবু মনে হয় মনের মানুষ! কথাটা কেমন পাক দেয়। ভালোবাসা!

পায়ের তলে শিশির জমা হিম বালির কন্‌কনে ঠাণ্ডাটা ধীরে ধীরে সারা শরী কাঁপুনি ধরায়। কদমও তাকে শাসিয়ে গেছে। ভালোবাসে তাকে কদম! ধাৎ দুনিয়ায় কোন বন্ধুই কেউ কাউকে ভালোবাসে না। সবাই নিজের সুখ নিয়ে ব্যস্ত। সব কিছু দেহেই শেষ। দেহের বাইরে মন; তার খুশি আর চাওয়া পাওয় দেহকে ঘিরেই। পয়সা দিলেই সব ভালোবাসা মেলে।

…চঞ্চলের সদ্যজাগর শ্বাপদ মন আবার কি বুভুক্ষায় মেতে উঠেছে। কদম !… কদমের কথা ভুলে গেছে সে। যে কোন নারী হলেই তার চলবে। টাকাগুলো পকেটেই রয়েছে।

মেলার ওদিকে আমবাগানে দেখেছে দেহ বেসাতির মহল্লাটা।…মেলার দর্শকদের আনন্দ বিতরণ করে তারাও।…মদের নেশাটা বেশ জমে উঠেছে। সেই মাংসের অন্বেষণেই চলেছে একটি মেতে ওঠা জানোয়ার! সব কিছু ভুলতে চায় সে।

সদানন্দবাবুও সংবাদটা শুনেছেন। চঞ্চলের চলে যাবার সংবাদ শুনে বিস্মিত হন নি। সমীর ভাবনায় পড়েছে। সুষমাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। অনেক কষ্ট পেয়ে ডেলিভারি হয়েছে, একটি মেয়ে। তবু নিশ্চিন্ত হুন সমীর। ক'দিন তার উপর দিয়েই ঝড় বয়ে গেছে। ছুটিও নিতে হয়েছিল তাকে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এ সব বিপদে সে কেন এসে পড়ল, কিন্তু সুষমার মুখ চেয়েই এড়াতে পারে নি এইবাব, চঞ্চলের সন্ধান করতে সুরু করেছে।

কলকাতা থেকে প্রকাশকরাও আসে—আসে পত্রপত্রিকার লোকজন। কিন্তু চঞ্চলের কোন সংবাদ নেই। সপ্তাহ খানেক পার হয়ে গেছে। সদানন্দবাবু বলেন।

—খুঁজে তাকে পাবে না সমীর। সে আসবেই।

সমীর তবু ভাবে—যদি কোন বিপদ আপদ হয়ে থাকে, হাসেন সদানন্দবাবু —তাহলে সে নিজেই খবর দিতো। মনে হয় মনের মধ্যে একটা জ্বালা তাকে ঘর ছাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওদের বাঁধা যায় না।

সমীর এ যুক্তি মানে না। বলে।

—তবে নিজেকে জড়ালো কেন?

—ওর জবাব সেও জানে না। দুনিয়ায় যে যত বেশী জানবার চেষ্টা করেছে সে তত বেশী স্বতন্ত্র, একক, তার যন্ত্রণা তত বেশী। সেই যন্ত্রণায় কেউ হয় শিল্পী —কেউ হয় সাহিত্যিক কেউ হয় উন্মাদ। নয়তো নিজেকে তিলে তিলে হত্যা করে সমাজের মানুষের হতাশায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে। সমীর এসব কথা শুনেছে। তার মনে হয় শোপেনহাওয়ারের কথা।

যন্ত্রণাই তাদের সৃষ্টির মূল কথা। কেউ সেই যন্ত্রণায় দেহসর্বস্ব হয়ে ওঠে, ক্ষণিকের আনন্দই তার কাছে মূল সত্যে পরিণত হয়। কিন্তু মনের অতলের সেই চিস্নাত মনই প্রতিবাদ করে, তখন সে যন্ত্রণায় অধীর হয়ে যায়।

সদানন্দবাবু বলেন।

—চলাই তার ধর্ম, সে পথ ভুল হোক আর ঠিক হোক সেটা না বুঝেই চলে। যখন ভুল বোঝে তখন অনেক দাম দিয়েই বোঝে।

…সমীর জানে এসব তত্ত্ব, কিন্তু নিজের জীবনে তা পরিমিত সত্য নয়। সে সব জ্বালা ভুলে ঠুলিবাঁধা চোখে শুধু সংসারের ঘানিগাছে পাক দিয়ে চলেছে।

পত্রিকার সম্পাদক ভদ্রলোক বলেন।

—ফিরলে জানাবেন আমি এসেছিলাম, আমার লেখাটার জন্য বলে গেলাম।

বৃদ্ধ প্রকাশক চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে মুছতে মুছতে বলে।

—আমার কথাও বলবেন। টাকার জন্য ভাবনা নেই, যদি দরকার হয় দি যাই কিছু! সমীর বলে—থাক। দরকার হলে জানাবো। সুষমা স্তব্ধ হ গেছে ক'দিন। বাড়ি ফিরেছে মনে হয়; তার উপর রাগ করেই সে ঘর ছেড়েছে মাঝে মাঝে উধাও হয় কিন্তু এত দেরী করে না। পাশে বাচ্চাটা একটা তোয়ালে উপর শুয়ে আছে, তারই একটু চিহ্ন!

সুষমার মনের সেই রাগটা চলে গেছে, এখন ভাবনা হয় তার লোকটার জন্য তা সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য। সমীর ঘরে ঢুকে বলে।

—এতক্ষণ তো লোক তাড়ালাম। বাব্বাঃ এদিকে তুই আবার কাঁদছিস নাকি?

হাসবার চেষ্টা করে সুষমা—কই না তো।

কথাটা নিজেই জানায় সুষমা—বুঝলি দাদা, প্রতিমা অনেকদিন আসে ওকে আসতে বলবি একদিন। এখনও বোধ হয় রাগ করে আছে।

সমীর জানে ওদের ব্যাপারটা। তার কাছে মনে হয় মেয়ে জাতটাই যত সমস আর গণ্ডগোলের মূল। মানুষের মনে ঝড় তুলে ওরাই। লোভ আর অশান্তি ঝড়। একদিক থেকে সে নিশ্চিন্ত। তবু নিজের ভাববার কিছু নেই।

খবরটা জেনেছে কদমও কেন্দ্রবিল্ব থেকে ফিরে। সেই রাতে নদীর ধারে চঞ্চল দেখেছিল সে। অপমানই করেছিল কদম ওর নীচতাকে বেদনা দিয়েছিল, রে চলে এসেছিল। কিন্তু ক্রমশঃ তার মনের মাঝে একটা সমবেদনা জাগে। ফি গিয়েছিল সেই রাতেই কিন্তু চঞ্চলকে আর দেখে নি। পরদিন সকালেও খুঁজেছি মেলায়—কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেছে চঞ্চল।

কদমের নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়।

ফিরে এসে শুনেছে খবরটা। কদম চুপ করেই থাকে। পারঘাটের সেই স্বাভাবি জীবনযাত্রায় আবার এসে মিশে গেছে। তবু মনে পড়ে মাঝে মাঝে চঞ্চলের কথা। অন্তর মনের দিক থেকে মানুষটা দেউলিয়া, বুক ভরা বেদনা আর দুঃসহ জ্বা নিয়ে সে বোধ হয় এখনও পথে পথেই ঘুরছে।

তার কাছে কি চেয়েছিল সে, দেহ না মন তাও বোঝে নি কদম। নিজের দেহে শুচিতার প্রশ্ন তার কাছে আর নেই, তবে? মনের দিক থেকে সে মানুষ খুঁজে চেয়েছে, কিন্তু যখন একজন মানুষ তার সব গ্লানি নিয়ে তার কাছে আশ্রয় খুঁজেছি সে তাকে নিষ্ঠুর আঘাত করেই ফিরিয়ে দিয়েছে।

খাতাবাবু কদমকে আনমনা দেখে বলে।

—কি ভাবছিস কদম? তীর্থে গিয়ে মনটাকে হারিয়ে এলি?

ফিরেই চাইছিস না?

কদম বিরক্তি ভরা স্বরে বলে।

—মড়ার হিসাব রাখছো তাই রাখোগে, জ্যান্ত মানুষের মনের খপরে তোমার দরকার কি? মদ চাই? ওই তোরঙ্গে আছে নিয়ে সরে পড়ো দিকি!

খাতাবাবু হাসে, হাসলে ওর দাঁতগুলো আকর্ণ বেরিয়ে পড়ে। কদম উঠে চলে গেল। সত্যিই তার কি হয়েছে।

·· পথে পথে ঘুরেছে চঞ্চল। শীতের শেষ। গ্রীষ্ম আসবো আসবো করছে, তারই সাড়া জাগে প্রান্তরে—গাছ গাছালির মাথায়। পাখীর কলরবে। নান্নুর গেছে—বোলপুর থেকে পথটা গেছে পল্লীর বুক চিরে। চণ্ডীদাসের মন্দিরের সামনে ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে মনে হয়, বাতাসে মিশিয়ে আছে কার ব্যর্থ বেদনার নিঃশ্বাস।

—শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

মানুষের জন্যই একথা বলেছিলেন তিনি। সব কিছুর ঊর্ধ্বে মানুষ। তার জন্যই পৃথিবীর এই আলো—সন্ধ্যার পাখীর কলকাকলি জীবনের সব বৈচিত্র্য আর মহত্ত্ব।

কিন্তু মানুষ আজ কোথায় নেমে এসেছে? তার চারিদিকে দেখেছে চঞ্চল সেই অমানুষের রাজত্ব, তাদেরই প্রতিষ্ঠা, সর্বকিছু সুন্দরকে তারা গ্রাস করেছে, মানুষকে পরিণত করেছে তাদের মতবাদ আর স্বৈরাচারের ক্রীতদাসে। সে নিজেও তাদের দলে।

চারিদিকে ফুটেছে সবুজ পাতার ডগে ডগে সাদা বাসক ফুলগুলো, বটগাছের ছায়াঘেরা ঠাঁই-এ ওঠে পাখীর কাকলি। নিজের কাছে নিজেরই কেমন অক্ষমতা জাগে সেও এই বাক্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। কিন্তু কেন?

জীবনের একদিক তার শূন্যই রয়ে গেছে। আজকের মানুষ একজায়গায় নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ! মনে হয় ভালোবাসা তার পায় নি। মানুষের আজকের সভ্যতা তাকে দিয়েছে অনেক কিছুই, কিন্তু বিনিময়ে কেড়ে নিয়েছে তার অন্তর—তার ভালবাসার ক্ষমতা।

নকল ভালবাসার মুখোস পরে সে ঠকছে আর ঠকাচ্ছে।

কথাটা নোতুন করে উপলব্ধি করেছিল চঞ্চল বোলপুরে ফিরে এসে শান্তিনিকেতনের মাটিতে দাঁড়িয়ে। সবকিছুই রয়ে গেছে, বিরাট একটি কর্মশালা; কত জ্ঞানী গুণীর সমারোহ কত বৎসরের কত মানুষের সাধনায় তা পূর্ণতর হতে চলেছে।

কিন্তু একটি মহামানবের অভাবকে এত কিছু দিয়েও পূর্ণ করা সম্ভব হয় নি। এটা বোধ হয় আমাদের মনেরই দৈন্য। তাঁর সাধনালব্ধ সিদ্ধিকে আমরা মর্মের মাঝে গ্রহণ করতে পারি নি। ভণ্ডামির দ্বারাই মনকে বোঝাতে চেয়েছি আমরা তার

উত্তরাধিকারী। মনের দিক থেকে কোন প্রস্তুতিই তার নেই, তাই শূন্যকুম্ভের মতো সোচ্চার হয়ে থাকি।

•••তিনজন মহাকবি এই মৃত্তিকায় মানুষের প্রেম ভালোবাসা আর মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। শেষ কাজের সেই মহামানবকেও আমরা বোধ হয় শূন্য আশ্বাসে ব্যর্থ করেছি। নইলে গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ায় নিঃসহায়কে হনন করবে কেন? শক্তের প্রতিকারহীন অপরাধ এযুগে আকাশস্পর্শী মত্ততায় ভরে তুলেছে দিকবিদিক—বিচারের নিষ্ফল চেষ্টায় বাধার পাষাণ প্রাচীরে মাথা খুঁড়ে রক্তাক্ত করেছে।

••চঞ্চল জানে, অনুভব করে—দেখেছে। কিন্তু যন্ত্রণা তার আরও নির্মম, তাকে ওরা যেন মদ খাইয়ে মাতাল করে সব ভুলিয়ে রাখতে চায়। সে ভণ্ড প্রতারক। করুণার সেই রাতের কথাগুলো মনে পড়ে—সে শয়তান!

কিন্তু তার জন্য তার কি একার দোষ!

তাই কি দুর্বার শক্তিতে সে গড়তে না পারুক—এ সমাজকে আঘাত হানবে, তার সবকিছুকে বিকৃত পঙ্গু করে তুলবে, সেই সঙ্গে নিজেকেও। একই আঘাতে সব ভেঙ্গে পড়ে গুঁড়িয়ে যাবে; এ আত্মহত্যারই সামিল কিন্তু বিকৃত জ্বালায় মানুষ বোধ হয় তাহাই করে।

সুষমার একাকীত্বকে ভরিয়ে তুলেছে একটি নবাগত। ছোট্ট দুটো কচি হাত দিয়ে সে ওকে জড়িয়ে ধরে, অস্ফুট কাকলিতে কোন অচেনা আনন্দ জগতের সংবাদ আনে।

সদানন্দবাবুর কাজ বেড়ে গেছে। বৃদ্ধ সকাল বিকাল বেড়াতে যাবার সময় এইদিকে আসেন। সমীরের ডিউটি থাকে, তাই তিনিই খবরাখবর নেন।

বৃদ্ধ বলেন।

—এ জগতের পাপ ওদের স্পর্শ করে নি মা, তাই ওরা এত পবিত্র এত সুন্দর। সুষমা ওই মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। একজনকে মনে পড়ে বারবার। চঞ্চল ফিরে এলে সেও বাঁধা পড়তো, এ বাঁধন কাটাবার সাধ্যি তার হতো না।

সুষমাই বলে—

—একটু সুস্থ হয়ে উঠি, এইবার গানের ক্লাশ আবার নিতে সুরু করবো। বৃদ্ধের চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি। সুষমা জানায়।

—সংসার তো চালাতে হবে মাষ্টার মশাই। ওইটা জানি—ওই দিয়েই দেখবো। নিজের জন্য নয়, ওর জন্যও তো এইবার বেরুতে হবে।

—ওকে কার কাছে রেখে যাবে?

—ঝিয়ের কাছে থাকবে সে সময়। কি করবো বলুন।

সুষমার কণ্ঠে অসহায় সুর। তবু মনে মনে সে তার পথ করে নিয়েছে। বৃদ্ধ চেয়ে দেখেন নোতুন মাকে। আজকের সমাজে মাতৃত্ব মানে বন্ধন শুধু নয় দায়িত্বও

তাকে সবকিছু স্নেহ—সাহচর্য থেকে বঞ্চিত করে বাঁচিয়ে রাখার জৈবিক প্রয়োজনে মাকেও বের হতে হয়। মনের খোরাক নয় দেহের সামান্য খাদ্যটুকুর জন্য মানুষকে আজ সব বিসর্জন দিতে হয়েছে। ধাপে ধাপে দেহসর্বস্ব হয়ে উঠছে মানুষ, ঠিক পশুশ্রেণীর মতোই। ভবিষ্যতে ওই স্নেহবর্জিত সন্তান এইটাই শিখবে। স্নেহ ভালবাসা হয়ে উঠবে ক্ষণিক বিলাসের সামগ্রী মাত্র।

...হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চমকে ওঠে সুষমা। সদানন্দবাবুও ফিরে চাইলেন, প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। এতদিন নিরুদ্দিষ্ট থাকার পর ফিরছে চঞ্চল। ওকে দেখে চমকে ওঠেন সদানন্দবাবু।

চঞ্চলের সারাদেহে চকচকে সেই পালিশ নেই, মাটির গন্ধ আর ছাপ মাখানো ওর দেহমনে। মাথার চুলগুলো উস্কো খুস্কো, গালে একগাল দাড়ি। চেহারা অনেক শীর্ণ হয়ে উঠেছে, দুচোখ তবু উজ্জ্বল। কি যেন দীপ্তিতে চোখ দুটো ওই শীর্ণ দাড়ি গোঁফে ঢাকা মুখে জ্বলছে প্রদীপ্ত আভায়।

—চঞ্চল! সদানন্দবাবু ওর দিকে এগিয়ে যান।

চঞ্চল দাঁড়িয়েছে। ওর কথায় জবাব দেয় গাঢ় স্বরে—ফিরে এলাম মাষ্টার মশাই। দেখলাম সব পথ কোথায় হারিয়ে গেছে। তাই ঘুরে ফিরে দুদিনের সরাইখানাতেই ফিরে এলাম। মনে হয় সব মিথ্যা সত্য কোথাও নেই। মানুষ সব ভুলে গেছে।

হাসেন সদানন্দবাবু।

—এ তোমার মিথ্যা ক্ষোভ চঞ্চল। সবই আছে, শুধু চোখের দৃষ্টিটাই আমাদের ধাঁধিয়ে গেছে, তাই কাঁচ কাঞ্চন একাকার করে ফেলেছি—আর ঠকেছি। ওসব কথা পরে আলোচনা হবে। উঃ, কদিন যে কি ভাবনায় কেটেছে।

সদানন্দবাবু এসময় ওকে আটকে রাখেন না। দেখেছেন ওদিকে সুষমার চোখে কি ব্যাকুলতা। এখন ওদের কথাগুলোই বড় হয়ে থাক। তিনি তাই নিজেই ছড়িটা তুলে নিয়ে বের হয়ে গেলেন খুশিমনে।

তবু চঞ্চল ফিরেছে। দেখা যাক এই পরিক্রমায় তার মতান্তর কিছু হয় কি না।

চঞ্চলের মনে হয় এতদিনের অনুপস্থিতির পর এবাড়িতে সে অচেনা লোক। তার অবর্তমানে এ বাড়ির হালচালও বদলায় নি। সুষমার দিকে চাইল। শীর্ণ মুখে ওর অভিমানের অশ্রু। দুহাত দিয়ে মোমের পুতুলের মতো বাচ্ছাটাকে ধরে আছে। ও যেন দেখতে চায় চঞ্চলকে তার নিজের চরম দায়িত্বহীনতার কথা। সে ওই মা আর তার সন্তানকে ফেলে রেখে চলে গেছে! চঞ্চলের মনে হয় বেশ ছিল ক'দিন। পথে পথে বিশাল সীমাহীন দিগন্তে ঘুরেছে, কিন্তু ফিরে এসে এমনি বন্ধনের মধ্যে পড়বে ভাবে নি। স্নেহ! প্রীতি নিশ্চিন্ততা।

ওসবই তার কাছে মূল্য দিয়ে পেতে হবে। কদিন মূল্য দিতে পারে নি তাই এই অভিমান। সুষমা কান্নাভিজে কণ্ঠে বলে।

এত নিষ্ঠুর তুমি! কি দোষ করেছিলাম যে এমনি করে এই অবস্থায় ফেলে চলে

গেলে? এতটুকু মায়ামমতা কর্তব্যবোধ নেই? ওরাই কি ভেবেছে সকলে? মা—দাদা।

চঞ্চলের শান্ত মন কঠিন হয়ে উঠছে, সে অনেক ভেবে চিন্তেই বাড়িতে ফিরেছে। তার জগত আলাদা। সেখানে সুষমা—ওই নবজাতক কারও প্রবেশাধিকার নেই। মানুষ হিসাবে যেটুকু করা উচিত—তাই সে করবে মাত্র, বাকী মনের জগত তার নিজস্ব। তার ভাবনা নিজেরই মনের ছবিতে পৃথকধর্মী।

সুষমার কথার জবাব দিল না। এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আজ সব কথাগুলো তার কাছে মিথ্যায় পরিণত হয়েছে, ওরা চায় অর্থ—আশ্রয় আর নির্ভর! চঞ্চল জবাব দেয়।

কর্তব্যের কোন ত্রুটি হবে না সুষমা, যতটুকু তোমার প্রাপ্য ততটুকু ঠিকই পাবে। তার বেশী চাইলে দেবার সাধ্য আমার নেই।

সুষমা অবাক হয়ে চঞ্চলের দিকে চাইল। ভেবেছিল এতদিন পর ফিরে এসেছে, তার সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরবে, মাপ চাইবে সুষমার কাছে। অনেক অনুনয়—ভালবাসার ছোঁয়ায় চোখের জলে সেই মান অভিমানের পালা সাঙ্গ হবে। আবার সব ফিরে পাবে সে।

কিন্তু তার সব স্বপ্ন কামনা ব্যর্থ হয়ে গেল। নিষ্ঠুর ওই মানুষটির হৃদয়ে কোন আবর্ত ওঠে না, কৃতকর্মের জন্য অন্য কারো কাছে ক্ষমা চাইবার কথাও নেই। তার নিজের রাজ্যে সে নিজেই সম্রাট; সুষমার ব্যর্থ মন গুমরে ওঠে—তবু স্ত্রী তোমার সন্তান তাদের জন্য তোমার মমতা—ভালোবাসা—নেই?—অনর্থক ওসব নিয়ে ভাবি না সুষমা। তোমার আমার জগৎ এক নয়। ভালবাসা!···বারবার একটা কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে চঞ্চলের? বলে ওঠে তীক্ষ্ন কণ্ঠে।

—ভালোবাসা, ভালোবাসা উচ্চারণ না করে ঠাকুর দেবতার নাম নাও, অবশ্য তাঁরা যদি থাকেন খুশী হবেন। মিথ্যা কথাটা বার বার উচ্চারণ করে লাভ কি!

চঞ্চল ভিতরে চলে গেল। ক'দিন তার স্নান হয় নি দাড়িগুলোও কামাতে হবে। নিজের মনেই হাসি আসে। বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে চঞ্চল, আয়নায় নিজের মুখের ছায়া পড়েছে। এতদিন নিজেকে দেখতে পায় নি, আজ দেখে বিচিত্র সেই দাড়িভরা মুখখানাকে, মাথার চুলগুলোতে তেল অভাবে ধুলোবালি লেগে জট পাকিয়েছে। হাসছে চঞ্চল এই বিচিত্র মানুষটাকে চেনে না।···নিজেই বলে ওঠে।

—শ্লা সাধু হতে গিয়েছিল, ব্যাটা ফিরে এসেছে জানোয়ার হয়ে। ধ্যাৎ! দাড়িগুলোকে কাটতে থাকে। মাথায় জটপাকানো চুলে সাবান ঘষছে, দলের মানুষ নিজের মতো আর দর্শনটাকে গোপনে যাচাই করতে গিয়েছিল। এতদিন ঘুরে ঘুরে দেখেছে সর্বত্রই সেই নরক—পোকা থিক থিক করছে। কোথাও সে পায় নি তার তৃষ্ণার জল।

ওসব বাজে কথা। মুক্তি—আনন্দ—মানুষের মহত্ব—। ধ্যাত্তোর!

বহুদিন পর আবার খেয়েদেয়ে নরম বিছানায় আরাম করে শুয়ে র‍্যাগ চাপা দিয়ে দামী সিগ্রেটটা ধরিয়ে তন্দ্রাসুখ অনুভব করে। এই জগতের মানুষ সে। এই নীতিই তার কাছে সত্য—সব পাবার নীতি!

মনে হয় মানুষের প্রতিষ্ঠার জন্য এতকাল যে বাণী চলে এসেছে তা হচ্ছে বিশিষ্ট এক শ্রেণীর মানুষের কথা। শক্তিমান এই পঙ্গপালের মধ্য থেকে ঠেলে ওঠা সেই মানুষের কথা, শিয়াল কুকুরের মতো যে মানুষ নামক জন্তু হাজারে হাজারে জন্মাচ্ছে—বংশবৃদ্ধি করছে তাদের সম্বন্ধে বিশাল প্রকৃতিও উদাসীন। তাদের কথা কেউ ভাবে না। সামগ্রিকভাবে সদানন্দবাবুর মতো কিছু লোক সমীরের মতো অসহায় মানুষ জীবে দয়া—প্রেম ইত্যাদির কথা বলে।

নিজেকে মনে হয় অনেক বড়, ওই ভিড় থেকে সে স্বতন্ত্র একটি চেতনাময় মানুষ। এত দিনগুলো ঘোরার মাঝেও তাই মনে হয়েছে। ঘুম আসছে!

সবুজ শালবন সীমায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে, অজয়ের তীরে তীরে হাজার মানুষের ভিড়। কোন সাধু বাউলের গানের সুর ওঠে।

—তুই কি মানস মুকুল ভজবি আগুনে!
তুই কি ফল ফলাবি—ফুল ফোটাবি সাধন বিনে॥

মনের সুরভিনিথর বিকশিত করার কি নীরব সাধনা চলেছে। প্রকৃতির বুকে—বনস্পতির মাঝে—মৃত্তিকার গোপনে চলে সেই সাধনা, তাই ফুল ফোটে, মৃত্তিকার বুক সবুজ হয়ে ওঠে, ঘাসে ঘাসে ওড়ে প্রজাপতির দল। মানুষ খুশীতে মেতে ওঠে। সব অভাব জ্বালার কথা ভুলে গিয়েও সে আনন্দে বাঁচতে চায়।

একটা সুর ওঠে। অস্ফুট সুর। ভালো লাগে তার। বিচিত্র একটা অনুভূতি—ওই সুর শুনেছে চঞ্চল শ্যামসবুজ দিগন্তের মুক্ত বাতাসে। ওই সৌরভ অনুভব করছে সে মুক্তির আনন্দময় পথে পথে। কোথায় নিঃসঙ্গ পৃথিবীর পথে সে হারিয়ে গেছে। এ তার অন্যমন। যে অবচেতন জগতের অতলে তাকে বার বার বৃহৎ কোন আনন্দকে পাবার ইঙ্গিত এনেছে।

নিজের অতলেই বিচিত্র এই সত্তাটাকে মাঝে মাঝে অনুভব করছে চঞ্চল। এ তার নতুন উপলব্ধি। হিংসা নেই—লোভ নেই—হারাবার বেদনা নেই শুধু সবুজ চেতনার পটভূমিকায় ফুলগন্ধবহ পরিবেশে একটু স্নিগ্ধ আলোর বিকীরণ অন্ধকার মনকে সঞ্জীবিত করে তোলে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় চঞ্চলের। চোখ মেলে চাইল।

…সুষমা বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছে। বাচ্চাটার অস্ফুট কাকলি ওঠে। ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে সমীর। জানলা দিয়ে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে ওর মুখে, সুন্দর দেখায় ওকে। বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ, দু চোখে ওর রাগ নেই। আছে শুধু কৌতূহল। সেও এইদায়িত্ব পালন করেছে তার অনুপস্থিতিতে।

চঞ্চল বাচ্চাটার দিয়ে চেয়ে থাকে। ডাগর দুটো চোখ মেলে সে দেখছে তাকে। হাত দুটো নাড়ছে কি দুর্বার আনন্দে। সমীরের চোখের চাহনিও যেন অমনি নিষ্পাপ তেমনি আবেগ ভরে সে চেয়ে আছে চঞ্চলের দিকে। ক্ষণিকের সেই দিনশেষের পড়ন্ত আলোর সুষমার মনের শুচিস্নাত রূপটিকে দেখেছে সে, যে রূপ সে দেখেছিল শিশির-ধোয়া সোনালী সকালে ওই মুক্ত উদার শ্যামল ধরিত্রীর মাঝে।

চমকে উঠে চঞ্চল!

কোথায় সে একটা ভুলই করেছে এতদিন। তার সেই চোখ ছিল না—দেখতে পায় নি মানুষের জীবনের এই পরম আনন্দময় রূপটিকে।

হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে বুকে তুলে নেয়। শান্ত উষ্ণ নরম তুলতুলে একটু স্পর্শ, চঞ্চলের সারা অনুভূতির নিবিড় জ্বালাকে কি স্নিগ্ধতার আবেশে ভরে তোলে। ছোট দুটো হাত দিয়ে কে যেন শাসনের ভঙ্গীতে তার মনের সুপ্ত তন্ত্রীগুলোকে জাগিয়ে দেয়। ভালো লাগে—খুব ভালো লাগে চঞ্চলের।

সুষমা হাসছে—খুব দুষ্টু ওটা!

চঞ্চল অনভ্যস্ত ভঙ্গীতে বাচ্চাটাকে সামলাবার চেষ্টা করে। হাসে সুষমা—এ্যাই লাগবে ওকে। এমনি করে ধরছো কেন? দাও দাও! কাঁদলে আর থামানো যাবে না।

চঞ্চলের মনের সামনের পাথরগুলোকে সরিয়ে দিয়েছে কে। সহজ ভাবে বলে ওঠে চঞ্চল।

—এসো সমীর। বাব্বাঃ, খুব ঝামেলায় ফেলে গিয়েছিলাম তোমাদের না? সমীর সহজ স্বরের কথাগুলো শুনছে। তারও অভিযোগ ছিল অনেক। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে অনুতাপের সুর ফুটে ওঠে। সমীর শোনায়।

—ধন্যি লোক যাহোক। এখনও কি এমনি করে পালিয়ে বেড়াবে? চঞ্চল বলে —মাঝে মাঝে কেমন মনে হয় সব ছেড়ে দিয়ে পালাই। যেভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম এটা সেভাবের বাঁচা নয়। তাই পথ খুঁজতেই গেছলাম।

সমীর বিড়ি ধরিয়ে যুৎ করে বসে প্রশ্ন করে।

—সে পথের সন্ধান পেলে?

মাথা নাড়ে চঞ্চল—একেবারে পাই নি কিছু বলা ভুল হবে, তবে সেপথ অনেক দূরে। আছে কিনা জানি না। থাকলেও কঠিন পথ। তবে দেখে এলাম বিচিত্র জগৎকে। এত দুঃখের মাঝেও সে সুন্দর, এর চেয়ে ঢের সুন্দর।

সুষমার কাছে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে আসে। চঞ্চলকে তার বিচিত্র বলেই মনে হয়। ওর অন্তরে একটা ভালোমানুষ আছে যে অহরহ একটা বেদনা আর বিকৃতিতে ভুগছে। তাই মাঝে মাঝে সেই ভালো স্বরূপটা হারিয়ে যায় বাইরের চাপে নোতুন একটা রূপে ফুটে ওঠে, যাকে চেনে না সুষমা! তবু এই কালো আর আলো নিয়েই তার জগৎ।

চঞ্চলের কথাগুলো কানে আসে। আজ দাদার সঙ্গে সহজ ভাবেই মিশেছে সে। সুষমা নিশ্চিন্ত হয়েছে। চঞ্চল বলে চলেছে।

—সব পথ কোথায় হারিয়ে গেছে সমীর। আমরা শুধু জন্মেই মরছি। তাই মনে হয় নোতুন সমাজের দরকার, সেখানে আসবে নোতুন মানুষ। সে অতীতের সবকিছু ভুয়ো সংস্কার আর ভণ্ডামিকে কঠিন আঘাতে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে আবার নোতুন করে পথ দেখাবে—বাঁচার পথ।

সমীর ভাবছে। চঞ্চলের অনেক কথা বলার আছে। সন্ধ্যা নামছে। ছাদ থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারার রুপোলী রেখাটা। আজ একজনের কাছে নিজেকে পরিষ্কার করে তুলে ধরতে চায় সে, তার এই দ্বিধাজড়িত সংশয় বিজড়িত মনের যন্ত্রণাটা।

বলে ওঠে চঞ্চল—বুঝলে সুষমা, সমীর আজ রাত্রে এইখানেই খাবে। তুমি বরং শিবুকে বাজারে পাঠাও, মাংস আনুক। নিজেই অসহায় কণ্ঠে জানায় চঞ্চল।

—আজ থেকে যাও সমীর।

সমীর ওর এই পরিবর্তনে বিস্মিত হয়। কথাটা জানানো হয় নি। ক'দিন আগেই চিঠি এসেছে। চঞ্চলের একখানা উপন্যাসকে কোন নামকরা সাহিত্য সংস্থা এবারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে পুরস্কৃত করেছে। সমীর কথাটা জানাতেই চঞ্চল চুপ করে গেল।

সন্ধ্যার আলোয় দেখা যায় তার মুখে একটা কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। ওটা তার কাছে যেন বিশেষ কৃতিত্ব আর আনন্দের খবরই নয়।

চুপ করে কি ভাবছে চঞ্চল। আকাশে দুএকটা নিঃসঙ্গ তারা ফুটে ওঠে। হঠাৎ বলে ওঠে চঞ্চল।

—তোমাদের কারখানায় একটা চাকরী জোটে না সমীর!

—কেন? অবাক হয় সমীর।

হাসছে চঞ্চল—এসব ছেড়ে দিতাম। সামান্য চাকরী নিয়ে সব ভুলে দিন এনে দিন চালাতাম। জানার—ভাবার অনেক যন্ত্রণা সমীর। যতই জানবার চেষ্টা করে—ভাববে, বর্তমান সব রীতিনীতিগুলোকে মনে হবে অসার, প্রতিবাদ করতে চাইবে, বিনিময়ে তুমি পাবে অশান্তি জ্বালা আর অপবাদ। একদিন মনে হবে তাৎ এর মতো সব তছনছ করে জ্বালিয়ে দিই, সেই সঙ্গে আমার ঘর—আমিও জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাই'। একে রুখবে কি করে তুমি?

হাসছে চঞ্চল।···সমীর ওর কথাগুলো শুনছে। বলে সে।

—যদি নিজের পথ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়—তার ধ্বংস নেই। নিজে যদি শক্ত হতে পারে মানুষ অন্যায়ও তার কাছে মাথা নীচু করে।

হাসে চঞ্চল, এসব বই-এর কথা সমীর। পড়ে পড়ে নিজের মনের ভাবনাটা তোমার আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, ওদের দাগা বুলোনো কথাগুলোকেই বড় করে দেখেছো;

নিজের অন্তর কি চায় না অন্য কিছু ? সে কি সুখী হতে চায় না, সব পেতে চায় না ? সে চাওয়া পাওয়ার পথ এমনি জ্বালায় ভরা।

সমীর কিছুদিন থেকেই কথাটা ভেবেছে। ওর মনের এই জ্বালা খানিকটা কাল্পনিক। বোধ হয় ওর মনের বিকৃতিই। তার প্রতিভাকে সে বিশ্বাস করে সব ঘৃণা সত্ত্বেও। তার অন্তরে চঞ্চলের জন্য তবু কোথায় একটা কোমল অনুভূতি রয়ে গেছে।

কিন্তু যে পরিমাণ মদ খেয়ে চলেছে ও—তাতে ক'দিন সেই প্রতিভা থাকবে তা জানে না। সমীর প্রতিবাদ করবার কথাও ভেবেছে। এতদিন সে কথা বলে নি। ওর মনের অতলে কোথায় অনুশোচনার সুর শুনেছে। তাই জানায় সমীর।

—এত মদ খাও কেন ? এমনি করে তিলে তিলে নিজেকে পুড়িয়ে দিয়ে কি লাভ হবে বলতে পারো ?

চঞ্চল চুপ করে আজ কথাটা শোনে। নিজেও অনুভব করেছে আগে যে পরিষ্কার মন, স্বচ্ছ দৃষ্টি আর হৃদয় দিয়ে লোকগুলোকে দেখেছে, ওই চটকলের মজুরদের চিনেছে—ভালবেসেছে, ভালবেসেছে ওই চাল স্মাগলার কলোনীর ছেলেমেয়েদের—সতীমায়ের থানের আউল বাউলদের এমনকি বিচিত্র নেশার সেই মানুষগুলোকে, সেই বেদনার অনুভূতিটা ম্লান হয়ে আসে।

ওদের কথা বলতে গিয়ে মনে আসে নাগরিক কৃত্রিমতা। মনে হয় জীবন শান্ত নয়—সে কামনামুখর। তার মনের জগতে ভিড় করে আসে মানুষের মনের অতলের পাপ…কামনার বিকৃতি আর লালসাটাই। মনে হয় কোন দুঃখ বেদনা জীবন সত্য নয়, সমাজের নর-নারীর এই বিকৃত অবক্ষয়টাকে দেখতে চায়, ভেঙ্গে ফেলতে চায় সব সংস্কার ! নৈতিক কাঠামো। তার অতল মনটাই জেগে ওঠে সরীসৃপের মতো বিষাক্ত ফলা মেলে, সেই রূপটাকে দেখে আনন্দ পায়। তাই মদ খায়, উন্মাদ দুর্বার হয়ে উঠতে চায় সে।

এ তার নিজের কাছেই বেদনাদায়ক। তবু তাকে এড়াতে পারে না। সমীরের কথায় হাসল সে। জবাব দেয়।

—ওটা এযুগের অভিশাপই বলতে পারো। এর কারণ যদি নিজেই জানতাম তাহলে হয়তো শোধরাবার চেষ্টা করতাম। তবে মনে হয় কি জানো—সত্যকে কেউ যদি স্পর্শ করতে চায়, জীবনে পেতে চায় তাকে, সাধনা করতে হয়। সে সাধন পথ ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম ; তার থেকে যোগভ্রষ্টও অনেকে হয়। অন্ধকার নিশীথে তারা হারিয়ে যায়।

সমীর ওর অসহায় মনের হতাশ বেদনার প্রতিবাদ করে।

—তুমি হারাবে না চঞ্চল। সব অন্ধকারের মাঝে তোমার সাহিত্য জীবনসত্যে ভাস্বর হয়ে উঠবে। তোমার লেখায় সেই শক্তি আছে।

একথা চঞ্চল ভেবেছে মনে মনে। কোথায় তার একটা কর্তব্য আছে, দায়িত্ব

আছে। সমাজের—মানুষের প্রতি শিল্পী সাহিত্যিকদের সেই মহান কর্তব্য। সব আঘাত বেদনা অবক্ষয় আজ জীবনের সব আনন্দকে ম্লান করেছে। মনুষ্যত্ব আজ পদে পদে নিপীড়িত।

মানুষের জন্য কেউ ভাবে না ঃ রাজনীতির নোংরামির মধ্যে তলিয়ে গিয়ে মানুষ াজ ধ্বংসের পথে চলেছে।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এতবড় সামগ্রিক বিপর্যয় মানুষের জীবনে াসে নি।

রমণীবাবু প্রকাশকদের মধ্যে প্রাচীনতম, সজ্জন লোক। মোটা দেহ, চোখে লফ্রেমের পুরু চশমা, নিবিষ্ট মনে কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে কোন খদ্দেরের সঙ্গে কথা লছিলেন। সাধারণ সাদাসিদে সাবেকী ধরনের লোক। গায়ে জামা বড় একটা াকে না। একটা চাদর জড়ান, সেটাও পাশে রেখে আদুড় গায়েই কার বিলের টাকা দিচ্ছিলেন।

বেশ মোটা টাকার বিল, সবই দিয়েছেন প্রায় দেড়হাজার টাকা, এসে ঠেকেছে ুচরো তিন আনায়। রমণীবাবুর হঠাৎ খেয়াল হয় অনেক দিয়ে ফেলেছেন। াই বলেন।

—ওটা আর দেব না।

ভদ্রলোক জানায়—আমি বিল সরকার। কোম্পানী আমার কাছ থেকে সব টাকা বল দুষ্টে বুঝে নেবেন।

—তিন আনা ছাড়বে না? ধড়িবাজ লোক তো হে তুমি। নাও। ব্যস! আর বিল নিয়ে তুমি আসবে না।

হঠাৎ পাশেই একটি ভদ্রমহিলা ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে নজর ড়তেই রমণীবাবু খ্যাঁক্ করে ওঠেন।

—আপনার কি বই চাই?

ভদ্রমহিলা ওর ওই মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেছেন। মুখ নীচু করে ফিরে যাচ্ছেন াখে বলেন রমণীবাবু—চলে যাচ্ছেন যে? কি চাই আপনার। ভদ্রমহিলা লেন।

—আপনি এখন ব্যস্ত,

—ব্যস্ত আমি সব সময়েই। বলুন—

ভদ্রমহিলা বলেন—আমি বড় গরীব।

রমণীবাবুর ফেটে পড়ার পালা, কিন্তু তা হ'ল না। রমণীবাবু বয়স্কা মহিলার ক চাইলেন। জীবনে দারিদ্র্যের জ্বালা তিনি জানেন। অনেক কষ্ট পেয়েছেন, ু নিজের পরিশ্রমে আজ কলকাতার অন্যতম বিশিষ্ট প্রকাশক ব্যবসায়ী। মহিলা বলেন।

—আমার ছেলের ক'খানা বই-এর দরকার। কিন্তু কেনার সামর্থ্য আমার নেই।

সামনে পরীক্ষা! ছেলেকে বইগুলো দিতে না পারলে—ভদ্রমহিলা কথাগুলে শেষ করতে পারেন না, ওর চোখ ছলছল করে ওঠে। কোন রকমে আত্মসংবর করলেন। রমণীবাবু কি ভাবছেন। এ যেন অন্য মানুষ।

—ধীরকণ্ঠে বলেন কর্মচারীকে।

—ওহে মনু, দেখতো এর লিষ্টটা। যা বই আছে দিয়ে দাও। দিন, ওকে ও বই-এর নামগুলো। ছেলেকে মন দিয়ে পড়তে বলবেন—বুঝলেন। ভদ্রমহিল কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারেন না। কম্পিত হাতে লিষ্টটা দেন। বলবা চেষ্টা করেন।

—অশেষ উপকার করলেন আমার! কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো—রমণীবাব এইবার ফেটে পড়েন—ওসব থামান দিকি! যতো ঝামেলা। ধন্যবাদ!

দুনিয়ায় ওর দাম কি! যান—বই নিয়ে দয়া করে আসুন!

ধমকানি খেয়ে ভদ্রমহিলা ঘাবড়ে যান। রমণীবাবুর বিরাম নেই, হঠাৎ সামনে চঞ্চলকে ঢুকতে দেখে বেশ চড়াস্বরেই বলেন।

—এ্যাই যে রাজপুত্তুর এলেন!

রমণীবাবু ওর উপর রীতিমতো রেগে গেছেন। বৃদ্ধের সাহিত্যিকদের উপ একটা সহজাত ভালোবাসা আছে। চঞ্চলের প্রকাশকই শুধু নন তিনি। তাকে ভালওবাসেন। তার চলে যাওয়ার খবর পেয়ে নিজে গেছিলেন ওর বাড়িতে। বং আটকে থাকার চেয়ে—ওর এই ব্যবহারটাকে সহ্য করতে পারেন নি তিনি। তাছাড় নিজের; মনে হয় সাহিত্য ক্ষেত্রে ওর এই অসীম মমতাকে অনেকেই সহ্য করবে না হিংসা করে মনে মনে। তার নিজের ক্ষমতাটা তবু ওই চঞ্চল বুঝল না।

রমণীবাবু বলে চলেছেন কড়া স্বরে।

—তোমার চেয়ে ঢের বাউণ্ডুলে সাহিত্যিক আমি দেখেছি। তোমার মতো ছন্নবে দেখি না। বোমা সংসার ফেলে বাবু গৃহত্যাগ করেছিলেন। তা বুদ্ধ হয়ে ফিরেছে না বুদ্ধু হয়েই রইলে? এ্যাঁ! বসুন—না আড্ডায় যেতে হবে, অনেকদিন যাওয় হয় নি।

লোকটিকে চঞ্চল শ্রদ্ধা করে। মুখের উপর স্পষ্ট কথাটা বলার সাহস—ভালোবাসা ওর আছে। চঞ্চল চেয়ারে বসল। বলে ওঠে।

—এসব কি বলছেন রমণীদা?

—ঠিকই বলছি। সব কিছুরই সীমা আছে, সেইটাই ছাড়িয়ে যাচ্ছো। আর যারা ওই বন্ধুরা এত খাতির করছে—তারা সেদিন ফিরেও চাইবে না। নিংড়ে ছোবড়া করে ফেলে দেবে। তাই বলছিলাম ভগবান যে ক্ষমতা দিয়েছেন সেটা অপব্যবহার করো না। বুঝে চলো—। ওরে চঞ্চলবাবুর জন্যে কাটলেট আর। আন। প্রুফগুলো দিয়ে যা ওঁর। নোতুন লেখা কবে পাবো?—পাবেন শীগ্গির

কথাটা চঞ্চলও ভেবেছে। রমণীদা জানেন ওর বন্ধু বান্ধবদের।

তবু চঞ্চল অনেকদিন পর এসেছে এখানে। এঁরা প্রকাশকেরও উপরে। 'মান সাহিত্য জগতের এরাই যেন ভাগ্যবিধাতা।…তাঁদের মনে হয় এতদিন বাংলা 'হত্য যা হয়েছে তা প্রায়ই অন্তঃসার-শূন্যে। মানুষের সামগ্রিক সমস্যা, প্রকৃতির ? মানুষের মনের সম্বন্ধ, তার দৈনন্দিন জীবনের পথে বাঁচার জন্য সংগ্রাম ওসব রোনো কথা। সাহিত্য তাতে বুলেটিনধর্মী,—প্রচারধর্মী হয়ে ওঠে। চঞ্চলের মানুষ সমাজ তার বাঁচার সমস্যা আজকের দিনে রাজনীতির নোংরামি এসব য় সাহিত্যে কোন আলোচনা থাকা তাদের ধারণায় সাহিত্যধর্ম বিরোধী।

ওরা দামী হোটেলের লাগোয়া বারে মাঝে মাঝে এসে জড়ো হয়। মদের খরচা দেয়—কোত্থেকে আসে তা সঠিক জানে না চঞ্চল। তবে তাকে ওরাই খাওয়ায়। জ অনেকদিন পর দেখা হতে খুশী হয়েছে ওরা।

চঞ্চল আজ কথাগুলো বেশ জোর দিযেই শোনায়—মানুষের এতবড় বিপর্যয় আর সে নি। সাহিত্যের ধর্ম মানুষকে চেনা, তার সমস্যাকে প্রকট করা ও তাকে র্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

চলের কথাগুলো ওদের মনে সাড়া জাগায়।

াতাসে পামগাছের পাতাগুলো নড়ছে, ওদিকে একটা পাথরের কৃত্রিম ফোয়ারা জলে পড়েছে রং বেরং-এর আলো। বর্ণময় সফেন হয়ে উঠেছে তার চারিদিক। র যুঁই এর সবুজ লতায় সাদা ফুলগুলো রাতের অন্ধকারে ফুটে রয়েছে, আবছা ায় তাদের দেখা যায় পুঞ্জ সবুজের বুকে কে যেন সাদা ফুলের চন্দনবিন্দু য় দিয়েছে।

ওদের সুরভি এখানে বৃথাই বাতাসে হারিয়ে যায়। বেয়ারার দল ট্রেতে করে । পানীয় আনে। গেলাসের তলা থেকে সোনালী সেই পানীয়ে ওঠে অফুরাণ দগুলো।

ঞ্চল ইতস্ততঃ করে। মনে মনে ঠিক করেছে সে—খাবো না।

াসছে সাহিত্যরসিক বন্ধু—সে কি হে!

ন্যতম নবীন শক্তিমান লেখক বলে।

—ওই গ্লাশ থেকে বুদবুদ উঠছে দেখছো? ওটা প্রাণের প্রতীক। জীবনধর্মের । মানুষের বাইরে—সমাজ—অর্থনীতি আর রাজনীতিতে কোন আবর্ত কি না জানি না, মানুষের মনই তার প্রতিবিম্ব। তাতেই দ্বিধাবিভক্ত মানুষের তন মন জেগে উঠছে—তাকে নিয়ে, তার আশা আনন্দ নিয়েই গড়ে উঠবে কর সাহিত্য। চঞ্চলদার ওসব মতিভ্রম হয় মাঝে মাঝে! নাও, সুরু করো

লর ভাবনা—সেই অনুভূতির কাঠিন্য অনেকটা সহজ হয়ে আসে। ওদের ভিড়েছে, না ওকে ওরাই জোর করে তাদের বিকৃত বোধে উদ্দীপ্ত করতে চায় ানে না চঞ্চল। তবে তারও নেশা লাগে, জীবন এখানে উছল, আনন্দ আর

ভোগের সব উপকরণই হাতের কাছে অযাচিতভাবে আসে। টাকা! নোতুন লে
জন্যও আমন্ত্রণ আসে। করকরে দশখানা একশো টাকার নোট আগাম। সাহিত্যদ
সমঝদার সম্পাদক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি বদলাতে চান। পুরোনো সাবেকী
মানুষের সত্যসুন্দরকে স্বীকার করা—মানুষের সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোক
করে অন্যায়কে ঘৃণা করা—ইত্যাদি ব্যাপার এখন স্কুলপাঠ্য রচনায় পর্যবা
হয়েছে।

এখন মানুষের প্রবল যৌবনফাল। তার উদ্বেল বাধা বন্ধনহীন যৌবন ইউরো
সাহিত্য ক্ষেত্রে যে বিপুল বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে আমাদের সাহিত্যেও ত
আনতে হবে। এই সভ্যতার বিকৃতির কদর্য রূপকে প্রকাশ করতে হবে দেহ
মনন দিয়ে।

কে বলে ওঠে—ওদেশের নোতুন যুগের ছবিগুলো দেখেছেন?

চঞ্চলকে তারই আমন্ত্রণ জানায়। চঞ্চল ওদের কাছে যেন একটা শিকারের বস্
ওকে নিয়ে ওদের মাতামাতি। ওরা সকলেই চায়—যে চিন্তা, বৈপ্লবিক দেহসর্ব
সাহিত্যের কথা ভাবছে সেটা প্রথম আসুক অমনি কোন শক্তিমান কৃতী সাহিত্যি
কাছ থেকে। সাধারণ পাঠকের মনকে তবেই সেটা সাহিত্যের নোতুন পথ ব
হয়তো স্বীকৃতি পাবে।

নোতুন ছবির প্রদর্শনী। এ ছবি তাদের দেশে সাড়া তুলেছে। সাহিত্য অ
ছবিতে এসেছে সে দেশে এমনি বিপ্লব। ছোট্ট সিনেমা হাউস। সাধারণ প্রদর্শ
এটা নয়। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত অতিথি এবং সুধী রুচিবান দর্শকদের সামনে
ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে।

শীতের শেষ পাদ। রাত্রি হয়ে এসেছে।

চঞ্চল বন্ধুদের সঙ্গে এসেছে, সারা দেহ মনে তখনও সেই মদের নেশা, দু
গোলাপী আমেজ। পাশেই সেই টাকাগুলো। আরও আসবে সেই টা
বন্ধুটি লোভ দেখিয়েছে গাড়ি হবে, চাইকি সহরেই আরও বাড়ি
সব হবে।

এমনি করে ট্রামে বাসে ভিড় ঠেলে ঘুরতে হবে না, ট্যাক্সির জন্য হা পিত্যেশ
দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

এতদিন যেপথে সাহিত্য করেছে তাতে তার দিন চলেছে মাত্র, নোতুন দৃষ্টি
তার সাহিত্যকে আজ টাকার পাহাড়ে পরিণত করবে। গাড়ি থেকে নামছে ল
সামনে।

গাছ গাছালি ঘেরা স্তব্ধ ঠাঁই, ওপাশেই ছোট হলটা, বাইরের লনে তখন ডা
ফুলগুলো ফুটে রয়েছে, হলুদ গোলাপী—বেগুণী ফুলে পড়েছে ফ্লোরেসেন্ট লাই
আভাস।

—হ্যাল্লো! চঞ্চল।

চঞ্চলের মনে তখন নেশার স্বপ্ন; মদের নেশা, টাকার নেশা খ্যাতির নেশা—তার সারা দেহের তন্ত্রীতে একটা উছল লাস্য জাগে। মিস্ চ্যাড্রিকে ওখানে দেখবে ভাবে নি। চিরযৌবনা মিস্ অলকা চৌধুরী এখনও স্তাবক মহলে চ্যাড্রি নামেই পরিচিতা। উপরতলার অনেক প্রতিষ্ঠাবান মহলে তার যোগাযোগ, কলকাতা দিল্লী সর্বত্রই তার গতায়াত।

চ্যাড্রি অনেক দিন পর চঞ্চলকে দেখে এগিয়ে আসে। মোমমাজা চকচকে দুটো হাত তার থেকে লীলায়িত ছন্দে দুলেছে, নিটোল পুরুষ্ট দেহ। ভারি হয়ে এসেছে তবু তাকে শ্লিম্ করে সুন্দরী এবং সুগঠিতা থাকার দুরন্ত প্রয়াস ফুটে উঠেছে। সিল্কের বাতিক প্রিন্টের হাল্কা রং-এর শাড়ির আঁচল ওই বরতনু থেকে খসে পড়ছে বার বার, ফুটে উঠেছে ওর নিটোল দেহ।

চঞ্চল টের পায় ওর মুখেও মিষ্টি একটু সুবাস; বোধ হয় স্যাম্পেন খেয়েছে। চ্যাড্রি চঞ্চলকে গালে হাত দিয়ে আদর করে।

—ইউ সুইট সোনি! শুনলাম নিরুদ্দেশ হয়ে গেছলে? এ্যানি লাভ এফেয়ার? সঙ্গে কেউ ছিল—না একাই!

হাসছে ওরা সকলেই। এ মহলে ক্যান্ডিকে সবাই চেনে। ক্যান্ডিও আজকের সাহিত্য--কলা ছবি—নাটক সবকিছুরই একজন বিদগ্ধ সমালোচক। চঞ্চলকে এখানে দেখে ক্যান্ডি বলে।

—রাইট ম্যান ইন্ রাইট প্লেস। তখনই তোমাদের বলেছিলাম দত্ত সাহেব, ক্যান সাহিত্যিক শিল্পীদের ডাকো, তাদের নাহলে তোমাদের কথাটা পাঠকমহলে কারা জানাবে? নাউ লেট আস মুভ! ছবি সুরু হয়েছে। চঞ্চলকে নিজের পাশে বসিয়েছে চ্যাড্রি; স্যাম্পু করা চুল থেকে মিষ্টি সুবাস বের হচ্ছে। হলটায় এলোপিলো লাগানো বেশ কৌচ টাইপের সিট, এদিকে ওদিকে ওরা ছড়িয়ে বসেছে, অন্ধকার হতে যে যার রাজ্যে হারিয়ে যায়।

পর্দায় ছবি চলেছে।

চঞ্চল ঠিক এ ছবিতে অভ্যস্ত নয়। এতদিন যা দেখেছে সেই সব চিন্তাধারা চেতবোধের মূলে এ আঘাত হানে। মানুষের এতটুকু গোপনতম মহত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য ওরা যা কদর্য পরিবেশ, যৌন আবেদনের নগ্ন প্রকাশ করেছে, তাতে মহত্ত্বটুকুকে বড় করে দেখানোই আসল কথা নয়, ওটা একটা ছল মাত্র, আসল দৃশ্য সেই বিকৃত যৌনজীবনের কদর্য এবং সোচ্চার প্রকাশ।

—চ্যাড্রি!

চ্যাড্রি ওর দিকে চাইল। চঞ্চলের মানবমন যে এতক্ষণ এসব কথা ভাবছিল সেটা হারিয়ে যাচ্ছে। মদের নেশাটা তার সারা দেহে কামনার শিহরণ আনে—…

দুটো চক চক করছে সেই জ্বালার প্রদীপ্ত আভায়।

চ্যাড্রির নরম নিটোল হাত দুটো ওর দেহটাকে ঘিরে ধরেছে, চুলের মিষ্টি গন্ধ

মুখে স্যাম্‌পেনের উদগ্র সুরভি—ওই নিটোল দেহের উত্তাপ তার দেহে বিচিত্র ত
একটা সাড়া এনেছে।

—সব ভুলে যেতে চায় সে। নীল নেশার গহনে তার জ্বালাভরা এক তৃপ্ত আশ্বাস খোঁজে। সারা শরীরের উত্তাপ দিয়ে সে জড়িয়ে ধরেছে ওই মাংসে দেহটা-কাছে টানছে তাকে।

চ্যাড্রি ফিস্‌ ফিস্‌ করে।

—ইউ ব্যাড বয়।

হাঁপাচ্ছে চঞ্চল।……নিজেকে ওর বাঁধন থেকে মুক্ত করে নেয় চ্যাড্রি। ওর অন্ত মনে তীব্র সাড়াটাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল সে, চঞ্চল কি নেশায় মেতে উঠেছে।

হাসছে চ্যাড্রি, চোখের কোণে সেই হাসির আভা চঞ্চলের মনের ঝড়টাকে দ্বিগু করে তোলে, তার সব নীতিবোধ, বিবেক ওসব তুচ্ছ বলে মনে হয়। চ্যাড্রি ব কৃত্রিম রাগত স্বরে ঠোঁটের পালিশ ঠিক করে—ইউ আর ভেরি সিলি চঞ্চল।

পর্দায় তখনও সেই ছবিটা চলেছে। ওরা এমনি করেই বর্তমানকে সব ভাবন সমস্যাকে এড়িয়ে থাকতে চায়, ভুলতে চায়।

ওদের সকলকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য এই আয়োজন কোথায় করা হচ্ছে নি ভাবে, তাকে পৃথিবীর কিছু মানুষ তাদেরই স্বার্থে নামকরণ করেছে নোতুন য মানসের চিন্তার প্রতিফলন। সেই যুগ গড়ে উঠেছে চঞ্চল—চ্যাড্রি ওই বন্ধুবান নোতুন যুগের চিন্তানায়কদের নিয়ে। বিচিত্র এক ধর্মে তাদের দীক্ষিত ক পর্ব চলেছে।

ক'দিনেই সারা শহরে একটা পরিবর্তন এসে গেছে, গোবিনের দোকানের র বদলেছে। সহরের মধ্যে গোবিন কোন অদৃশ্য পথে লক্ষ্মীর সন্ধান পেয়ে মনে হয় এখানের বাতাসে কাঁচা টাকা উড়ছে। যে যে ভাবে পারে ধরে নেয়। চা দর উঠছে হু হু করে। সাধারণ মানুষ আজ বাজার করতে গিয়ে থমকে দাঁড়া আলু-কুমড়ো আনাজপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। মাছও তাই। দিন চালানো দায়

অন্যদিকে কোথায় যেন প্রচুর টাকার ছিনিমিনি খেলা চলছে, সাধারণ মানু হাত থেকে তাদের বহু কষ্টের অর্থ টুকু নিঃশেষ হয়ে চলেছে—কোন গো অন্ধকারের দিকে। তা আর বইরে আসছে না।

কিন্তু ওদের অবস্থা তবু বদলায় নি। গোবিনের দোকানের ভিতর ন আশমানি রং উঠেছে, এয়ার কুলার বসাচ্ছে সে। জানলাগুলোয় ঘষা কাচের আবর ভিতরে এইবার অনেক নাটকই জমবে।

তিনকড়ি বাবু এখন মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, চাই কি ভাইস-চেয়ারম্যা হবে। শ্রীদামের কারবার জোর চলেছে। গাড়ি কিনেছে শ্রীদামবাবু, তার পোষ আসাকও বদলে গেছে। তিনকড়ি এখনও মটরসাইকেলেই ঘোরাঘুরি করে। নাকি দেশসেবা সমাজসেবার কর্মব্যস্ততার পরিচয়।

ইদানীং তিনকড়ির কাজকর্ম আরও বেড়ে গেছে। পাটকল মজদুর সমিতি গড়েছে, তাদের আগেকার ইউনিয়ন থেকে ভেঙ্গে কিছু লোকও এসেছে তার দলে। কয়েকটা পাটকলেই তার সমিতি আছে। মালিক পক্ষও তাকে হাতে হাতে রাখতে চায়!

তাদের নিয়েও ব্যস্ত হয়ে থাকে তিনকড়ি। রাত্রি অবধি তার ঘোরাঘুরি চলে নানা জায়গায়।

রাত হয়ে গেছে। শেষ ট্রেনে ফিরছে চঞ্চল। সারা মনে তার নেশার আবেশ। চোখ দুটো লাল, মাথার স্যাম্পু করা চুলে হাওয়া লেগে এলোমেলো হয়ে গেছে, মুখে গন্ধ ঢাকবার জন্য খোসবু পান খেয়েছে, তাতেও গন্ধ যায় নি। ওই আতরের গন্ধ আর মদের গন্ধ মিশে বিশ্রী একটা উৎকৃষ্ট তীব্র গন্ধ ওঠে।

ফাস্টক্লাশ থেকে নেমে টলতে টলতে এগিয়ে আসে। তিনকড়ি তখন মটরসাইকেল থেকে মাটিতে একটা পা রেখে রিক্সাওয়ালাদের কি গণ্ডগোলের মধ্যস্থতা করছে।

চঞ্চলকে আসতে দেখে রিক্সাওয়ালাদের কে এগিয়ে যায়, ওদের চেনা খদ্দের। রোজকার খদ্দেরই চঞ্চলবাবু।

তিনকড়ি ওকে দেখে হাঁক পাড়ে—চঞ্চলবাবু না?

চঞ্চল ওর দিকে চাইল। তিনকড়ি ওকে দেখছে। তার নেশাটাও চেপে ওঠে। এতক্ষণ সঙ্গী পায় নি—তাই যেন সহজ মানুষ হয়ে ছিল সে, এইবার রক্তে মাতন লাগে।

—গুরু যে! এসো এসো;

—বাড়ি ফিরতে হবে! কাজে বসবো।

চঞ্চলের মনের সেই নেশাটাকে লেখায় আনতে চায় সে। নীল নেলা—কামনার নেশা। তিনকড়ি বলে।

—কাজ তো আছেই। চল, একটু নোতুন জায়গায় নিয়ে যাবো। লেখার মৌজ আসবে ব্রাদার। ওঠো, তিনকড়ির সন্ধানে নানান কিছু থাকে। ও-ই চঞ্চলের এ পথের দীক্ষাগুরু। মেয়েছেলে—মদ—জুয়া ইত্যাদিতে সে এখানকার অন্যতম নেতা। চঞ্চলের মনে পড়ে বাড়িতে গিয়ে দেখবে সেই সুষমা আর বাচ্চাটাকে। সুষমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে, মেয়েদের অমনিই। বিয়ের আগে—বাচ্চা হবার আগে থাকে নাদুস-নুদুস আহ্লাদীগোছের। বিয়ে হল—বাচ্চা হলো ব্যস একেবারে তখন বন্দী রুগী! রোগগুলো যেন এতদিন কেবল অপেক্ষা করে ছিল।

—চলো গুরু। ওঠো।

চঞ্চল জানে ওর যাবার ঠাঁই অনেক। কল্যাণীর দিকে না হয় ওপাশের গুদামের দিকে—না হয় পাটকল মজুরদের ধাওড়ার দিকে, না হয় সনাতন সেই দেহবেসাতিনীদের পাড়ায়।

গোবিন্দের দোকানের পিছনদিকের দরজা দিনরাত্রিই খোলা, তিনকড়ি বলে।

—একটু বউনি করে যাই।

রাত হয়েছে পারঘাটের যাতায়াত কমে গেছে। মাঝি মল্লারা নৌকা বেঁ এইবার তোলা উনুনে ভাত আর ভাজি পাকাচ্ছে।···কদমের কাজ সারা আজকে মতো। হিসাবপত্র করে পয়সা গুনে গেঁথে তুলে তার নিজের রান্নাবান্না ক নেবে।

হিসাবপত্র করে দেয় খাতাবাবু ও আধবুড়ো ঘনশ্যাম। রাতের অন্ধকারে গঙ্গ ধারে জায়গাটা নির্জন হয়ে আসে। দূরে শ্মশানের ওখানে চিতা জ্বলছে। লাল শিখাটা আকাশে ওঠে।

তখন এইখানের শূন্যতার মাঝে কদম আর খাতাবাবু যেন কোন জগতে হারি যায়। খাতাবাবু বলে।

—বুঝলি কদম, তোরও যা হাল আমারও সেই-ই হাল। যাবার ঠাঁই আর নেই সব ঠাঁই ঘুরে যেন শেষকালে তুই ঠেকেছিস পারঘাটে, ব্যাটা কিনা শ্মশানে। যেখ থেকে সবাই ওপারের টিকিট কাটে!

হঠাৎ সামনে ওই তিনকড়িকে দেখে অবাক হয় কদম আর খাতাবাবু।

তিনু তৈরী হয়েই এসেছে।···চঞ্চল বাইরে রয়ে গেছে ওই বটগাছের চাতালে খাতাবাবুকে দেখে থমকে দাঁড়াল তিনুবাবু! বলে ওঠে চড়া গলায়।

—তাই সবাই বলে নানা কথা। কাঠের দাম জমা পড়ে না—কাজ ফে এইখানেই আসা হয় বুঝি এঁ্যা।

তিনকড়িবাবু মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান আর ওই খনশ্যাম সামান্য একড কর্মচারী মাত্র। তাই ঘনশ্যাম আমতা আমতা করে।

—না, একটু কাজ ছিল। এ্যাই যাচ্ছি—খাতাপত্র কিন্তু ঠিক আছে বাবু!

—থাক। পরে দেখবো।

খাতাবাবু বের হয়ে গেলো ভয়ে ভয়ে। কদম কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চলে যেতেই তিনকড়ি ঠা ঠা শব্দে হেসে ওঠে। কদমের মনে ভয়ের একটা কাে ছায়া নামে। মাতাল ওই লোকটার কথা জানে সে। ইদানীং পয়সাও বে কামিয়েছে অন্ধকার পথে। সহরের অনেক গুন্ডা বদমাইসও তার হাতের মুঠোয় তারপর হালফিল মিউনিসিপ্যালিটিরও মাতব্বর হয়েছে।

তিনকড়ি বলে।

—কি রে, ঘাট চলছে কেমন?

কদম হাসবার চেষ্টা করে। সে জেনেছে ভয় পেয়েছে এটা জানতে পারলেই পেয়ে বসবে। তাই কদম জবাব দেয়।

—তেমন আর কই চলছে! বসুন!···

হাসে তিনকড়ি—বসবো তো, তা আছে কিছু? তোর তো চঞ্চল না এত বার আসা যাওয়া করে তবু নিরিমিষ্যিই রয়ে গেলি?

কদম জবাব না দিয়ে বের হয়ে এল। তার কেমন ভয় করছে। তবু ঘাটের মাঝি মাল্লারা থাকলে সুবিধা হতো, হঠাৎ বটগাছের চাতালে চঞ্চলকে দেখে দাঁড়াল।

—গোঁসাই! নোতুন গোঁসাই—তুমি শেষকালে—পুরানো ক'দিনের সেই পরিচয়। পথের মাঝে উদার দিগন্তে দুজন দুজনকে চিনেছিল। কদমের মনে হয় ওই চঞ্চল যেন সেই রাতের ফিরিয়ে দেবার প্রতিশোধ নিতে এসেছে। আজ ওরা রাতের অন্ধকারে জোর করে তার সবকিছু লুট করে নিয়ে যাবে। ঘৃণায় অসহায় রাগে মেয়েটা যেন ফেটে পড়ে। চঞ্চলের চোখে মদের নেশা।—তার সারা মনে রুপালী পর্দায় দেখা সেই বীভৎস ছবিটার কথা মনে পড়ে। অবচেতন মনের সব কামনাগুলো সাপের মতো ফণা মেলে ওঠে. ওর দম বন্ধ হয়ে আসে, কি অপরিসীম যন্ত্রণার তীব্রতা আকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে। চ্যাড্রির মাংসল দেহটা ফুটে ওঠে সামনে।

—কদম।

কদম বলে ওঠে।

—তুমি যদি শিয়াল কুকুরের ছোঁয়া দেহটাকে নিয়ে খুশী হও—আপত্তি করবো না। কিন্তু এ পাঁকের অতলে তলিয়ে যেও না গোঁসাই; এ লজ্জা রাখার ঠাঁই পাবে না। তবু খুশী হবে তুমি এটা পেলে?—বলো—

···কদমের হাতদুটো ওকে ধরেছে। সারা শরীরে ওর কঠিন ঋজুতা। তার গালে ওই মেয়েটা যেন চড় মারছে। ওই কথাগুলো তার মনে বিঁধছে তীক্ষ্ন আঘাতে। পালাতে চায় সে, নেশার ঘোর ওই কঠিন আঘাতে ছুটে গেছে।

হঠাৎ কার হাসির শব্দে ফিরে চাইল। তিনকড়ি বের হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের বাইরে। দূর থেকে ওদের এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে।

—বহুৎ আচ্ছা ওস্তাদ! সাবাস গুরু। আগে বলতে হয় সেম সাইড করতাম না! ব্যাণ্ডার!

ফিক্ ফিক্ করে হাসছে ওই তিনকড়ি। চঞ্চল সরে দাঁড়িয়েছে কদমের হাত থেকে মুক্ত হয়ে। মদের নেশাটা মাথায় উঠে গেছে—মনে হয় হাত দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে, চোখের সামনে মনে হয় একটা খ্যাপা জানোয়ার মত্ত উল্লাসে হাসছে, চঞ্চল দু হাত দিয়ে ওর কণ্ঠনালী টিপে ধরবে।

—তিনকড়ি।

তিনকড়ি ওকে অবজ্ঞা করে এগিয়ে গিয়ে মোটর সাইকেলের ষ্টার্টারে প্রচণ্ড একটা লাথি কসে, রাতের অন্ধকারে এনফিল্ড মোটর-বাইকের ইঞ্জিন গর্জন করে ওঠে, একচোখো বাঘের মতো খানিকটা আলোর আভা ফেলে গাড়িটা বের হয়ে যাবে। বলে তিনু—লোটো, তুমিই মজা লোটো।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে কদম, দেখে চঞ্চল রুদ্ধ আক্রোশে লাফ দিয়ে গিয়ে

তিনকড়ির মুখেই একটা ঘুসি চালিয়েছে। এর জন্য প্রস্তুত ছিল না তিনকড়ি, অতর্কিত আঘাতে ঠোঁটটা কেটে যায়—রক্ত পড়ছে। জিবে নোনতা একটা আস্বাদ লাগে।

মদ্যপ তিনকড়ির মাথায় যেন খুন চেপে যায়; চঞ্চল তখনও গর্জাচ্ছে। তিনকড়ি খানিকটা থু থু ফেলে—হাত দিয়ে ঠোঁট নাকের রক্ত মুছে বলে।

—কাজটা কিন্তু ভালো করলে না চঞ্চল!

ওরা সাপের জাত।…ওই আঘাত আর অপমান ওরা কোনদিনই ভুলতে পারে না। হেডলাইটের আলোটা পড়েছে কদমের মুখে, ওর দুচোখে ভয়ের ছায়া। তিনকড়ির কথাগুলো শুনেছে সে।

তিনকড়ি বের হয়ে গেল, চঞ্চল হাঁপাচ্ছে; কদমকে আজ নোতুন চোখে দেখেছে সে। তার মনের সেই কালো ছায়াটা আজ সব কিছু পেতে চায়। তিনকড়ির ঠোঁটের রক্ত তার হাতে—উষ্ণ একটা স্পর্শ। তারাও তার মনে দুর্বার আনন্দের আবেগে আনে। আরও গভীর ভাবে সেই আনন্দের অতলে ডুবে যেতে চায় চঞ্চল।

—মদ আছে? কদম—মদ!

কদম ওকে দেখছে। একদিন ভেবেছিল ও মানুষই। তার মনের অতলে সেই ভালো মানুষটাকে দেখেছিল অজয়ের তীরে পড়ন্ত রোদে—শালবন সীমার সবুজে; কিন্তু সেটা ওর আসল পরিচয় না, এই মাতাল জানোয়ারের স্বরূপটাই সত্যি এইটাই বুঝতে পারে নি। —কই! মদ আন!

কদমের মনে হয় এত বড় শয়তান তার সামনে দেখবে ভাবে নি। ওই তিনকড়ি আর এই মানুষটায় মূলতঃ কোন তফাৎ নেই। বোতল দুটো ওর সামনে ফেলে দিয়ে বলে।

—এখান থেকে চলে যাও। বাড়ি ঘর নেই? বিয়ে করেছো—বাচ্চা কাচ্ছা আছে।

—সাট থাক। খান্‌কী আবার জ্ঞান দিচ্ছে!

কদমের কাছে তার সব ধারণা মিথ্যে হয়ে গেছে। যে মানুষ চঞ্চলের কাছে আশ্রয় চেয়েছিল, নির্ভর চেয়েছিল। কিন্তু বিনিময়ে সে পেয়েছে নিদারুণ অপমান। নিজেরই ভুল হয়েছিল তার। সব মনুষ্যত্ব রাতের অন্ধকারে নেশার বিকৃতিতে হারিয়ে গেছে। কদম বলে চলেছে।

—যাও! যাও বলছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

চঞ্চল গজ গজ করে—অল্‌ রট্‌! সতীপনা! ইয়ার্কি!…টলতে টলতে বাড়ির দিকে ফিরছে। রাতের সুপ্তিমগ্ন সহরের পথে ও যেন মূর্তিমান গ্রহ টলে টলে চলছে ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মতো।

…সুষমার ঘুম আসে নি। একা এ বাড়িতে থাকতে ভয় লাগে। নীচের ঘর তাই সমীরকে আজ থাকতে হয়েছে। তার নাক ডাকার শব্দ ওঠে। সুষমা একাই

এঘরে জেগে আছে। বাচ্চাটা ঘুমিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে জানলা থেকে রাতের জনমানবহীন পথের দিকে চেয়ে থাকে। লোকটার কোন পাত্তা নেই। কতদিন পর বাড়ি ফিরলো, সুষমার মনে আবার আশার আলো জেগেছিল। মন দিয়ে কাজ করবে এববার। ওর ঘরে মন বসবে। নিজে সুখী হবে, সুষমা—ও বেবী সবাইকে নিয়ে চঞ্চল শান্তিতে বাস করবে।

কলকাতা গেছে কতদিনের পর। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে, প্রকাশকদের সঙ্গে কথাবার্তা আছে। কিছু টাকারও দরকার। কিন্তু এত রাত্রি হবে তা জানে না।

সুষমার মনে হয় কলকাতায় কাদের সঙ্গে ও বেশী মেশে কে জানে? তার সেই অদেখা সমাজটার সম্বন্ধে অনেক রকম ধারণাই তার হয়েছে। ভয়ও করে সুষমা।

শেষ ট্রেনও চলে গেল। একা এতবড় বাড়িতে থাকতে ভয় করে। সেই দুর্বার সাহস তার নেই। আগেকার মতো মনের জোর তার হারিয়ে গেছে। একটা ভীরুতা তার সব চিন্তা-ভাবনাকে আচ্ছন্ন করেছে।

গঙ্গার দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। কুয়াসা জমেছে গঙ্গার প্রশস্ত উদার বুকে। সমীর এসেছিল ডিউটি সেরে—খবর নিতে। চঞ্চলের সেই কথাগুলো মনে পড়ে তার। এতদিন অবহেলা আর ঘৃণাই ছিল তার মনে। চঞ্চলকে আজ সে নোতুন করে চিনেছে।

সমীরই বলে।

—রাতে একা থাকিস না। আমি বাড়ি থেকে ফিরে আসছি। তার মধ্যে যদি চঞ্চল এসে যায় ভালোই হবে।

কিন্তু চঞ্চল ফেরে নি। সমীর নীচেকার ঘরে শুয়ে পড়ছে।

কড়াটা নড়ছে! রাতের অন্ধকারে কড়া দুটো যেন খসে যাবে। সমীরের ঘুম ভেঙ্গে গেছে, সুষমারও তন্দ্রা এসেছিল, ঘুম ভেঙ্গে গেছে সেই কড়া নাড়ার শব্দে।

বাড়িতে চঞ্চল রাতে না থাকলে সমীরই এসে থাকে। সুষমার একা থাকতে ভয় লাগে। তাই দাদাকেও আসতে হয়। সমীর আলো জেলে দরজা খুলেই থমকে দাঁড়াল! চঞ্চল ঢুকছে! আটচল্লিশ ইঞ্চি কাঁচি ধুতি ওর লুটোচ্ছে, নর্দমার কাদা খিঁচের দাগ, চুলগুলো উস্কোখুস্কো; দেহের সব রক্তের আভা জেগেছে ওর মুখে, চোখ দুটোও লাল। টলছে—বগলে একটা দিশী মদের বোতল!

চমকে ওঠে সমীর চঞ্চলের এই অবস্থা দেখে। মানুষটার এমনি বীভৎস রূপ দেখে শিউরে উঠেছে সে। সমীর কঠিন স্বরে বলে।

—চঞ্চল!

চঞ্চল ওর দিকে চাইবার চেষ্টা করে; সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার ক্ষমতা নেই, রেলিংটা ধরে জবাব দেয় চঞ্চল!

—প্রেজেণ্ট স্যার! কি জ্ঞান দেবে নাকি ওই সদানন্দ মাণ্টারের মতো! লাইক টিচার লাইক ষ্টুডেণ্ট!

সুষমা কাঠ হয়ে গেছে। লজ্জায় রাগে আপমানে ফুলছে সে। ওর সব স্বপ্ন আর কামনার স্বর্গকে একটা প্রচণ্ড আঘাতে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে চঞ্চল! সুষমাও বলে।

—লজ্জা করে না তোমার ?

—লজ্জা! চঞ্চলের মেজাজটা এমনিতেই ভালো নেই। সেই ব্যর্থতার জ্বালা তার মনকে ভরিয়ে দিয়েছে। কলকাতার সভ্য সমাজ সেই সন্ধ্যার ছবি দেখার হলে টের পেয়েছে ভোগ আর আনন্দের স্বাদ, কিন্তু এখানে দেখেছে নীতি বিবেক সর্বত্রই মাথা তুলেছে—মায় ঘাটওয়ালী ওই হাফগেরস্থ মেয়েটাকে অবধি তাকে নিয়ে নির্মম রসিকতা করেছে, তারই বাড়িতে তার অন্নপুষ্ট মানুষগুলো পর্যন্ত তার এই কামনার নেশাটাকে—এই ব্যক্তিত্বকে সহ্য করতে পারে না। উপদেশ দেয়—ঘৃণা করে—

চঞ্চল ওই সমীরের চোখে দেখেছে ঘৃণা আর সুষমাও তার থেকে বাদ যায় নি—চঞ্চলের কাছে এটাই তার উষ্মার প্রধান কারণ। গর্জে ওঠে সে।

—তামাম দুনিয়ার উপদেশ দেবার লোকের অভাব নেই দেখছি। শ্লা বাজারের মাগী পর্যন্ত হিতোপদেশ দেয়—নীতিবাক্য আওড়ায়।

সুষমা চমকে ওঠে। তাকে এভাবে অপমান করবে চঞ্চল তার দাদার সামনে এটা ভাবতেই পারে নি সে।

সমীরই প্রতিবাদ করে।

—যা তা বলবে না চঞ্চল!

—আমার বাড়িতে আমার কথা বলার অধিকার আলবৎ আছে; ওসব ডুবে ডুবে জল খেয়ে সতী সেজে থাকি না আমি। সব হুফস্ করার মতো বুকের পাটা আমার আছে। আমি কাওয়ার্ড-হিপোক্রিট নই।

কেন এসেছো এ বাড়িতে? স্পিক আউট!

সমীরের মুখের রং বিবর্ণ হয়ে যায়। এমনি ভাবে অপমানিত হবে ভাবে নি কোনদিন।

সুষমা নিজের অপমান ভুলে দাদার দিকে চেয়ে থাকে। চঞ্চলকে থামাবার চেষ্টা করে।

—কি যা তা বলছ তুমি!

চঞ্চলের সারা গা পাক দিচ্ছে, কোন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে সে।... সেই অতৃপ্ত ক্ষুধার জ্বালা তার সারা শরীরে আলোড়ন আনে। উত্তেজনায় কাঁপছে সে—। গলা দিয়ে বিকৃত আওয়াজ ওঠে।

বমি করছে মুখ দিয়ে, সারা অন্তরের ক্লেদাক্ত পূতিগন্ধময় গরল বের হচ্ছে; সিঁড়িতে বসে পড়ে বমি করছে চঞ্চল।

সমীর সরে এল! সুষমা কি করবে ভাবতে পারে না। জীবনে এমনি ঘৃণ্য

ন্যক্কারজনক পরিস্থিতির সামনে পড়ে নি সে। ভালোবাসার স্বপ্ন রচনা করেছিল সে ওই মদ্যপ একটা লোককে ঘিরে।

খানিকটা জল মাথায় মুখে ছিটিয়ে দেয়, চঞ্চলের অর্দ্ধ অচেতন দেহটা এনে ওপাশের একটা তক্তপোষে শুইয়ে দিয়ে খানিকটা জল ঢেলে ওই ক্লেদটাকে ধুয়ে দেবার চেষ্টা করে।

রাত কত জানে না। সমীর দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, মুখ চোখ ওর থমথমে। ওই চঞ্চলের কথাতেই আঘাত পায় নি সে—তার চেয়ে বড় আঘাত পেয়েছে সে চঞ্চলের ওই চরম সর্বনাশের দৃশ্যে।

পকেট থেকে ছিটকে পড়েছে একশো টাকার কয়েকখানা নোট—খুচরো কিছু টাকা! চঞ্চল ওই টাকার কাছেই তার সবকিছু মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দিয়েছে বলেই মনে হয়। সমীর বলে।

—দরজাটা দিয়ে দে সুমি, বাড়ি যাচ্ছি।

সুষমার দাদাকে থাকতে বলার মতো মনের জোরও নেই। সমীর বের হয়ে যেতে দরজাটা বন্ধ করে পিট দিয়ে দাঁড়াল। এইবার অনুভব করে সুষমা—সে একা। ওই অর্দ্ধ অচেতন মদ্যপ চঞ্চল কখনও বিড়বিড় করে কি বকছে।

সুষমা একটা ব্যর্থ পরিহাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ মনে মনে কঠিন হবার চেষ্টা করে। আর ভালোবাসার স্বপ্ন তার নেই, নিজে বাঁচতে চায় সে তার সন্তানের জন্যই। মনে হয় খুব ক্লান্ত সুষমা, সারারাত্রি প্রায় জেগেই কেটেছে। চোখ জ্বলছে। বেদনায়—ক্লান্তিতে নয়; আবিষ্কার করে কাঁদছে সে, সুষমা আজ আবার হেরে গেছে, তাই কাঁদছে অসহায় একটি নারী—চারিদিকে তার অমারাত্রির অতল তমসা।

প্রতিমার মনে সমস্ত ব্যাপারটাই বিচিত্র ঠেকে। স্কুলের সীমানা পার হয়েছে কোন রকমে। অবশ্য পড়ার দিকে প্রতিমার বিশেষ আগ্রহ কোনকালেই ছিল না। নিজের মনের স্বরূপ যতদিন চেনে নি ততদিন তবু কিছুটা চেষ্টা ছিল, আরও পাঁচজন মেয়ের মতো পড়াশোনার চেষ্টা করছে। ক্রমশঃ তার অন্তরে জেগেছে নোতুন একটি সত্ত্বা। রাস্তায় ঘাটে সিনেমায় দেখেছে, পুরুষ-নারীর মধ্যে একটা রহস্যময় সম্পর্ক।

কৌতূহল জেগেছে, ক্রমশঃ নিজের দেহের কোষে কোষে অনুভব করেছে নোতুন একটা জাগরণের সাড়া। নিজেকে আরও সুন্দর করে তুলতে চায় সে—সাজিয়ে তুলে পুরুষের নজরে পড়তে চায় সে।

এমনি দিনে স্কুলের বাইরে সেই রেলকলোনীর ছেলেটিকে দেখে; একটু হাসি দিয়েই পরিচয়।…চিঠি!…কয়েকছত্র কাগজে সেই গোপন মনের প্রকাশ প্রতিমার সদ্যজাগর মনে সাড়া তোলে, আরও কিছু পেতে চায় সে। একটু ছোঁয়া—একটি ছোঁয়া—একটি মনের নিবিড় স্পর্শ।

ধীরে ধীরে অনুভব করে সে একা, বাবা—মা—দাদা বাড়ির আপনজন বলতে সবাই আছে তবু কোনখানে সে নিঃসঙ্গ মনের অজানা এই সাড়াটাকে তাদের সামনে প্রকাশ করা যায় না।

সেদিন সেই ছেলেটিকে ভালো লেগেছিল তার। ওকে দেখলেই তার মনে বেজে উঠতো বিচিত্র একটি সুর, মনে হতো বনের পাখীগুলো তার মনে সুর তুলেছে। মিষ্টি সুর—সকালের আলো সোনা রং তার মনের সব অন্ধকারকে দূর করে দিয়েছে।

এই সদানন্দবাবুই ধরে ফেলে তার চিঠি দেওয়া। ছেলেটিকে ডেকে খুব বকে দেন। প্রতিমা দূর থেকে ভীত চাহনি মেলে ছেলেটির মলিন বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়েছিল। তার মনে সেইদিন জেগেছিল একটা কাঠিন্য। ওরা তার কাছ থেকে অনেক কিছু ছিনিয়ে নিল জোর করে। তাকে নিষ্ঠুর বঞ্চনা সইতে হয়েছিল সেদিন।

ছেলেটির বাবাও বদলি হয়ে যায় অন্য কোন ষ্টেশনে, আর দেখে নি তাকে প্রতিমা। তবু মনের মধ্যে সেই সুরটা লেগেছিল করুণ একটা স্মৃতির মতো।

চোখের সামনে দেখেছে বাইরের জগতের আমন্ত্রণ। তার দেহযমুনায় এসেছে যৌবনের সাড়া। নিটোল দেহের কানায় কানায় নীরব উচ্ছ্বাস, দেখেছিল অনেককে। প্রতিমার নিঃসঙ্গ মন নিজের মধ্যেই সব বেদনাকে ঢাকতে চেয়েছিল। দিদিকে দেখেছিল—সেও সব হারিয়ে আবার একজনকে পেয়েছে। দেখেছে করুণাদিকেও।

সেজেগুজে বের হয়; প্রতিমাও চেনে তাকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে করুণার দিকে চেয়ে থাকতো। পাড়ার দুএকজন ছেলে করুণার সঙ্গে থাকতো প্রায়ই। ওর স্তাবকের দল দেখে প্রতিমার মনেও একটা নীরব হিংসার সুর উঠতো। হিংসাই করতো সে মনে মনে।

এমনকি দিদিকেও। চঞ্চলকেও তার ভালো লেগেছিল।

কিন্তু সে ভালোলাগার কি স্বরূপ এবং সার্থকতা তা বুঝতো না।

—কি খবর প্রতিমা!

চঞ্চলের দুচোখে আলো ঝিকমিক করতো! তখন কাগজে—পত্র পত্রিকায় তার নাম ছাপা হতো, ছবিও বের হচ্ছে। সিনেমার পর্দায় দেখেছে চঞ্চলের গল্পের চিত্ররূপ।

স্কুলের মেয়েদের মধ্যে কে লুকিয়ে আনতো সিনেমা পত্র পত্রিকা। তাতেও ছাপা থাকতো চঞ্চলের গল্প। অনেক গল্পের পরিবেশ এমন কি মানুষগুলো পর্যন্ত তাদের চেনা।

মেয়েদের অনেকেই জানতো প্রতিমাদের বাড়িতে চঞ্চল যাতায়াত করে, ওদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা। তাই বলতো তারা।

কি রে প্রতিমা, তোর চঞ্চলদাকে বলে কয়ে এইবার সিনেমায় নেমে যা, রূপখানা বাগিয়েছিস ওই সন্ধ্যা রায়—সুপ্রিয়া চৌধুরী কোথায় লাগে!

লতিকা এমনিতেই ফাজিল। সে বলতো।

—ওর চঞ্চলদা এত বোকা নয়, সিনেমার নায়িকা করতে যাবে প্রতিমাকে?

—কেন রে?

লতিকা চোখ মটকে বলতো।

—তার নিজের মনোজগতের নায়িকা করে রাখবে প্রতিমাকে!

প্রতিমা লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠতো—ধাৎ! যত্তোসব বাজে কথা!

লতিকা মহা জ্ঞানীর মতো জবাব দেয়।

—লেখক—শিল্পীরা খুব ভালো লাভার হয় বুঝলি!

লতিকার কাছে লাভার কথাটি নানা রং-এর রোমান্স আর বিচিত্র অনুভূতি আনো। ওটা তেমনি আবেশ আনতো ওই বয়েসের মেয়েদের কল্পনারঙ্গীন মনে।

প্রতিমা ওসব কথা না ভেবে পারে নি। স্কুলের বন্ধুদের অনেকেরই অমন সঙ্গী একজন আছে। তাদের কাছে পুরুষের বিচিত্র মনের চাওয়ার অনেক গল্প শুনেছে; শুনেছে বিজলী কোন একটা ছেলের সঙ্গে মেশে। মাঝে মাঝে তারা বেড়াতে যায়—কলকাতায় সিনেমা দেখতে গেছে, রেস্টুরেন্টে খেয়েছেন। গল্প সারাদিন—না হয় ইডেন গার্ডেনের ছায়াঘন বৈকালে দেবদারু গাছের নীচে বনে ঝরাপাতার মর্মর শুনেছে।

প্রতিমার বঞ্চিত কুমারী মনে ওই ছায়াস্নিগ্ধ বৈকালের শূন্যতা জাগতো। ওরা জীবনকে চিনেছে, বিজলীর চেহারা তো অমনি কালো আংরার মতো, লতিকাও মোটা থসো। তারও মনের একজন সঙ্গী আছে। কিন্তু প্রতিমা তাদের চেয়ে অনেক সুন্দরী; তবু তার জীবনে রয়ে গেছে শূন্যতা আর নিঃস্বতা।

রমার বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। তারই সঙ্গে পড়ে। রমাদের বাড়ির অবস্থা ভালই। বাবা মা খুঁজে পেতে ভালো ছেলের সঙ্গেই বিয়ে দিচ্ছে।

ছেলে কোথাকার ডাক্তার। সুখী হবে রমা—তার জীবনে সার্থকতা নামবে।

প্রতিমার কাছে ওদের এই পাওয়ার খবরগুলো শুধু নীরব হাহাকারই আনে। মনটা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কারণ অকারণে সেই বিক্ষোভ ফেটে পড়ে বাড়িতে। একটা শাড়ি-জামাকে কেন্দ্র করেই কথা শোনায় মাকে।

এই জ্যালজ্যালে মেটে রং-এর শাড়ি পরে স্কুলে যাওয়া যায়?

কল্যাণীও মেয়ের মেজাজ দেখেছে কিছুদিন থেকে। প্রতীমা এমনিতেই একটু নিজেগুজে থাকতে ভালবাসে। তার নিজেকে কেন্দ্র করেই সবকিছু। প্রজাপতির মতো রং-এর স্বপ্ন তার চোখে, নিজেকেও রঙ্গীন করে সাজিয়ে রাখতে চায়।

কল্যাণী জবাব দেয়—একা সমীর আর কতটা দেবে বল। তিমিরের চাকরী হোক, তোকে ভালো একটা শাড়ি দেবে প্রথম মাসেই।

প্রতিমা মুখঝামটা দেয়।

—থাক। সাত মণ তেল পুড়েছে আর রাধাও নেচেছে!

মনে মনে রাগটা চেপে থাকে প্রতিমা। সব দিক ওরা তাকে বঞ্চিত করতে চায় ব্যর্থ বঞ্চিত মন তাই লোভী হয়ে ওঠে; দিদিকেও দেখেছে। সুষমার অদৃষ্টকে মনে মনে হিংসা করে। তার বাড়ি হয়েছে—এখন চঞ্চলেরও দিন বদলেছে।

সুষমার শূন্য মনে এখন পূর্ণতার জোয়ার সারা দেহে এনেছে নোতুন যৌবন সুষমা পরণে দামী শাড়ি, মাঝে মঝে জিনিষপত্র কেনা-কাটা করতে চঞ্চলে নিয়ে কলকাতা যায়। চঞ্চলের উপ্যাসের চিত্ররূপের প্রথম আনুষ্ঠানিক মুক্তি উৎসবে ওযায় দুজনে। প্রতিমার মনে মনে অনেকদিনের আশা—সে সিনেম নায়ক-নায়িকাদের স্বচক্ষে দেখবে। বন্ধু বান্ধবীরা ক্লাশেও তাকে বলে তার ভগ্নিপতি বই উঠছে ছবিতে; সে নায়ক নায়িকাদের দেখেছে কিনা? শুনেছে সিনেমার ছ দেখতে সেদিন অনেকেই আসেন।

প্রতিমাকে সেদিন চঞ্চল ওর বাড়িতে আসতে দেখে খুশী হয়ে অভ্যর্থনা জানায়

—কে এসেছে দেখ সুষমা, আরে প্রতিমা যে চেনাই যায় না। প্রতিমা চঞ্চলে কাজের মধ্যে এসে পড়েছে। একটা কাগজের লেখার তাগিদা ছিল, সুষমা কি বল এসেছিল একটু আগেই, চঞ্চল তাকে শুনিয়ে দিয়েছে।

—এখন একটু ছুটি দাও, লেখাটা শেষ করতেই হবে আজ।

সুষমা ইদানীং লক্ষ্য করেছে চঞ্চলের এই মনোভাব। তাকে কেমন যেন মা মাঝে সহ্য করতে পারে না। চঞ্চলের এই অবহেলায় মনে মনে ক্ষুব্ধ হয় সে বলে—

—এতো জরুরী কাজ?

চঞ্চলের লেখার সময় এমনি বাধা ভালো লাগে না। কথার জবাব দিলেই কথা বাড়বে। তাই চুপ করেই থাকল। সুষমা রাগ চেপে বের হয়ে গেল, এঘরে আর আসে নি।

প্রতিমাকে এঘরে এসে ঢুকতে দেখেছে সুষমা। প্রতিমা এবাড়িতে এসে তার সঙ্গে দেখা না করে চঞ্চলের কাছে এসেছে, চঞ্চলও এতক্ষণ কাজের অছিলায় তাকে ঘর থেক চলে যেতে বলেছিল, এখুনি সেই চঞ্চল প্রতিমার সঙ্গে বেশ সহজ হাসি খুশী ভাবে গল্প করছে।

প্রতিমাও ওর সামনে এলে অনেকটা মুক্ত মনে করে নিজেকে। তার মনের সেই জড় ভাবটা কেটে যায়। প্রতিমা চঞ্চলের কথায় জবাব দেয়।

—আমাদের চিনতে না পারায় কি হয়েছে বলুন?

হাসে চঞ্চল।

—তোমাদের এখন অফুরাণ সম্পদ; তার তুলনায় পুরুষ চিরকালই কাঙ্গাল।

প্রতিমা হাসছে। হাসলে ওর ফর্সা নিটোল গালে দুটো টোল পড়ে। চোখের

ালো তারায় ঝিকিমিকি তোলে মনের সেই খুশীটা। চঞ্চল সুন্দরের এমনি সার্থক কাশ কমই দেখেছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

প্রতিমা ওর সেই চাহনি দেখেও দেখে না। বলে চলেছে সে।

—নোতুন ছবির প্রেস-শোতে এবার কিন্তু আমি যাবো।

—বেশ তো। সামনের বৃহস্পতিবার প্রেসশো কলকাতার হলে, তুমিও দিদির ঙ্গে চলো! অবশ্য যদি কোন ডিরেক্টারের নজরে পড়ে যাও, চাইকি হিরোইনই হয়ে াবে। তখন পস্তাবো আমিই।

সুষমা ঘরে ঢুকছিল, ওদের কথাগুলো সেও শুনেছে।

প্রতিমা হাসছে। হাসি উচ্ছল কণ্ঠে শোনায়।

—ইস্; আপনার দুরাশা কিন্তু খুব বেশী।

—তাই নাকি!

সুষমা ওই কথাগুলো শুনে অবাক হয়। নিজের কাছেই বিশ্রী ঠেকে। চঞ্চলের রে ঢুকে প্রতিমার দিকে চাইল। প্রতিমা বলে ওঠে।

—শোন দিদিভাই। চঞ্চলদার কথা শোন। সুষমা চঞ্চলের সেই আগেকার ণ্ঠস্বরের মতই গম্ভীর ভাবে জবাব দেয়।

—আমার জরুরী কাজ আছে, এখন ডিসটার্ব করিস না প্রতিমা। আর শোন! হস্পতিবার আমার যাওয়া হবে না। যদি যেতে হয় প্রতিমাকে নিয়েই যাও।

সুষমার নিজের কাছেই মনের সেই উত্তাপটা অসহ্য হয়ে ওঠে। প্রতিমার মনের শীটা নিমিষের মধ্যে উবে যায়। চঞ্চল অবাক হয়ে সুষমার দিকে চাইল।

কেন যাওয়া হবে না?

—তার জবাবও কি দিতে হবে?

কথাটা ওদের দুজনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল সুষমা। চঞ্চল ওর মনের ীচতায় বিস্মিত হয়েছে। প্রতিমার গালে যেন প্রচণ্ড একটা আঘাত করেছে দিদি।

প্রতিমা মনে মনে স্বপ্ন দেখেছিল, ও সেই বিচিত্র জগতের স্বাদ পাবে। তার ঞ্চিত মন এইটুকু পাওয়ার স্বপ্নেই বিভোর হয়েছিল। দিদি আজ তাকেও সন্দেহ রে।

প্রতিমা চঞ্চলের বেদনাহত মুখের দিকে চাইল। তার নিজেরও দুঃখ বোধহয়। ার জন্য চঞ্চলদাও আঘাত পেয়েছে। সুষমা আঘাতটা সামলে নিয়ে সহজভাবে বলে।

—এমনিই বলছিলাম। সেদিন আমারও পরীক্ষা আছে স্কুলে। আজ চলি!

বসবে না?

—না। প্রতিমা চুপ করে বের হয়ে গেল।

সুষমার এটাও দৃষ্টি এড়ায় না। ভেবেছিল সে প্রতিমা তার সঙ্গে দেখা করে াবে, কিন্তু প্রতিমা তার ঘরে আসে নি, বের হয়ে গেছে। চঞ্চল গম্ভীর মুখে এসে াঁড়ায় তার সামনে। সুষমা ওর দিকে চাইল, একটা লেশ বুনছিল।

—প্রতিমা চলে গেল ?

—হ্যাঁ! কথাটা ওর সামনে না বললেই পারতে। বেচারা কি ভাববে ? সুষমা চঞ্চলের মনে অন্য সুর শুনেছে। মানুষটার অতল মনের কোণে লোভের কালো ছায়াটা তার নজর এড়ায় নি। সুষমা শ্লেষভরা কণ্ঠে বলে।

—এত দরদ !

—দরদ নয়, সাধারণ ভদ্রতা। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল—

—এসেছিল, না ডেকেছিলে তাই এসেছিল—

সুষমার দিকে চাইলো চঞ্চল। রি রি করে ওঠে মন। সুষমা শোনায় —গল্পটা লেখা হলো ? জরুরী কাজ ছিল বল্লে ?

চঞ্চল জবাব না দিয়ে বের হয়ে গেল বাড়ি থেকে। সুষমা এমনি দিনে আবিষ্কা করে সে মা হতে চলেছে।

·· তাই চঞ্চলের অবাধ এই দরদ আর ভালোবাসাকে কঠিন আঘাত করে নিজে সব প্রতিষ্ঠাকে আরও কায়েম করতে চায়।

···প্রতিমা সেদিন দুঃখ পেয়েছিল, মনে মনে খুব রাগ হয়েছিল দিদির ও ব্যবহারে। নিজেকে এত বড় ভাবে—ভাবে ওর জোর সব থেকে বেশী ওই চঞ্চলে উপর ! এই ধারণাটাকে সে কঠিন আঘাতে ভেঙ্গে দেবে একদিন।

চঞ্চলের মুখ দেখে বুঝেছিল প্রতিমা, সুষমাকেও দেখেছিল সেদিন। দিদি মনের নীচতা তার মন ঘৃণায় ভরে তুলেছিল। দিদি তাকেও অবিশ্বাস করে, তাই এমনি অপমান করেছিল। বাড়ি ফিরে এসেছিল প্রতিমা গুম হয়ে। মেয়েকে এত বেলায় ফিরতে দেখে কল্যাণী বলে। —এত দেরী হ'ল যে ? কোথায় যে সারা হৈ হৈ করে ঘুরিস জানি না বাপু ! বাড়িতে কি মন টেঁকে না ?

প্রতিমার জ্বালাধরা মনে মা যেন নুন ছিটিয়ে দিয়েছে। ফোঁস করে ওঠে প্রতিম

—তোমাদের মনের খবর জানতে বাকী নেই। দু চোখে যে দেখতে পারো তাই বাড়িতে মন বসে কই ?

কল্যাণী মেয়ের কথার ঝাঁঝে অবাক হয়। তার উপরই এবাড়ির সকলেই ঝ ঝাড়ে আর অসহায়ের মতো সে সরে যায়। তবু মেয়ের কথার জবাব দেয়।

—দয়া করে নেয়ে খেয়ে এইবার উদ্ধার করো আমাকে।

কল্যাণী গজ গজ করতে থাকে, এ তার নিত্যকার অভিযোগ। দিন-রাত বা হেঁসেল ঠেলে হাঁপিয়ে উঠেছে সে। বাড়িতে যোগ্য মেয়ে থাকতেও সে কুটো ভে দুটো করবে না। প্রতিমা মায়ের কথা-গুলো শুনে চলে। মা আড়ালে তখন বকে চলেছে—কোনরকমে তিনিরের চাকরি হয়ে গেলে যে করে হোক প্রতিমাকে বি থা দিয়ে বিদায় করবে বাড়ি থেকে। সেদিন নিশ্চিন্ত হবে সে।

বিয়ে ! ঘর সংসার। প্রতিমার নিজের একটা আশ্রয় হবে, একজন মানুষ তা ভালোবাসবে, সে সুখী হবে।···ভালবাসা—দিদি ভাই-এর কথা মনে পড়ে। তার

াড়ি—টাকাকড়ি—খ্যাতি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাই বোধহয় প্রতিমাকে আজ সে এমনি রে অপমান করতে পারে।

প্রতিমাও এসবের একদিন জবাব দেবে।

এর পরও চঞ্চলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। মাঝে মাঝে ওর সম্বন্ধে অনেক কথাই নেছে। গোবিনের দোকানকে নিয়ে সহরে অনেক আলোচনাই হয়। মদের আড্ডা সে ওখানে। তিনকড়িবাবু কনট্রাক্টার শ্রীদাম সেন আরও অনেকের সঙ্গে ওখানে ঞ্চলও যায়।

বিজলী সহরের গেজেট। ওপাড়ার কোন সৌখীন নাট্যসংস্থার সঙ্গে জড়িত। াচ গানও জানে—মাঝে মাঝে তাদের ক্লাবে অনেক নাটকেও অভিনয় করে বিজলী। হরের উঠতি যুবকদের সঙ্গে হৈ হৈ করে; তার স্টকে ছেলেদের সম্বন্ধে যা গল্প াছে বান্ধবীদের আড্ডায় সে সব উজাড় করে বিজলী অন্য মেয়েদের বাহবা কুড়োয়। জলীকে তাই ওরা ডাকে—বিজুদা বলে।

ও নাকি মেয়ে নয় পুরুষই। বিজলী অবশ্য হাসে।

—ধ্যাৎ ব্যাটাছেলেদের মতো কাওয়ার্ড—জাত আর নেই।

সেই বিজলীই প্রতিমাকে খবরগুলো দেয়।

—বুঝলি তোর চঞ্চলদা একেবারে জাহান্নামে গেছে।

কথাটা শুনে চমকে ওঠে প্রতিমা; নিজের কাছেই নিজের এই ব্যাকুল বেদনার শুদ্ধতিটা বিচিত্র ঠেকে। চঞ্চলদা জাহান্নামে গেল না ভালো থাকলো তাতে তার ক আসে যায়? তবু মন থেকে ভাবনাটা মুছে ফেলতে পারে না। সেদিনই ঝেছিল প্রতিমা তার মনের অতলে একটা মন আছে যে চঞ্চলকে ভালবাসে, দেহের ামনায় সেই চেতনা বিকৃত নয়। অন্তরের মাধুর্য দিয়ে সে চঞ্চলকে সেখানে পরম দ্ধার আসনে বসিয়েছে।

বিজলী বলে চলেছে।

—মদ খেয়ে টোর মাতাল হয়ে পথে পথে ঘোরে। ওই খারাপ মেয়ে ছেলেদের াড়াতেও যায়—পার ঘাটে দিশী মদ গিলে বেলাল্লাপনা করে।

প্রতিমার মুখের উপর ওই কথাগুলো এক একটা আঘাতের মতো তীব্র হয়ে াজে। বিজলী বলে।

—তোর দিদি ওকে ভালোবাসে না বুঝলি?

অবাক হয় প্রতিমা—কেন?

প্রেম বিষয়ে বিজলীর অভিজ্ঞতা প্রতিমার চেয়ে অনেক বেশী। বিজলী লে।

—যদি তোর দিদি সত্যিকার ভালোবাসতো তাহলে চঞ্চলবাবু এসব জায়গায় াবে কেন, মদ গিলে মাতাল হয়ে মাতলামি করবে কেন?

কথাটা সত্যি বোধহয় প্রতিমার। দিদির দিক থেকে দেখেছে প্রতিমা, দিদি তার

আগেকার আশ্রয় হারিয়ে এখানে এসে শুধু একটু অবলম্বন চেয়েছিল, তাই ভালোবাসার ভানই করেছিল চঞ্চলদার সঙ্গে। ঠকিয়েছিল মানুষটাকে।

আজ ঠকে ঠকে চঞ্চলদা এমনি হয়ে উঠেছে।

তার মনের সুপ্ত বেদনা ক্রমশঃ কল্পনার আতঙ্কে কেমন কালো দীর্ঘ ছায়াময় হ ওঠে। চঞ্চলদাকে এসব পথ থেকে ফেরাতে পারলে খুব সুখী হতো প্রতিমা।

মনে হয় বলবে এসব কথা, দিদিকেই এ নিয়ে বলবে।

কিন্তু তাতে সুষমা অন্যকিছু ভাববে, তার ফল আরও খারাপ হতে পারে ভেবে সে কাজও করতে পারে নি প্রতিমা। চঞ্চল মাঝে মাঝে আসে তাদের বাড়ি তিমিরের চাকরির ব্যাপারে দু এক জায়গায় চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে। তিমিরও বা এসে কলকাতায় চঞ্চলের প্রতিষ্ঠা—নাম খ্যাতিরের সম্বন্ধে নানা গল্প করে, প্রতি শোনে সব।

মনে মনে খুশী হয়—ভালো লাগে তার চঞ্চলের এই সব কৃতিত্বের কথা শুনতে মনে হয় তিমিরের একটা চাকরি হয়ে গেলে ওই বড়দা সমীর পর্যন্ত চঞ্চলের সম্ব এসব কথাগুলো বিশ্বাস করবে।

প্রতিমার বড়দার উপরও রাগ হয়।

সমীরও কোনদিনই চঞ্চলকে স্বীকার করতে পারল না। মনে হয় হিংসাই ওট নিজে জীবনে কোন উন্নতি করতে পারে নি, তাই অপরকেও উন্নতি করতে দেখ হিংসাই করবে। ওকরে।

রাত হয়ে গেছে।

প্রতিমা বই নিয়ে বসবার চেষ্টা করে। তার পড়াশোনা পরীক্ষার কথা মনে হ ওসব নিয়ে আর ভাববে না। চঞ্চলের কথা মন থেকে মুছে ফেলে এইবার নি ভাবনাই ভাববে। দেখেছে এ বাড়িতে সে সকলেরই দয়ার পাত্র, সব বিষয়েই তা দাদা-মা-তিমিরের কাছে হাত পাততে হয়।

কোনরকমে পাশ করতে পারলে যাহোক একটা চাকরিবাকরি করে দিন চালা নিজের ব্যবস্থা করে নিয়ে নিজে স্বাধীনভাবে বাঁচবে। এছাড়া তার সামনে নেই।

কল্যাণী মেয়েকে পড়তে বসতে দেখে খুশী হয় মনে মনে। তবু মেয়ের সুম হোক।

...রাতের অন্ধকারে এমনি সময় সমীরকে বাড়ি ফিরতে দেখে অবাক কল্যাণী। একটু আগে সমীর বলে গিয়েছিল চঞ্চলের আজ বোধ হয় কলকাতায় কা আছে, একা সুষমা ওবাড়িতে থাকতে পারবে না। তাই ও গিয়ে থাকবে রাতে। তা গম্ভীরভাবে বাড়ি ঢুকতে দেখে কল্যাণী অবাক হয়।

—ফিরে এলি যে ?

সমীরের চোখের সমনে চঞ্চলের মদ্যপ চেহারা—তার জড়িত কণ্ঠের সেই ক

লো মনে পড়ে। চঞ্চল আজ তাকে অপমান করে তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ীর মায়ের কথায় আজ ফেটে পড়ে।

—ওখানে আর যেতে বলো না মা!

কল্যাণী অবাক হয়—কেন রে?

—নরক করে তুলেছে বাড়িটাকে, জানোয়ার কোথাকার। চঞ্চল এমনি করে হান্নামে তলিয়ে যাবে ভাবতে পারি নি। ছিঃ ছিঃ। আর ওখানে তুমি নদিনই যেতে বলো না। যেতে চাই না।

প্রতিমা পড়ছিল, দাদার মুখে চঞ্চলের সম্বন্ধে কথাগুলো শুনে উঠে আসে। ীরের মুখ চোখ কঠিন হয়ে ওঠে। কল্যাণী চুপ করে শুনছে। সমীর প্রতিমাকে খ মাকে বেশ জোর করে শুনিয়ে যায়।

—ও বাড়িতে এখান থেকে কেউ যাক, এটাও আমি পছন্দ করি না।

প্রতিমা বেশ বুঝতে পারে কথাটা দাদা তাকে উদ্দেশ্য করেই ঘোষণা করে গেল।

প্রতিমা সরে যায়। তবু তার মনে চঞ্চলের কথাই ঘোরাফেরা করে। চঞ্চলদার বন্ধে ওই কথাগুলো শুনেও খারাপ লাগে তার।

রাতভোর চঞ্চল সেই নেশার ঘোরে আচ্ছন্নের মতো পড়েছিল বিছানায়। সুষমাও কে উঠেছে মানুষটার ওই বিচিত্র ব্যবহারে! ও যেন নিজের উপরেই নিদারুণ াক্রোশে এমনি করে আঘাত হানতে চায়। শেষ করে দিতে চায় নিজেকে।

সুষমার মনে জাগে ঘৃণা, তার নিজের পথ সে ঠিক করে নিয়েছে। সে মেয়েদের ন শেখাবার ব্যবস্থা করেছে, তার থেকেই কিছু আয় হয়। তাদের দিন যেভাবে াক কেটে যাবে।

ওঘরে চঞ্চল শুয়ে আছে। সকাল হয়ে গেছে, সুষমা বাচ্চাটাকে জামা পরাচ্ছে। ন পড়ে অতীতের কথা। তার আগেকার স্বামী আড়তদার গোপলকেও সে একই রণে অগ্রাহ্য করে এসেছিল। মানুষের মধ্যে মদ্যপ উন্মত্ত ভাবটাকে সে কোনদিন শ্রয় দেয় নি। ভেবেছিল চঞ্চলকে সে নোতুন করে নিজের মনোমত ভাবে গড়ে তুলবে, খী হবে তারা।

কিন্তু চঞ্চল তার কাছে ধরা দেয় নি। তার নিজের জগতেই রয়ে গেছে সে। তার াধান্য আর পাশব প্রবৃত্তি নিয়ে। তাই আপশোষ হয় সুষমার যে এক নরক থেকে া অন্য নরকে এসে উঠেছে। এতবড় ভুলের বেদনাটা তার মনকে আচ্ছন্ন করে খেছে।

চঞ্চলের ঘুম ভাঙ্গছে। তার সারা মনে অবসাদ আর ক্লান্তি। কালকের রাতের টনাগুলো মনে পড়ে তার। কি যেন একটা বেদনা তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। দ সে খেয়েছিল প্রচুর—সেই সঙ্গে মনে একটা জ্বালা তার শিরাতন্ত্রীকে বিকল করে য়েছিল।

—সুষমা!

সুষমা ওই ডাক শুনেছে। তবু সাড়া দেয় না। অনেক সহ্য করেছে সুষমা—এইবার সে প্রতিবাদ করবে। অগ্রাহ্য করবে মানুষটাকে সব দিক থেকে।

…হঠাৎ সুষমা সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শুনে চাইল। দেখে প্রতিমা উঠে আসছে। সকালেই স্নান সেরেছে সে। মাথার একরাশ চুল তখনও খোলা, আকাশ রং-এর শাড়ির উপর কালো মেঘের মতো চুলগুলো পড়ে আছে, চোখে কাজলের অল্প আভাষ। ওর সুন্দর ফর্সা রং যেন শাড়ির মধ্য থেকে ফুটে উঠেছে উজ্জ্বলতর হয়ে, নিটোল মাংসল হাত দুটোয় মাখনের মতো মসৃণ লালিত্য।

সুষমা বোনকে দেখে অবাক হয়।

—তুই।

কাল রাতে দেখেছে চঞ্চল দাদাকে এ বাড়ি থেকে অপমান করে তাড়িয়েছে, আর তাই আর সে ছোট বোনকে কড়া কথা বলতে গিয়েও পারল না। তবে ওর দু চোখে ফুটে ওঠে নীরব ঘৃণা। আজ চঞ্চলকে সুষমা অবিশ্বাস করে—ঘৃণা করে। তা তার সংস্পর্শে যেই আসুক তাকেও কেমন ভালো চোখে দেখতে পারে না।

প্রতিমা বাচ্চাটাকে একটু আদর করে।

সুষমা চুপ করে নীরব দর্শকের মতো ব্যাপারটা দেখছে।

চঞ্চল তখনও ডাকছে ভিতর থেকে—সুষমা!

তার কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি আর বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

কালকের ঘটনাটার জন্য নিজেকেই দায়ী মনে হয়। সেই কলকাতায় ছবি দেখা আলোচনাগুলো আর ওই টাকার লোভ তাকে কেমন নেশায় আচ্ছন্ন করেছিল। মদ খেয়েছিল।

নিজের কাছে নিজেরই অদ্ভুত ঠেকে। মদ আর নারীদেহের নেশা তাকে এমনি করে পেয়ে বসে, অবচেতন মনের সেই দুর্বল হতাশা আর একাকীত্ব চঞ্চলকে অস্থির করে তোলে। নিজেকে ভুলতে চায় সে।

অনুতাপে মন ভরে ওঠে।

—সুষমা।

আজ সে ক্ষমা চাইতে চায়। কিন্তু সুষমার দিক থেকে কোন সাড়া নেই।

প্রতিমা বলে—ডাকছে যা না দিদি ভাই?

সুষমা অবজ্ঞাভরে উঠে বাচ্চাটাকে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। হিটারে তার গ্ল্যাক্সোর জন্য জল গরম করতে দিয়েছে। এদিকে তার কোন নজর নেই। প্রতিমার কাছে সেই অবজ্ঞাটাও ফুটে ওঠে।

নিজেই ঢুকল চঞ্চলের ঘরে। থমকে দাঁড়াল। ওর মুখে চোখে গতরাতের ক্লান্তি—চোখের কোলে পড়েছে কালির দাগ। চুলগুলো উস্কোখুস্কো।

প্রতিমাকে দেখে অবাক হয় চঞ্চল।

—তুমি!

প্রতিমা ওর দিকে চেয়ে থাকে। কাল রাতে তার মনের ভাবনার সুরের খেই খুঁজে পায়। বলে প্রতিমা।

—হ্যাঁ দেখতে এলাম, সিনেমার নায়ক হয়ে উঠেছেন নিজে। দাদা বাড়ি গিয়ে রাতদুপুরে যা সব বললো! ছিঃ ছিঃ সেদিনও আপনাকে নিষেধ করেছিলাম এই সব বিশ্রী কাণ্ড না করতে। সে কথা শোনা তো দূরের কথা—কাল রাতদুপুরে বাড়ি ঢুকেছেন - মাতাল অবস্থায়! দাদাকে কি সব বলেছেন—

চঞ্চল রাগতে পারে না। প্রতিমার কথা বলার ভঙ্গীটি অত্যন্ত মনোরম। চঞ্চলের মনে হয় জীবনের সব জ্বালার মধ্যে এই প্রতিমাই আনে শান্তির একটু আভাষ। কি যেন চায় সে—সেই চাওয়ার জন্যই খুঁজে ফেরে পথে পথে, না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে মদের নেশায় সব ভুলে থাকতে চায়।

প্রতিমাই সেই চাওয়ার রূপ। সকালের শিশির-স্নাত মাঠের ঘাসের বুকে প্রথম সূর্যের আলোর মাণিক ছড়ানো, পাখীগুলো কলরব করছে বিচিত্র সুরে।

ভালো লাগে চঞ্চলের। এমনি জগতের অপরূপ অধরা মাধুর্যে সে হারিয়ে যেতে চায়। সুষমা তাকে জীবনে কিছুই দিতে পরে নি, দিয়েছে শুধু জ্বালা আর বাঁধন! মুক্তির আশ্বাস আজ তার হারিয়ে গেছে।

—প্রতিমা!

প্রতিমা ওর দিকে চাইল। সকালের আলোটুকু কাঁপে বাগানের নারকেল গাছের চিরল পাতায়। ওর মনে তারই শিহর।

চঞ্চল বলে চলেছে—

—নিজেও আমি এসব চাই না প্রতিমা, তবু মাঝে মাঝে মনে হয় দুনিয়ার সব মানুষই আমাকে ঠকিয়েছে, দিয়েছে শুধু জ্বালা আর ঘৃণা, তারা আমাকে অপবাদ দেয়—অপমান করে। আমি কোন অন্ধকার অতলের জীব, মাটি ফুঁড়ে দু দিনের জন্য এসেছি। ভয় হয় আবার হারিয়ে যাবো। তাই ওসব ভয় ভাবনা থেকে এড়িয়ে থাকার জন্য মদ খাই, সব ভুলে থাকতে চাই। বড় একা আমি!

প্রতিমা ওর অসহায় কণ্ঠের কথাগুলো শুনছে। তার মনেও সাড়া জাগায় কথা-গুলো। মনে হয় এসব চঞ্চলের সত্যিকার কথা। শিল্পীর মনের বেদনাকে দিদি কোনদিন সমবেদনার দৃষ্টিতে দেখে নি।

তাই এই ব্যর্থতা ওকে ধূমকেতুর মতো জ্বালিয়ে দিয়েছে। দিদিকে এ নিয়ে কোন কথা বলার মতো পরিবেশ এ বাড়িতে নেই। সুষমাও বুঝবে না একথা। তবু প্রতিমা বলে।

—নিজেকে তবু এভাবে নষ্ট করার অধিকার আপনার নেই।

চঞ্চল চায়ে চুমুক দিয়ে চলেছে। তার ধারণা আরও যন্ত্রণাগুলো সব কেমন জট পাকিয়ে যায়। একথা সে ভাবে নি। তার সামনে আজ অন্ধকার তাই সে সবকিছুকে ভোগ বিলাস আর আস্ফালনের শূন্যগর্ভ দীপ্তিতে চোখ ধাঁধিয়ে ক'দিনের জন্যও

বাঁচতে চায়। দেখেছে সমাজের মানুষের মনে এই পাপ আর উন্মাদনার সংক্রমণ তার বিশ্বাস, এরই মাঝে তার স্বীকৃতি আর প্রতিষ্ঠার বীজ নিহিত।

প্রতিমার কথাগুলো শুনে তাই মনে মনে হাসে সে।

প্রতিমাকে মনে হয় অপাপবিদ্ধ একটি শিশু—যে সমাজের এই জীবন-যন্ত্রণা লোভের পুঞ্জীভূত আহ্বানের সাড়া শোনে নি।

ওর কাছে প্রতিমা একটা চরিত্র মাত্র, যে এই দুনিয়ার ক্লেদে হারিয়ে যাবে, ওই সুষমার মতো স্বার্থপর হয়ে উঠবে। এই মনের সমবেদনা থাকবে না।

প্রতিমা চঞ্চলের মনের খবর জানে না। ও জানে না চঞ্চল সব কিছুকে আজ হীন —মূল্যহীন বলে বোধ করে। তাই প্রতিমা নিজের মনগড়া স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করে—সেখানে সব মানুষই দেবতার অংশ। শয়তানের প্রলোভন মানুষের সব চিন্তাকে যে বিষিয়ে দিয়েছে একথাটা সে ভাবে নি।

তাই পবিত্র ভালোবাসায় ভরা মন নিয়েই সে এগিয়ে আসে চঞ্চলের দিকে। তাকে আবার সুন্দর একটি জগতের সন্ধান দেবে—চঞ্চল খুঁজে পাবে তার মনের হারানো সেই ভলোলাগাকে, আবার সার্থক হয়ে উঠবে সে—তার সৃষ্টি।

তার লেখার মধ্যে কদর্যতা—কুশ্রী মনোভাবটাকে আবার সুন্দরে পরিণত করবে প্রতিমা।

প্রতিমা তাই বলে।

—এসব এবারে ছাড়াচ্ছি। ভদ্রলোক হবেন—মানুষের পরিচয়ে মানুষের সুস্থ জীবন আদর্শ নিয়ে সাহিত্য করবেন।

হাসে চঞ্চল।

—ওসব কথা বোধহয় তোমাদের প্রফেসররা সাহিত্য পড়াতে গিয়ে লেকচার দেন। কিন্তু সমাজ মানুষ আর কাল যে বদলে গেছে সেটা ওরা ধরেন না। গোলামাল তো সেখানেই।

প্রতিমা বলে।

—না। মানুষ তবু সব দুর্যোগের মধ্যেও তার সহজাত আদর্শ নীতি বিবেককে হত্যা করবে না। সেটা হবে তার মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু। সাহিত্যে থাকবে সব বিপদের মাঝেও মানুষের জয়ের কথা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা, সে কখনও হার মানবে না।

চঞ্চল হাসছে।

মানুষের এই জয়ের কথাটা আজ তার কাছে মূল্যহীন বেশে বোধ হয়। সমালোচক—সাধারণ পাঠকরা এটাই দেখতে চায়। হয়তো কল্পনা বিলাস মাত্র, পরমসত্য—নিষ্ঠুর সত্যকে তারা মুখোমুখি হতে ভয় পায়। কিন্তু চঞ্চলের কাছে সেটাই সত্যি।

ওরা তা মানে না। সংঘাত সেইখানেই।

গতকাল দেখা ছবির কথা মনে পড়ে। মানুষ হেরে গেছে। পরাজিত হতাশা-

াদী মানুষ তাই চরম মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে যেন দুদিন ছুটি চেয়ে নিয়ে জীবনের সব ভোগ আর অবদমিত কামনাকে তৃপ্ত করতে চায়।

প্রতিমারা সে কথা ভাববে না। ওরা শুধু নীতি আর আদর্শই আঁকড়ে থাকতে চায়। ডুবন্ত মানুষকে বাঁচার আশ্বাস যোগায়। কিন্তু কোথায় সেই আশ্বাস!

চঞ্চলের মনে হয় প্রতিমারা তবু আলোর সংকেত আনে। ভালো লাগে ওকে!

তবু চঞ্চলের জগৎ বহু বৈচিত্রে ভরা। নিজেকে নিয়েই তার সব কিছু নয়। বাইরের অনেক ঝড় ঝাপটা এসে বাজে তাতে। কলকাতার সেই সমাজেও আছে। সেখানে গতি আর চাওয়া-পাওয়ার সংঘাত। লেখকদের মনোজিগতে এ ছাড়াও পোকার মতো একটা সজীব অস্তিত্ব রয়ে গেছে। খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠার মোহ—কে কোন নোতুন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা করছে—কেউ এগিয়ে চলেছে বহু কৃতিত্বের সঙ্গে। তাদেরই একজন চঞ্চল।

তাকেও বর্তমান সমাজের জীবনকে চিহ্নিত করতে হবে তার লেখায়—তার চিন্তাধারায়। তাই চঞ্চল তার পথ খুঁজে ফেরে।

মনে হয় ওদেশের এই স্রোতটা আমাদের এখানেও এসে পেঁছিবে। সেই পঙ্কিল জীবনকে সে চেনে। জীবনের বিকৃতিগুলো জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে, মানুষ তাকে নিয়েই বেসাতি সুরু করেছে। বিকিয়ে দিয়েছে তার মনুষ্যত্ব—ওই অন্ধকার নরকের প্রহরী শয়তানের কাছে নিজেকে বিক্রী করে দিয়ে আনন্দের সন্ধান করছে।

…নিজেও সেই দলে মিশেছে চঞ্চল।

তার মনে হয় প্রতিমার ওই ভালোলাগার মূলে মানবিকতার স্পর্শ কিছুমাত্র নেই। সে মুগ্ধ হয়েছে চঞ্চলের কৃতিত্বে তার প্রতিভায় ওই মনের ক্ষণিক ঝলকানিতে। জীবনে প্রতিমাও অনেক কিছু চায়, তাই সেই সন্ধ্যায় তাকে ফিরিয়ে দেবার পর আবার নিজেই উপযাচক হয়ে এসেছে বার বার।

কথাটা বলেছে মিস্ দেকে। বালিগঞ্জের ওর সাজানো ফ্ল্যাটে বসে কথা হচ্ছিল। বয়স্কা ভদ্রমহিলার দু চোখে নেশার চকচকে আভাস, সামনে তার সফেন পানপাত্র।

—খাও চঞ্চল!

চঞ্চল বলে চলেছে—প্রতিমার কথা। তার আসল পরিচয় দেয় নি। তবু তার অনুরাগের কথাটা জানিয়েছে কেতকী দে কে। কেতকী হাসছে। হাসলে ওর সারা-দেহে বিশাল একটা মাংসস্তূপের মতো কাঁপে। ওই কাঁপন এখনও চঞ্চলের দু চোখে নেশা জাগায়।

কেতকী দে জানে চঞ্চলের স্বভাবের নোংরা স্বরূপ, তবু কোথায় তার সঙ্গে মেলে। তাই ভাবনা লাগে ওকে। মদের নেশায় চুর হলে আরও ভালো লাগে—তারপর নেশার আমেজ কেটে গেলে কেতকী দে রাগে অপমানে গর্জে ওঠে। ওকে তাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু ক'দিনের জন্য। আবার ওকেই আমন্ত্রণ করে আনে। বিকৃত মনের এই

পরিচয়গুলো চঞ্চলের জানা। সেও এই উৎকট মানসিক ব্যাধিতে ভোগে তাই এমনি ঘৃণ্য জীবনকেও মেনে নিয়েছে সে। কেতকী দে ওর দিকে চেয়ে চোখের তারায় ঢেউ তুলে বলে।

—তুমি একটি ডেঞ্জারাস বয়। আবার ও মেয়েটার সর্বনাশ করবে কেন?

চঞ্চল হাসছে। মদের নেশা জমছে, ওর মনের কোণে কোণে মাথা তুলছে সেই দুর্দান্ত একটা দানবিক সত্ত্বা, সবকিছু পেতে চায়।

কেতকী দে দেখছে ওর মধ্যেকার সেই জানোয়ারটাকে।

—নোতুন কি লিখছো সোনি?

চঞ্চল জবাব দেয়—নোতুন লেখাই লিখবো। সব কিছু আজ নিছক মিথ্যা হয়ে উঠেছে। এবার ওই মানুষলোকে নেয়েই লিখবো। বিচিত্র সমাজের কাহিনী।

কেতকী হাসছে—তুমিও যে তাদেরই একজন হয়ে যাবে চঞ্চল।

শিল্পী হবে সৃষ্টির বাইরের লোক। তাছাড়া তুমি যে পাঁকে নেমেছো তাতে আরও তলিয়ে যাবে। তোমার বিবেক আছে; এ জগতে ওটাকে আগে মেরে ফেলো; সেটা চলে গেলে তোমার কি থাকবে চঞ্চল?

চঞ্চলের মধ্যেকার জানোয়ারটা মাথা তুলেছে, কেতকী দেকে কাছে টেনে নেয় সে। ওর হাত দুটো তার হাতে। কেতকী দে বয়সের সীমাও ভুলে গেছে! জীবন ছাড়া চঞ্চলের মাঝে তবু ক্ষণিক আশ্বাস খোঁজে সে।

চঞ্চল বলে চলেছে।

—কোন সমস্যার সমাধান নয়, শুধু নেশাই এখানে সত্যি কেতকী। নেশা—সব ভোলানোর নেশা!

সদানন্দবাবু জনতেন চঞ্চলের মতো ছেলেরা আজকের দিনের শাপ-ভ্রষ্ট প্রতিভা। ওরা চারিদিকে বাঁচার আশ্বাস খুঁজতে গিয়ে শুধু মরিচীকার জ্বালাতেই পথ হারিয়ে ঘুরে মরবে। পথ খুঁজতে গিয়ে ভুল পথেই যাবে।

…বৃদ্ধ তার চারিদিকে দেখেছেন এই সর্বনাশ। ওদিকে জুটমিলের বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গে শহরের যাত্রা সুরু হয়, রিফিউজি কলোনীর ছেলে-মেয়েরা বের হয়ে যায় দল বেঁধে চাল আনতে। পথে দেখেন ক্লান্ত বুভুক্ষু মানুষের জনতা। একটা অদৃশ্য কালোছায়া ক্রমশঃ জমাট হয়ে উঠছে মানুষের সামগ্রিক জীবনে। দশ বছর আগেও এখানে তবু প্রাণ ছিল—আজ সেখানে শুধু কলরব। প্রাণহীন আর্তনাদ।

রোজ গঙ্গস্নানে যান তিনি। এটা তার দীর্ঘকালের অভ্যাস। গঙ্গার ঘাটের পারেই কদমের পারঘাটা। কদমও সদান্দবাবুকে চেনে। তার ঘাটের ওপাশে কতকগুলো গাঁদা করবী যুঁই ফুলের গাছ করেছে। সদানন্দবাবু স্নান সেরে তার বাগান থেকে পুজোর ফুল তুলে নিয়ে বাসায় ফেরেন।

আজ সকালে কদমকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সদানন্দবাবু ওকে শুধোন।

—কি রে কদম। ভালো আছিস?

কদম কথাটা জানায়। সব কথা জনতে পারে না। সেই রাতে তিনকড়িবাবুকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল কদম। তিনকড়ি এখন মিউনিসিপ্যালিটির হোমরা চোমরা। সেই-ই এবার চেষ্টা করছে অন্য কাউকে এ ঘাটের ডাক পাইয়ে দেবে, কদমকে দেখে নেবে এক হাত। খবরটা এনেছে খাতাবাবু। দরকার হলে তিনুবাবুই লোক ভাড়া করে নিজে টাকা দিয়ে ঘাট ডাকবে।

কদম ভাবনায় পড়েছে। তার সামনে দুটো পথ খোলা আছে। হয় তিনুবাবুর ডাকে সাড়া দিতে হবে—না হয় চলে যেতে হবে এখান থেকে।

কদম সদানন্দবাবুকে তাই বলে।

—ঘাট থেকে বোধহয় বাবুরা উৎখাত করে দেবে বাবা। এতদিন এ মাটিতে রইলাম, আর বোধহয় থাকা যায় না।

কেন? ইজারার টাকা দিস নি তুই?

—দিয়েছি। তবু তিনুবাবুই আমাকে তাড়াবেন।

—তিনকড়ি!

এককালে সদানন্দবাবুর ছাত্র ছিল। আজ তিনু অবশ্য বেশ মুরুব্বী হয়ে উঠেছে। স্কুল কমিটির মেম্বর ও। তবু সদানন্দবাবু কদমকে বললেন—আমি বলবো তিনুকে। না না। একি কথা তুই এ্যাদ্দিন আছিস!

কদম বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থাকে। ভালোমানুষ লোক—ও জানে না আজকের জীবনে জটিলতা কতখানি বেড়ে গেছে। কত লোভী হয়ে উঠেছে মানুষ—কদম তা বুঝেছে।

সদানন্দবাবু ভাবছেন সমীরের কথা। ও জানে কোথায় তিনকড়িকে পাওয়া যাবে। আসল খবরটা জানতে পারবে তার কাছে। সমীরও কদিন আসতে পারে নি।

তার কাছে নোতুন করে সমস্যাটা দেখা দিয়েছে। সেই রাত্রির পর থেকে সমীর যায় নি চঞ্চলের কাছে। দেখেছে মাঝে মাঝে তাকে রাত্রির ট্রেনে ফিরে টলতে টলতে রিসায় উঠেছে।

কোনদিন বা রিক্সা থেকেই মাতাল অবস্থায় কাকে কুৎসিত ভাষায় জড়িত কণ্ঠে গালাগাল দিচ্ছে। সমীরের মনে হয়েছে ওকে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরবে। তারই কুড়িয়ে আনা চঞ্চল সারা শহরের এমনি কদর্য আলোচনার বস্তু হয়ে উঠবে ভাবতেই পারেনি।

...সুষমা এসে আসল কথাটা শোনায়। প্রতিমার সঙ্গে আজকাল মিশছে চঞ্চল, এবং প্রতিমাই তাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে।

মা ও কথাটা শোনে। কল্যাণী চুপ করে থাকে। দেখেছে এ বাড়িতে ইদানিং চঞ্চল মাঝে মাঝে আসে। সমীরও দেখেছে চঞ্চল এবাড়িতে আসার সময় অন্যরূপ। পরণে দামী ঝকঝকে পাঞ্জাবী গায়ে সোয়েটের জুতো, বাহান্ন ইঞ্চি কাঁচি ধুতি লুটিয়ে চলেছে, চোখে কালো চশমা।

চোখের কোণে জমা পাপের চিহ্নটা ঢাকবার জন্যই বোধহয় ওই কালো চশমা পরে চঞ্চল।

দেখেছে প্রতিমার ঘরে বসে কি সব গল্প করে, হাসির শব্দও কানে আসে। সমীরের ভালো লাগে না। লক্ষ্য করেছে সে বাড়িতে ঢুকলেই ওদের ওই আলাপ আলোচনা—হাসি থেমে যায়। চঞ্চল কাজের অছিলা করে বের হয়ে যায়। প্রতিমা দাদার দিকে চেয়ে থাকে। ওর মুখের কাঠিন্য লক্ষ্য করছে প্রতিমা।

সমীর এ নিয়ে মাকেও বলেছে।

—ও এখানে কেন আসে ?

কল্যাণীর কাছে সবটই অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে ঠেকে। ছেলে আর চঞ্চলের মধ্যে কোথায় একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে। কল্যাণী জবাব দেয়।

কি বলবো ওকে ? বাড়ির জামাই—তোর বাবার খবরাখবর নিতে আসে। কোন স্পেশ্যালিষ্টের কাছে নিয়ে যাবার কথা বল্লে।

সমীর জানে তার নিজের অবস্থার কথা, দুজনের রোজকার—তবু তিমিরের পয়সা বিশেষ হাতে আসে না। নিজেকেই সবই প্রায় চালাতে হয়। তাতে স্পেশ্যালিষ্টের খরচ থাকে না। চঞ্চল সেই সুযোগই নিয়েছে কর্তব্যের নাম করে। তবু মাকে শোনায়।

—ও না এলেই খুশী হবো। প্রতিমাকেও মিশতে নিষেধ করো।

কল্যাণী নিরুপায়ের মতো ঘাড় নাড়ে।

আজ সুষমার কথায় অবাক হয় সমীর। চঞ্চলের স্বরূপ সে জানে। ওর লোভী মনের কাছে কোন নীতি বিবেকের কোন দাম নেই। রাগে ফেটে পড়ে সমীর।

—নির্লজ্জ ইতর কোথাকার।

প্রতিমার উপরও রাগটা পড়ে। সেটা মাকেই শোনায়।

—এত মেলামেশা কেন করে, এ বাড়িতে থাকতে গেল এবাড়ির মতো হয়ে চলতে হবে ; কথাটা প্রতিমাকে জানিয়ে দিও।

কল্যাণীও ভয় পেয়েছে। প্রতিমার মতো মেয়ের সম্বন্ধে তারও ভাবনা অনেক বেশী।

—পাত্রটাত্রের সন্ধান কর। না খেয়ে থাকবো তবু আপদ বিদেয় করি।

প্রতিমা সব কথাই শোনে। তার মনে এই অপমানটা কঠিন হয়ে বাজে। ওরা সকলেই তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। চঞ্চলকে ওরা চেনে নি। সুষমাও না। তাই ওরা তার টাকা—প্রতিষ্ঠাকে ভাঙ্গাতে চায়। অথচ তাকে আঘাত দেবে আর অপমান করবে। ঘৃণা করবে সারা মন দিয়ে। সে নাকি মাতাল, আরও অনেক কিছু।

সুষমা প্রতিমার কথায় অবাক হয়। প্রতিমা দিদিকে একা পেয়ে কথাটা জিজ্ঞাসা করে।

—তোর লজ্জা করে না দিদি ভাই ? নিজের স্বামীর সম্বন্ধে এসব জঘন্য কথা আর একজনকে বলতে এসেছিস ? তুই না একদিন তাকে ভালোবেসেছিলি ?

সুষমা জবাব দেয়—অন্যায় করলে প্রতিবাদ করবো না? ধাপে ধাপে নীচে নেমে যাবে, অনেক চেষ্টা করেও ওকে শোধরাতে পারি নি। দেখলাম ও কাদামাটি দিয়ে গড়া, নর্দমার নোংরার দিকেই ওর নজর।

—মিথ্যে কথা! মানুষটিকে দেখেছে, চিনেছে। তাই প্রতিবাদ করে।

সুষমা বোনের এই সাহসে অবাক হয়। আজ সে রাগ করে না প্রতিমার উপর। চঞ্চল সম্বন্ধে তার মনে আর কোন মোহ নেই, তার ভালোবাসার স্পর্শও ফুরিয়ে গেছে। তাই প্রতিমার মনে এই ভালোবাসার চিহ্ন দেখে বলে সুষমা।

—আমি ঠকেছি, তুইও ঠকে যাবি প্রতিমা। ওর ভিতর বাইরে এক নয়। ও যে কি—কি অভিশাপে জ্বলে পুড়ে চলেছে তা জানি না। তবে বলছি ঠকে যাবি তুইও। ওরা কাউকেই ভালোবাসতে পারে না।

প্রতিমা দিদির দিকে চেয়ে থাকে। সুষমার কথায় প্রতিমা বলে।

—তবু তোর কি কোন কর্তব্য নেই?

সুষমা ওর কথায় এইবার জ্বলে ওঠে। ছোটবোনের কাছে এসব শুনতে আসে নি সে। মনে হয় প্রতিমাই তার সম্বন্ধে চঞ্চলকে অনেককিছু বলেছে, মন বিষিয়ে তুলেছে। তাই চঞ্চলও তাকে অপমান করতে সাহস পায়। সুষমা ভালোবাসা না পাক—অপমানটা নিশ্চয়ই সহ্য করবে না। জবাব দেয়।

—এনিয়ে ভাববার অনেক লোক আছে। শুনেছি বাজারের অনেক মেয়েছেলেও চঞ্চলের জন্য ভাবে। তাকে ভালোবাসে মদ খাওয়ায়। কথাটা যে অনেকটা সত্যি তাই দেখছি।

প্রতিমা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে—কি বললি?

—ঠিকই বলেছি।

আর দাঁড়াল না সে। প্রতিমা অসহায় রাগ আর অপমানে জ্বলছে। এমনি করে একটি মানুষের জন্যই আঘাত সয়ে চলেছে প্রতিমা—অনেক অপবাদও, এরই নাম বোধহয় ভালবাসার জন্য বেদনা পাওয়া।

তবু চঞ্চলের জন্য বেদনা বোধ করে। ভালোবাসার ভান করে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। সুষমাকে তবু সইতে হচ্ছে তাকে।

চঞ্চলও এটা ভেবেছে। তাই ক্রমশঃ তার সামনে সমাজের ভোগের সব বিলাস উপকরণ সহজভাবে আসতে তাকে গ্রহণ করেছে। কোন সার্থকতা এর নেই—আজকের সুখ কালকের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। আবার মনের সব শূন্যতাকে ভুলে মাতাল হয়ে উঠেছে।

তাই সেই শূন্য দর্শনই আর বিকৃতিটাকেই বড় করে দেখেছে। তার লেখাতেই সেই নোতুন যুগের এই ব্যর্থতা নগ্নভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। কি যেন ধ্বংস আর সব নীতির বিরুদ্ধেই এ তার বিদ্রোহের জ্বালা!

চঞ্চল নিজের খেয়ালেই এমনি লেখা লিখেছিল। এতকাল মদ খেয়েছে ব্যভিচার

করেছে তাতে তার অবচেতন সেই পাশব মনটা গোপনে তৃপ্তি পেয়েছে, পৈশাচিক জয়ের আনন্দে সে ওই কাজগুলো করেছে। আজ কলম ধরে তার চেয়ে আরও আনন্দ পেয়েছে, তেমনি নির্মম নীতিহীন পৈশাচিক সেই আনন্দ।

এতদিনের সব বাঁধা নীতির ছকটাকে যেন প্রচণ্ড আক্রোশে লাথি মেরেছে সে। খসে পড়েছে তার শালীনতার মুখোস।

চারিদিক থেকে গুঞ্জরণ ওঠে, চঞ্চলের উপন্যাসকে কেন্দ্র করে। নানা আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে সাহিত্য জগৎ। চমকে উঠেছে পাঠক-সমাজ।

চারিদিকে এই নিয়ে নানা আলোচনা, তার ঢেউ এসে পৌঁছেছে ছোট্ট এই শহরতলীতেও।

চঞ্চলও প্রথমে একটু দ্বিধা বোধ করে। পাঠকসমাজ নাকি অশ্লীল বলেই একে অভিহিত করেছে। সমালোচক—আড্ডার সেই প্রতিষ্ঠাবান বন্ধুরা চঞ্চলকে আজ সম্বর্দ্ধনা জানাতে চায়। বিক্রী হচ্ছে বইখানা আশাতীতভাবে।

চ্যাড্রি মিসেস দত্ত সাহিত্য সমজদার প্রতিষ্ঠাবান বন্ধুরা ও এসেছে। আজ সমারোহ চলেছে, তাদের হিসাব ভুল হয় নি। দু একজন বিদেশী কবিও রয়েছেন আজ। ওরা বিদেশ থেকে ভারতবর্ষ দেখতে এসেছে। তবে আর কিছু দেখেছে কিনা জানে না, কলকাতার নোংরা পল্লীগুলো ঠিক ঘুরেছে। সিগারেটের খোল থেকে তামাক ফেলে দিয়ে গাঁজার ছিটে দিয়ে তাই টানতে শিখেছে, ওটা নাকি তাদের দেশে আগেই চালু হয়ে গেছে।

তার উপর তরল পদার্থ তো আছেই।

সমজদার সমালোচকরা একজন বলেন।

—সাধারণ লোককে শুধু বলে দিতে হবে জানিয়ে দিতে হবে দুঃসাহসিক সাহিত্য প্রচেষ্টা, মহৎ জীবনায়ন যুগযন্ত্রণার মূর্ত প্রতীক! বলে দু চারটে এমনি কথা দিয়ে সমালোচনা বেরুলেই ওরা ভাবে সত্যিই এটা ক্লাস ওয়ান বই। এযুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি—আর চঞ্চলকুমারই এযুগের সাহিত্যের পথদ্রষ্টা।

বিদেশী কবি বন্ধুও সায় দেন।

—দ্যাট্‌স্ রাইট। যেমন মারিফুয়ানার ধোঁয়ায় বাস্তবকে ভুলেছে মানুষ, তা সুখ দুঃখ সমস্যার কথা ভুলেছে; তেমনি ওই সাহিত্যও মানুষকে মোহাচ্ছন্ন ক[illegible] রাখবে। দ্যাটস্ রাইট!

মিস্ চ্যাড্রির দু'চোখ রাঙ্গা হয়ে উঠেছে—গালের লাল আভা ফুটে ওঠে। চঞ্চ[illegible] কেতকী দের পাশে বসে ঘনিষ্ঠ ভাবে গল্প করছে।

—হ্যাল্লো চঞ্চল, কাম অন মাই সুইট বয়! মিট মিঃ চ্যাটার্জি ফ্রম নি[illegible] আইডিয়া পাবলিকেশন্‌স্‌······চঞ্চল দি গ্রেট রাইটার!

মিস্ চ্যাড্রি চঞ্চলকে নিজের কাছে বসালো। কেতকী দে মনে মনে ফুঁসছে' আজ চঞ্চলকে নিয়ে হৈ চৈ সুরু হয়েছে। ওর ওই নোতুন বইখানা নাকি বিদেশ[illegible]

ভাষায়—ভারতের কয়েকটা ভাষাতেও অনূদিত হবে। ওরা ভালো টার্মস্-এ কনট্রাক্ট করতে চায়। ভবিষ্যতেও এমনি আধুনিক সাহিত্যকে তারা ভাষান্তরিত করবে।

চঞ্চল ভাবতে পারে নি এত সহজে বাজার মাৎ করে দেবে সে। তার ওই উপন্যাস আজ সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় হয়েছে। ট্রামে বাসেও দেখেছে লোকের হাতে সেই বই, তবে মলাটটা উল্টে রেখেছে তারা। মনে মনে হাসে চঞ্চল। ক'দিনে সে নোতুন করে সমাজের মানুষদের চিনেছে।

মনে হয়েছে ওরা অধিকাংশই ভণ্ড। প্রকৃত স্বরূপটাকে ভালোমানুষীর মনগড়া নীতিবাদের খোলশের তলে লুকিয়ে রাখে, আসলে সকলেরই লুব্ধ দৃষ্টি ওই পাঁকের দিকে। নইলে এই বইকেও মহৎ উপন্যাস বলে দু চারজন ঢাক পিটিয়েছে আর তাতেই তারাও ভুলে গেছে।

শুধু ভুলে গেছেই নয় সেখানা পড়বার জন্য ভিড় লেগেছে। তবু সোজা কথায় মনের সেই নীচ লোভী সত্তাটার অস্তিত্ব কেউই মানে না। মানা উচিতও নয়।

চঞ্চলের আজ অর্থের ভাবনা নেই। এতদিন অনেক পরিশ্রম করে ঘুরে বেড়িয়েছে। তার চরিত্রদের মাটির মানুষদের চিনেছে, জানবার চেষ্টা করে জীবনের বহু বিচিত্র ক্ষেত্রে ছড়ানো মানুষের জীবনকে—সেখানেও লক্ষ্য করেছে তাদের মহত্ব জীবনসাধনা ভালোবাসার অস্তিত্ব।

কিন্তু কি পেয়েছে তাতে! কত টাকা!

আজ কলকাতায় বাড়ি করবে সে—গাড়ি কিনবে। জাতে উঠবে এইবার। এতদিনের সব দর্শন তার কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে। মানুষের বাইরের স্বরূপটাকে নিয়েই মেতেছিল—এবার সে অন্ধকারে লুকানো আদিম মানুষের প্রকৃত রূপটাকে চিনেছে।

তাই কৃতকার্য হয়েছে সে।

...বুক ফুলিয়েই চলে। মনে হয় ওই ট্রেনে ঝুলোঝুলি করে যারা যাচ্ছে, পথে ঘাটে যারা খুঁটে খেয়ে চলেছে—যারা প্রাসাদে বাস করছে ভোগের মধ্যে—সবারই অন্তরের সেই লুকোনো পরম দুর্বলতাকে সে চিনেছে।

সে তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ত্রিকালতজ্ঞ কোন মহাপুরুষ। সমাজের সকলেই তার কাছে অনেক অসহায় জীব।

চোখের স্বচ্ছদৃষ্টিকে তাই সে কালো চশমার আবরণে ঢেকে রাখে। ওটা দিয়ে মানুষের সব আলোকে ঢেকে দিয়ে কালোটুকুর সহজ সন্ধান মেলে বোধ হয়।

প্রতিমাকে একখানা বই দিয়েছিল। প্রতিমা উদগ্রীব হয়ে পড়েছে। তার কাছে এ রাজ্য নোতুন বলেই মনে হয়। অনাস্বাদিতপূর্বক এক বহু বর্ণময় জগতের স্বাদ তাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। তার মনের অতলেও সে আজ দৃষ্টিপাত করে।

...নিজেকে চুলচেরা বিচার করতে চেষ্টা করে। তার কাছে এ সত্য আজ

গোপন নেই। চঞ্চলকে সে আরও নিবিড় করে চিনেছে। ভালোবাসে তাকে আজ ওই স্পষ্টবাদিতার জন্যে। দাদাকে আজ ঘৃণা করে, দাদা একটা কাওয়ার্ড। একটা মেয়েকে ভালোবেসে তাকে সুখী করতে পারে নি। করুণা তাই আজ পথ হারিয়ে গেছে, সমীর পারে নি তাকে ঘরের সন্ধান দিতে।

…তাই অক্ষমতাকে নীতিবাক্যের দোহাই দিয়ে ঢাকতে চায়—সকলকেই তাই শাসন করতে চায়। মায়ের সম্বন্ধে অন্য ধারণা জন্মে। তার ভাবনার ধারায় একটা ভিন্নমুখী চিন্তা এসেছে। দুনিয়ায় তার চারপাশে সবাই নীচ, সেও!…

তবে কেন যা হাতের কাছে পায় সেটুকু নিয়েই বাঁচবে না?

তাই আজ প্রতিমা চঞ্চলকে নোতুন করে চিনিছে।

সুষমার সঙ্গে চঞ্চলের সম্পর্ক নামমাত্র। এক বাড়িতে রয়েছে। কখন আসে যায় তার ঠিক নেই। মেয়েও বড় হচ্ছে। মাঝে মাঝে ছোট্ট সুন্দর মেয়েটা চঞ্চলের কাছে আসতে চায়—চঞ্চলের কাগজপত্র তছনছ করে—না হয় পেন নিয়ে টানাটানি করে। চঞ্চল ধমক দিতেই পাতলা দুটো ঠোঁট ফুলিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করে—না হয় কেঁদে ফেলে।

কাঁদলে চঞ্চল আরও বিরক্ত হয়। সে চীৎকার করে।

—বেবীকে নিয়ে যাও। কেন ওকে ডিসটার্ব করতে পাঠাও এখানে? মেয়েটাও ক্রমশঃ বাবাকে দেখেছে, ভয় করে। দূর থেকেই চেয়ে থাকে। সুষমা তবু বলবার চেষ্টা করে।

—ওকে একটু ভালোবাসতেও পারো না?

—ভালোবাসা!…চঞ্চলের ঠোঁটের ডগে হাসির আভা ফুটে ওঠে। ওটা কি তা জানে না সে। তবু কাছে আনবার চেষ্টা করে—ভয়ে কেঁদে ওঠে বেবী।

…সুষমাকেও মাঝে মাঝে নানা কথা শুনতে হয়। গান গায় সে আজকাল সুষমা ওই গানের টুইশানি করে তবু কিছু রোজগার করে। চঞ্চল টাকা দিতে গেলে বলে।

—তোমার কাছে রাখো কাজে লাগবে।

—তোমার?

—আমার দিন চলে যাচ্ছে—চলে যাবে।

সুষমার মনের সেই অভিমানটাকে কোনদিন বুঝতে চায়নি চঞ্চল। মাঝে মাঝে রাতে ফেরে বেঘোর অবস্থায়—চীৎকার করে তখন জানাতে ইচ্ছে হয় সবাই এ দুনিয়ায় বেইমান। তার বাবা নামক লোকটা একটা মনুষ্যেতর প্রাণী—নইলে তার মতো জীবকে দুনিয়ায় আনবে কেন? সারা শরীর সেই কল্পিত নোংরার গ্লানিতে ভরে ওঠে—বমি করে। বিষাক্ত পূতিগন্ধময় এত ক্লেদ বের হয় তবু মনের ক্লেদটা পরিষ্কার হয় না।

বেবীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। ভয় জড়ানো কণ্ঠে বলে।

—বাপির অসুখ করেছে?

সুষমা চায় নি যে কোন সন্তান তার বাবাকে এই ঘৃণ্য জীবের মতো অবস্থায় দেখুক। আজকাল কিছুটা বুঝতে শিখেছে সে। তবু তার সামনেও চঞ্চল এই স্বাভাবিক শালীনতাবোধটুকুও রক্ষা করতে চায় নি।

সুষমাই বলে—তুমি শোও গে বেবী, রাত হয়েছে। ঘৃণায় কাঠ হয়ে গেছে সুষমা। এই তার স্বামী—বাইরে তার পরিচয় আছে। কিন্তু এমনি করে তিলে তিলে নিজেকে অন্ধকার অতলে নামবার কোন যুক্তিই সে খুঁজে পায় না।

...এই চঞ্চলই আবার অন্যত্র অন্যমানুষ। দিনের আলোয় তার ঝকঝকে পোশাক —মার্জিত কথাবার্তা—মিষ্টি হাসিটুকু প্রতিমাকেও কোথায় নিয়ে চলেছে। তার জন্য প্রতিমা উদগ্রীব হয়ে থাকে—দাদা, তিমির অফিসে চলে যায়, চঞ্চল সাধারণতঃ এই সময়েই আসে। দুপুরের মিষ্টি রোদে ভরে যায় চারিদিক, কোথায় গাছের ছায়ায় ক্লান্ত স্বরে ঘুঘু ডাকে।

ওর স্বপ্নমন তখন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে চঞ্চলের জন্য। চঞ্চল চিরযুবক। চিরযৌবনের প্রতীক সে। মুক্ত মন নিয়ে বাঁচতে চায়। তাই বোধহয় তার বাড়িতে বশ্রী ঠেকে।

সুষমা—তার মেয়ে বেবী ওরা তাকে যেন নীরব অস্তিত্ব দিয়ে বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে চায় ও গৃহী জীব—তার দায়িত্ব আছে স্ত্রীর প্রতি—সন্তানের প্রতি—সমাজের প্রতিও। দায়িত্ব—কর্তব্য ইত্যাদির বাঁধন মেনে তিলে তিলে মরতে চায় না সে। সেখানে সে গৃহস্বামী—স্বামী এবং পিতা; আর এখানে সে চিরপ্রেমিক চির তরুণ!

তাই মনে মনে এইখানেই আসতে চায় চঞ্চল—প্রতিমাকে ঘিরে তার যাযাবর মন ক্ষণিকের স্বপ্নসুখ অনুভব করে।...প্রতিমা সেই টুকুতেই খুশী হয়েছে—তার নিজের মানসিক সত্তার অবলুপ্তি ঘটছে ক্রমশঃ। একেই বলে নিঃশেষ আত্মসমর্পণ। তার মনের ভালোবাসার ভিন্ন রুচি নেই।

মাঝে মাঝে বের হয় প্রতিমা—দুজনে গিয়ে স্টেশনে দেখা হয়। কলকাতায় যায়। চঞ্চলের হাতে আজ অনেক টাকা। সেগুলোর কিছু খরচ করতে চায়, প্রতিমাকে নিয়েই তাই এই সম্ভোগের আয়োজন।

সমীর তবু কোন রকমে চেষ্টা করেছে প্রতিমার আগেকার যেখানে বিয়ের কথা পাকা হয়ে ওঠে নি। এখনও বোনকে বিয়ে দেবার জন্য। সামান্য চাকরি—অপিস থেকে কিছু ধার নেবে, ছেলেটি ভালোই। কোন সওদাগরি অপিসে চাকরি করে, মোটামুটি পড়াশোনা করেছে, বেহালার ওদিকে বাড়িও আছে। ছোট্ট বাড়ি।

সব দিক থেকে তাদের ঘরের মতই পাত্র। সমীরের ভালো লাগে ছেলেটিকে। নিজেই দেখতে আসবে—এই রবিবার দিন। কল্যাণী শুনে তবু খুশী হয়। মেয়েকে পার করতে পারলে তার গলা দিয়ে জল নামবে। বৃদ্ধ হরিপদবাবুও লাঠি ধরে এখন উঠে হেঁটে বেড়ান একটু আধটু।

কথাটা প্রতিমাকে জানায় কল্যাণী।

—কাল বৈকালে ওরা দেখতে আসবে তোকে।

প্রতিমা শ্নেছিল মা আর দাদার কথা। ওরা তাকে বিয়ে দেবার নাম করে যা তার ঘাড়ে চাপিয়ে এখান থেকে বিদায় করতে চায়। দাদারই এ চক্রান্ত।

মায়ের কথায় মনে হয় তখ্নিই ফেটে পড়বে প্রতিমা, কিন্তু চুপ করে থাকে ওকে কোন কথা বলে লাভ নেই! যদি প্রতিবাদই করতে হয় দাদার সামনে করবে।

নীরব রাগে ফুলতে থাকে। কাল রবিবার তাদের কলকাতা যাবার কথা। ে আর চঞ্চল কলকাতায় কোন একটা হোটেলের পার্টিতে যাবে।

প্রতিমা এর মধ্যেও গেছে দ্ই একদিন। বিচিত্র সেই প্রাচুর্য আর ভোগে জগৎটাকে দেখেছে। তার লোভী মন সেই স্বাদের স্বপ্ন দেখে বার বার। চঞ্চলে সেখানে নিবিড় করে পেয়েছে।

চঞ্চল আসতে হরিপদবাব্ই কথাটা পাড়েন।

চঞ্চলের সময় নেই—দেখেছে প্রতিমা ইতিমধ্যে একবার ঘ্রে গেছে। তার ম্ চোখ থমথমে। কি ভাবনার কালো ছায়া নেমেছে তাতে। হরিপদবাব্ই জানা কথাটা।

—যাক এসো পড়েছো ভালোই হয়েছে বাবা। কাকেই বা এসব কথা বলবো তুমিই তো ছেলের মতো ওদিকে সমীর তো প্রতিমার বিয়ের আয়োজন করছে ছেলে ভালোই।

চঞ্চল চমকে ওঠে। তার মনে হয় প্রতিমা তার জীবনের সঙ্গে কোথায় জড়ি গেছে। আজ তার জীবনে স্ষমার কোন ঠাঁই নেই, সে আজ বোঝামাত্র, প্রতিমা তার কাছে সব। সেই প্রতিমাকে ছেড়ে থাকবার স্বপ্ন সে দেখে নি।

ব্দ্ধ হরিপদবাব্ বলে চলছেন।

—কাল দেখতে আসবে প্রতিমাকে, যদি পছন্দ হয়ে যায়—কিছ্ টাকাকড়ি দরকার! তাই তোমাকে বলছিলাম—বাকী কথাটা জানে চঞ্চল। ওরা তাকে হাতিয় হিসাবেই ব্যবহার করেছে। স্ষমার মতো স্বামীপরিত্যক্তা মেয়েকে তার উপ গছিয়েছে তারা কৌশল করেই, এই কথাটা চঞ্চলের মনে হয়, তিমিরের চাকরি ক দিয়েছে চঞ্চল, ব্দ্ধের ওষ্ধপথ্য—সংসার খরচও য্গিয়েছে, তার কাছ থেকেই টাব নিয়ে তারা প্রতিমাকেও সরিয়ে দিতে চায়।

...সব মান্ষের নীচতা আর ভণ্ডামির ম্খোসটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। তব্ পরম নির্বিকার হবার ভান করে সায় দেয় চঞ্চল।

—ঠিক আছে। দেখ্ন কি হয়—তখন যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। ব্দ্ধ নিশি হয়ে আশীর্বাদ করে।

—দীর্ঘজীবী হও বাবা। তুমিই আমার ভরসা। জানো তো সমীরের অব

তিমিরও চাকরি করছে বটে, তবে বিশেষ দেয় টেয় না। বলছে ডেলিপ্যাসেঞ্জারি তে কষ্ট হয়; কলকাতায় মেসে থাকবে। সবাই নিজের নিয়েই খুশী—

…চঞ্চল বুড়োর দিকে চেয়ে থাকে। বিশ্রী লাগে ওর নির্লজ্জ কথাগুলো শুনে। া ভিখারীর মতোই নীচ ওর মন। নিজেও তাই মিছে কথাগুলো বলে সরে যায় জ ভাবেই।

প্রতিমা পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। চঞ্চলকে ঢুকতে দেখে ওর দিকে ল। প্রতিমা যেন রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়বে, ওদিকে চঞ্চল ওর এই প্রতিবাদের ঠন্যে খুশী হয়েছে মনে মনে। এসব কিছুর উপরই তার সম্পূর্ণ অধিকার য়ম রাখতে চায় সে। প্রতিমা বলে।

—সব কথাগুলো শুনলে চুপ করে?

চঞ্চল হাসছে—তুমি কি বলো?

প্রতিমা ওর কাছে এগিয়ে আসে। দু চোখে আজ তার জল। আজ সে সব াকে দূর করে সব অপমান সয়ে ওকে কাছে পেতে চায়। চঞ্চলের কাছে তার ন লজ্জা নেই। ওর বুকে প্রতিমা আজ নির্ভর খোঁজে, তার সব ব্যক্তিত্ব চেতনা রয়ে গেছে। সে শক্ত হয়ে ওঠে নিজের পথ বেছে নিতে!

সে পথচলা হবে ওই চঞ্চলকেই সঙ্গী করে।

প্রতিমা জানায়।

—এতে মত নেই আমার। যার তার সঙ্গে ধরে বেঁধে বিয়ে দেবে!

ছাই!

সন্ধ্যার সময় মদন শ্রীদাম আসে, কোন কোন দিন জোটে চঞ্চলও। শ্রীদামই খানা আনে সেদিন মদের আড্ডায়। চঞ্চলের সেই চালু বইখানা।

ওরা তারিয়ে তারিয়ে পড়ছে। মুখে ফুটে ওঠে বিজাতীয় একটা পাশব ভৎসতা। মাঝে মাঝে বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায় এখানের কথা! কোন মেয়ে-লর ঘরে একসঙ্গে গিয়েছিল তারা ফূর্তি করতে কোথায় তারই জীবন্ত বর্ণনা। াদেহের সুঠাম ছন্দ আর রেখা সৌন্দর্যকে চঞ্চল তার কলমের কালিতে পঙ্কিল া তুলেছে।

—আর একবার পড়ো জায়গাটা। মাইরি ক্যাপ্টার করেছে গুরু। একেবারে ইন!

হঠাৎ চঞ্চলকে ঢুকতে দেখে হৈ হৈ করে উঠল তারা। টেবিল চাপড়ে গান ধরে াম। তিনকড়ি উঠে গিয়ে চঞ্চলকে জড়িয়ে ধরে সশব্দে একটা চুমু খেয়ে বলে।

—বেড়ে লিখেছো গুরু, সোনার দোত কলম হোক তোমার। এই না হলে বই! গরম তেলেভাজা রে? তা নয় শালা পয়সা দিয়ে বই কিনে শুধু হিতোপদেশ বো। ধ্যাত্তোর, তার জন্যে তো গীতা ভাগবত টাগবত আছে—নারে ছিদে?

চঞ্চল বলে ওঠে—এ কি! শুধু মুখে বসে আছো কেন?

অবাক হয় তিনকড়ি। আবিষ্কার করে গোবিনের দোকানে ওরা এতক্ষণ
শুধু মুখে বসে আছে। মদও ছুঁতে ভুলে গেছে।

তিনকড়ি হাসতে থাকে।

—তালেই দেখো গুরু কি লিখেছো মাইরী, মাতালকে মদও ভুলিয়ে দিয়ে
তোমার লেখার গ্যাঁজলায়! ওরে গোবিন—দে দুটো ব্ল্যাক নাইট,—আর সোডা
সেই সঙ্গে চারটে কাটলেট, মাল খাবার কাটলেট দিবি, কপোত কপোতীর ওই
পর্দাঘেরা খোপে বসে খাবার কাটলেট নয়—বুঝলি! যেন তেজী থাকে।

ওদের আড্ডা জমে ওঠে। ছিদে বলে।

—আজ নোতুন জায়গায় চলো তিনু।

তিনু ওসবের সন্ধান জানে। ইদানীং হাতে কিছু ক্ষমতা আবার পর থেকে
দেখেছে ও সবের অভাব নেই, শুধু বেছে নিতে পারলেই হল। তিনু আশ্বাস দেয়

—হবে বাবা হবে। গুরুকে আবার কোন্ ঘাটে লিয়ে যাই শেষ কালে লি
দিক ফলাও করে।

চঞ্চলের মনটা ভালো নেই। প্রতিমার বিয়ের ব্যাপারেও ভাবছে সে। এ স
ওকে ছাড়তে চায় না সে। নিজের সেই অন্তহীন নিঃসঙ্গতাকে ভয় করে।

হঠাৎ কাকে পর্দাটা সরিয়ে ডাকতে দেখে চমকে ওঠে চঞ্চল।

সদানন্দবাবু এখানে এসে পড়বেন ভাবে নি সে। তিনকড়ি—শ্রীদাম অবশ্য
সব নিয়ে মনে করে না, চঞ্চলও তার এই ভণ্ডামিকে ঢাকতে চায় না। তাই সহ
ভাবেই চাইল ওর দিকে।

চমকে উঠেছেন সদানন্দবাবু। জানতেন এটা চায়ের দোকান—এখানে এ
চলে তা জানতেন না। জীবনে এমনি করে কোন ভদ্র সামাজিক মর্যাদার লোকে
মদ খেতে দেখেন নি তিনি। বলেন।

—এখন যাচ্ছি, একটু কথা ছিল তিনকড়ি!

তিনকড়ি জড়িত কণ্ঠে বলে।

—এসেছেন যখন বসেই যান স্যার। আপনি তো এ সবের মম্মো বুঝবেন
তা বলুন।

সদানন্দবাবু টেবিলে চঞ্চলের বইটা দেখে শিউরে ওঠেন। মদের টেবিলেই ও
যেন শোভা পায়। পড়েছেন তিনি—অনেক কষ্টে। ঘৃণায়—অসহায় রাগে সা
দেহ রি রি করে উঠেছিল। আর অসহ্য ঠেকেছিল সেই বইকে মহৎ সাহিত্যকীর্তি
নামে যখন কেউ কেউ অভিহিত করেছেন। তাঁর এতদিনের ধারণা—সংস্ক
—নীতিবোধকে মূল্যহীন বলে। মানবিক সত্য বলে প্রচার করতে চায়।
জঘন্য নীচ প্রবৃত্তির উদ্দাম প্রকাশকে।

এতো বড় নৈতিক অবমাননার সামনা-সামনি তিনি হন নি। আজ তা
গ্রন্থটাকে যোগ্য পরিবেশে যোগ্য স্থানে দেখে চমকে উঠেছেন।

তিনু বলে।

—বলুন স্যার।

একদিন এদের শিক্ষক ছিলেন, চঞ্চলও তার ছেলের বয়সী, তবু এদের কোন জা নেই। চঞ্চলই বলে।

—এটা এক আধটু খাই, তাতো জানেনই। এ নিয়ে এত লজ্জা করছেন ন!

উঠে পড়েন সদানন্দবাবু। তিনকড়ির যে স্বরূপের প্রকাশ পেয়েছেন তাতে মের পারঘাটের ব্যাপারে আবেদন নিষ্ফল হবে তা বুঝে নিয়েছেন। নিজেকে নক লজ্জার মধ্যে এনে নামিয়েছেন, আর নয়।

—উঠলেন যে।

চলি! ওসব কথা এখন থাক তিনু! চঞ্চল! তোমার সম্বন্ধে আমার অনেক ধারণা ছিল, কিন্তু থাক ওসব কথা।

হাসছে তিনু।

—বেড়ে লিখেছে স্যার। দারুণ বই। লিয়ে যান—পড়ে দেখবেন।

তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মতো বের হয়ে গেলেন সদানন্দবাবু। আজ মনে হয় নের আলোও মেঘে ঢেকে গেছে, বাতাসে উঠছে কেবল ওই বিযাক্ত পানীয়ের বিশ্রী ধ। মানুষের মন অন্তর সব পচে গেছে। থিক থিক করছে।

বৃদ্ধ আজ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করেন।

এইসব দৃশ্য না দেখলেই ছিল ভালো, মানুষকে এতো নীচ বলে ভাবতে চান না া, তিনি তো আশা নিয়ে স্কুলে ভবিষ্যৎ জাতি গড়বার চেষ্টা করেছেন।

এরাই কি তার নমুনা।

দুপুরের রোদ ম্লান হয়ে ওঠে তার সামনে।

এতদিন অনেক আশা নিয়ে এসেছেন, ভেবেছেন হয়তো এই সামগ্রিক বিপর্যয় য়ে আবার একদিন মানুষ তার নিজের মর্যাদার আসন খুঁজে পাবে, সুখী !

কিন্তু নিদারুণ বেদনায় তার মন ভরে উঠেছে।

—মাষ্টার মশাই!

সদানন্দবাবু থমকে দাঁড়ালেন। বড় ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে!

তাঁর আজীবনের সাধনার নিষ্ঠুর ব্যর্থতা দেখে তিনি শিউরে উঠেছেন।

সমীরকে দেখে দাঁড়ালেন।

ডিউটি সেরে ফিরছে সে।

—শরীর ভালো নেই মাষ্টার মশাই?

সদানন্দবাবু ছড়িতে ভর দিয়ে নিজের দেহটাকে সযুত করতে চান। জবাব —না। ভালোই আছি। চঞ্চলকে দেখলাম। ওর নোতুন বইখানা পড়েছো?

সমীর পড়েছে তবু জবাব দিতে পারে না। ওটা পড়াও তার কাছে লজ্জ
সদানন্দবাবু বলেন।

—আমি পড়েছিলাম, আজ স্রষ্টাকেও দেখলাম। সব ওর মিলে গেছে। ‹
হবে তা ভাবি নি। একটা কথা মনে পড়ে বুঝলে, রবীন্দ্রনাথের কথা। ত
বেদনায় তিনি বলেছিলেন, তার দর্শন মিথ্যা হয় নি।

আজি মানবের সব সাধনার
কুৎসিত বিদ্রূপ,
দিকে দিগন্তে করিছে প্রচার
মানবিকতার রূপ।
আমার আয়ুর প্রদোষ গগনে
এ কুশ্রী বিভীষিকা,
হেরিতে হবে কি মৃত্যু লগনে
জ্বালার প্রলয় শিখা?

এতদিন যা ধ্যান-ধারণা বলে জেনেছিলাম—সত্য সুন্দর বলে ভাবতাম ত
সব মিথ্যে? সব সুন্দর নিঃশেষে মরে যাবে সমীর?

প্রজাপতি মনকে ওরা হত্যা করবে?

সমীর এর কি জবাব দেবে জানে না। তার চারিদিকে এমনি জ্বালার
প্রকাশ, ওই রক্তবীজকে সেই-ই কেড়ে এনেছিল অতীতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থে
ওই চঞ্চলই তাকে আঘাত দেয় নি।

আজকের জীবনের পুঞ্জীভূত গ্লানি—লোভ আর নীচতা ওই ঋষিকল্প মানু
মন বেদনায় ভরে তুলেছে। দুজনে চুপ করে পথ হাঁটছে—ক্লান্ত পথ।

চঞ্চলের বইখানা পড়েছে সমীর। রাগ হয়েছিল সেই কদর্য বইখানা তা
বাড়িতে দেখে। চঞ্চল তাতে নাম সই করে প্রতিমাকে উপহার দিয়েছিল।
বিবেকে এতটুকু বাধে নি। মনে হয়েছিল নিজের মনের যে পাপটা হয়তো প্রা
সামনে প্রকাশ করতে পারে নি—সেই লোভ আর কুৎসিত পাশবিকতাকে সে ওই
এর ছত্রে ছত্রে প্রকট করে প্রতিমার হাতে তুলে দিয়েছে, তার মনকে বিষিয়ে তুলে

সমীর বাড়ীতে এসেই চমকে ওঠে।

প্রতিমা মাকে বেশ গলা তুলে শাসাচ্ছে। কল্যাণী মেয়ের কথার জবাব দে
চেষ্টা করে।

—ওরা দেখেশুনেই বিয়ের কথা বলেছে।

প্রতিমা বাধা দেয়।

—না। বিয়েতে আমার কাজ নেই। এতই যদি বোবা হয়ে থাকি বলে
নিজের পথ আমি নিজেই দেখে নিতে পারবো।

কল্যাণী বিরক্ত হয়ে বলে।

—ওসবে আমি নেই বাপু। নিজেকে কি এত বিদ্যেধরী ভাবিস যে বিয়ে করবি না? যা বলতে হয় দাদাকেই বলিস।

প্রতিমা সদাপে জবাব দেয়।

—তাই বলবো। আমার কথা তাকে ভাবতে নিষেধ করো। পারে নিজে একটা বিয়ে করুক তাহলেই হবে।

সামনেই সমীরকে দেখে প্রতিমা একটু থমকে দাঁড়াল। তার মুখ চোখ কঠিন হয়ে উঠেছে। সমীর এমনি কথা প্রতিমার কাছ থেকে শুনবে আশা করে নি। সারাদিন খেটে তেতেপুড়ে এসেছে। প্রতিমার ভালোর জন্যই এ ব্যবস্থা করেছিল সে। তারজন্য নিজেও ঋণগ্রস্থ হতো কিন্তু বিনিময়ে প্রতিমার কাছ থেকে এমনি কথা শুনবে স্বপ্নেও ভাবে নি সে।

বলে ওঠে সমীর বেশ কড়া স্বরেই।

—বিয়ে হয়ে গেলে অসুবিধে হবে যে। একজন বিয়ে করে বাইরে বাইরে ফুর্তি করছেন তিনি গ্রেটম্যান, অন্যজন বিয়ে না করে তাই করবেন, আমাকে সেইটাই দেখতে হবে?

—দাদা।

প্রতিমা রাগে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। কল্যাণী ওদের মাঝখানে এসে ড়ে।

—থাম সমী। সারাদিন খেটে এসে আর মাথা গরম করিস না। যে যা ভালো াঝে করুক। তুই আর কথা বাড়াস না। আয়।

প্রতিমা—যা দিকি। ঘরে যা—ঢের হয়েছে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা!

—কোন অন্যায় আমি করি নি।

প্রতিমা তখনও ফুঁসছে। সমীরের মনে হয় সামনে সে একটা ফণা তোলা াগিনীকে দেখছে।...মনে হয় তার সব ধারণাকে ওরা নিবিয়ে দিয়েছে শুধু বিষাক্ত থার ছোবলে। বের হয়ে যায় সে, মা ডাকছে সমীরের কানেও যায় না ডাকটা।

বের হয়ে আসবার সময় টেবিলের উপর সমীর চঞ্চলের সেই বইখানা। বেশ ুঝেছে প্রতিমার মনে এই প্রতিবাদের নেশা ঢুকলো কোত্থেকে। সে শুনেছিল— াখেছেও এ বাড়িতে চঞ্চলের আসা যাওয়া, সুষমার কথাগুলো মনে হয় সত্যিই। ঞ্চলের মনের লোভটাকে সে দেখেছে—প্রতিমাকে ঘিরে সেই লোভের কথাই বলেছিল ুষমা।

আজ সমীরের সারা শরীরের রক্ত যেন মাথায় উঠেছে। বলিষ্ঠ পেশীগুলো ক হয়ে ওঠে। অনেক দিন অনেক কিছু সহ্য করেছে সে। এইবার প্রতিবাদ করা রকার।

বাধা না পেয়ে ও ভেবেছে সেই-ই এ সমাজের বুকে তার অত্যাচার আর ম্ভোগের বিজয়রথ চালিয়ে যাবে, তার অন্তরের গরল আর লোভের আগুনে শুত

শত মন—কতশত ঘরকে জ্বালিয়ে দিয়ে প্রতিশোধের স্পৃহা মেটাবে নিষ্ঠুর দানবের মতো।

সমীর চলেছে চঞ্চলের বাড়ির দিকে, দুপুরের রোদ তখনও রাস্তায় একটা নিঃস্বতার জ্বালা এনেছে। দুচারটে কাক ময়লার স্তূপে খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছে। খোলা নর্দমার গন্ধ উঠেছে বাতাসে। নোংরা গন্ধ। গোবিনের দোকানে এখন খদ্দেরপত্তর বিশেষ থাকে না। সামনের দিকটার ওরা টেবিলের উপর চেয়ারগুলো তুলে ধোয়া মোছা করছে, হঠাৎ পিছন দিক থেকে চঞ্চলকে বের হয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়াল সমীর। চঞ্চলের দুটো চোখ নেশার ঘোরে চকচক করছে। কালো চশমাটা পরে নিল সে।

সমীরের কাছাকাছি আসতেই সমীর কি এক উত্তেজনা বশে বইখানা ওর দিকেই ঘৃণাভরে ছুঁড়ে দিল, প্রতিমাকে ওই বইখানা সে দিয়েছিল। বইখানা ওর মুখেই লাগতো, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বইটা গিয়ে ছিটকে পড়ল নর্দমাতেই।

চঞ্চল বুঝেছে সমীরের রাগের কারণ। নেশা করলেই চঞ্চল সহজে নিজেকে হারায় না। বরং তার মনের সব অনুভূতি আর জ্ঞানটা টনটনে হয়ে ওঠে। চঞ্চল সহজভাবে বলে।

—বইটা নর্দমায় ফেলে দিলে ?

সমীর রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মতো ফুঁসছে। শোনায়।

তোমারও ঠাঁই ওই নর্দমাতেই। গাটার স্নাইফ্।

চঞ্চল সমীরকে দেখছে। একটু চমকে উঠেছে সে। ওর দুটো চোখ রাগে ও হিংসার কাঠিন্যে জ্বলছে।

—গায়ে হাত তুলবে নাকি ?

সমীরের মন সব জ্বালা তাকে বিভ্রান্ত করতে চায়। তবু বলে সে।

—ওটা করতে পারলে খুশী হতাম। তোমার ওই আদ্দির পাঞ্জাবীর আড়ালে লোভী মন আর কালো চশমার আড়ালে পাপী চোখ দুটোকে সব আবরণ ভেদ করে দিনের আলোয় আনতে পারলে আনন্দ পেতাম। কিন্তু সভ্যতার মুখোসটাই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার মতো সেটাকে ছুঁড়ে দিতে পারি নি।

চঞ্চল সমীরের কথাগুলো শুনছে। সমীর বলে চলেছে।

—কি বলেছো তুমি প্রতীমাকে ? ওর সর্বনাশ না করে খুশী হবে না ?

ওকে সামান্য নিয়ে শান্তিতে বাঁচতে দাও। সুষমার জীবন বিষিয়ে তুলেছো—ওকে মুক্তি দাও চঞ্চল।

সমীর যেন অসহায় কণ্ঠে আবেদন জানাচ্ছে। চঞ্চল জানে ওর দপ্রফ কতখানি থাকবে। চঞ্চল জানে প্রতিমাকে তারা মত করাতে পারবে না সহজে, ভালো পাত্র পাবার সাধ্যিও তাদের নেই। তাই রাজী হবে না প্রতিমা। সে বিশ্বাস তার আছে। তাই সহজভাবেই জবাব দেয় চঞ্চল।

—তোমরা স্বচ্ছন্দে ওর বিয়ে দিতে পারো। আমি বাধা দোব কেন? অবশ্য তুমি যদি চাও।

চঞ্চলের পাপী মন অতল অন্ধকার থেকে সদ্যজাগর সরীসৃপের মতো বলে চলে চঞ্চল।

—অনেকে বলে সেইটা তুমি নাকি চাও না। স্বার্থটা কি তা তুমিই ভালো জানো।

চঞ্চল হাসছে, বিশ্রী শব্দ করা সেই কুশ্রী ইঙ্গিতময় হাসিটা সমীরের দেহ মনে আগুন ধরায়। ওর কাছে এমনি জঘন্য ইঙ্গিতবহ কথা শুনবে তার বোনের সম্বন্ধে এটা স্বপ্নেও ভাবে নি সে। গর্জন করে ওঠে সমীর—মুখ সামলে কথা বলবে চঞ্চল। আর একটি কথা উচ্চারণ করলে আমি তোমার টুঁটি ধরে ওই নর্দমাতেই তোমাকে পুঁতে ফেলবো। যে মানুষটাকে একদিন নিজের হাতে মরণের মুখ থেকে তুলে এনেছিলাম—আজ তাকে নিজের হাতেই শেষ করে যাবো।

চঞ্চল মৃত্যুকে সামনে দেখে নি। হঠাৎ তার সামনে আগেকার সেই ঝড়ের রাতের ছবিটা ভেসে ওঠে, একটি মানুষ বাঁচার জন্য দুর্বার চেষ্টা করে অতল বিক্ষুব্ধ গঙ্গার জলে তলিয়ে যাচ্ছে - সেদিন ওই বলিষ্ঠ হাতখানা তাকে তুলে এনেছিল। আজ ওর চোখে দেখেছে মৃত্যুর ছায়া। জীবনে এখনও তার অনেক পাওনা বাকী। আজ লোভী কাঙ্গালের মতো জীবনকে আঁকড়ে ধরে তার দুরন্ত ভোগবিলাসের ক্ষুধাটাকে বাঁচাতে চায় সে। তাই তার ভীরু মন চমকে ওঠে।

সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছে দুজনে।

পিছনে বের হচ্ছে তিনকড়ি শ্রীদাম আর মদন। তিনু মাতাল হয়ে উঠলে খিস্তী করে; চঞ্চলকে ওই অবস্থায় দেখে এগিয়ে আসে ওরা।

—কি হল গুরু! সম্বন্ধীকে এক গেলাস অফার করো! বড় কুটুম! এ্যা—অ ছিদে,—গুরু কি বলে র‍্যা!

সমীরের ঘৃণা বোধ করে ওখানে দাঁড়াতে। আজ একটা বোঝাপড়াই করতে এসেছিল সে। চঞ্চলের যদি এতটুকু মনুষ্যত্ব আর বিবেক থাকে তাহলে সাবধান হবে সে।

ওদের জড়িত-কণ্ঠের কথাগুলো কানে আসে। ছিদে বলে চলেছে।

—গুরু তোর কাজের রে। গাছেরও খাচ্ছে তলারও কুড়োচ্ছে। নজর ওজর অন্যদিকে—, সেই যে—

হাসির শব্দ কানে আসে। সমীরের রক্তে মাতাল লাগে। ওদের মুখ বন্ধ করতে চায় সে। কিন্তু ওরা আজ সমাজের পদস্থ লোক—তিনু তাদেরই চটকলের লেবার লিডার। কে যেন সমীরের হাত-পাগুলো বেঁধে মারছে তাকে—কিছু করার উপায় নেই।

ওরা চলেছে গঙ্গার ঘাটের দিকে। বটগাছের ছায়ায় বসে পার-ঘাটের সেই কদমের সন্ধান নেবে তিনু! বলে চলেছে তিনু।

মাগী মহা ধাড়িবাজ বুঁউলে! আম্মো তিনু দাস—দেখে নোব একহাত মাগীকে। ডাঁট ওর ভেঙ্গে দোব।

আমার সঙ্গে রংবাজি।

চঞ্চলের মেজাজটা ভালো নেই। নেশার রঙীন আবেশে কেটে গেছে সমীরের ওই কথাগুলোয়। তাকে আজ মুখোমুখি হয়ে জানিয়ে গেছে সে নাকি নর্দমার কীট। তার সব মনটাই নর্দমার কাদায় ভর্তি! তারই প্রকাশ তার সৃষ্টির মধ্যে।

কথাটা মনে হয় তার—এতদিন ওকথা সে বলে নি। তার লেখার প্রশংসা করেছে, তাকে উৎসাহ দিয়েছে। দুজনে মাঝে মাঝে বের হয়েছে এখানে ওখানে। ঘুরে ঘুরে দেখা সেই মানুষগুলো যখন তাদের কান্না-হাসি নিয়ে সাহিত্যের দরবারে হাজির হয়েছে—সেদিন সমীরই তাকে জানিয়েছে সাদর সম্ভাষণ। দুজনে সাহিত্য—দেশের সমাজের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছে, সেদিন সমীরই ছিল তার আপনজন।

আজ সেই সমীর এসেছিল, তাকে যা তা শুনিয়ে গেছে, ওর মনে তার জন্য জমে আছে ঘৃণার পাহাড়। চঞ্চল বোঝে সে অনেক দূরে সরে গেছে ওর আদর্শ থেকে।

আজ সমীরকে কুৎসিত ইঙ্গিতও করেছে। এটা তার কাছে অতি সহজেই সত্য বলে মনে হয়। তার বিকৃত মনের কাছে এটা সহজ স্বাভাবিক ঘটনা। সমীরকেও সে তাই ঘৃণা করে।

আদর্শ!

তার কাছে ওসব দুর্বলতারই লক্ষণ।

মদের চাপাপড়া নেশাটা ঠেলে উঠছে। চলতে চলতে লাইনের এদিকে এসে গেছে। কোথায় যাবে জানে না। বাড়ি ফিরতেও ইচ্ছে করে না।

চঞ্চলের কাছে সারা জীবনটা রোদপোড়া ওই শীত শেষের ধরণীর মতোই বিবর্ণ সবুজ শ্যামলিমাহীন।

দাঁড়াল সে। লাইনটা চলে গেছে, কালো লোহার লাইন দিয়ে নীল আর হলুদ রং-এর একটা ইলেকট্রিক ট্রেন ছুটে গেল। আবার শূন্যতা জাগে।

—কি পেয়েছে চঞ্চল এতদিনের জীবনে? ছোট্টবেলায় মাকে দেখে নি—কোন স্নেহ মায়া মমতার সঞ্চয়ও নেই তার মনে। বাবা একটা মদ্যপ জানোয়ার—স্ত্রী বলতে বিচিত্র একটি মেয়ে—যে তাকেও আজ নিদারুণ ঘৃণা আর অবহেলা করে। সন্তান তাকে দেখে এড়িয়ে যায়। বন্ধুবান্ধব বলতে মদ্যপ কতকগুলো প্রাণী—সমাজ বলতে দেখেছে কতকগুলো মেরুদণ্ডহীন জীব, যাদের মন কেবল লালসায় ভরা।

···তাকেও চলতে হয় প্রতিটি পদক্ষেপে সংগ্রাম করে। লেখার থেকে তার আয়

কিছু হয়—, কিন্তু তার জন্যও পরিশ্রম করতে হয়, দেখেছে সেখানেও কত লোকের ভিড়। কৌশলী ধূর্ত—এলেমদার লোক। কত অযোগ্য লোককেও তাকে সহ্য করতে হয়। পদে পদে শুধু একটা মুখোস পরেই চলতে হয় এর জন্য। বিশ্রী লাগে, সর্বত্রই কেবল জ্বালা।

সমীরের দেওয়া আঘাতটা তার মনে ঘৃণা এনেছে। সমীরকেও সে ঘৃণা করে। আদর্শ—নীতিবাদ!

সদানন্দবাবুর দু চোখে ও দেখেছে ঘৃণা, ওরা মহৎ জীবনে—সত্য এবং সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী, ত্যাগকে ওরা পলায়নী মনোবৃত্তি বলে না—বলে মনুষ্যত্বের প্রকাশ। পুরুষাকারকে ওরা বলে স্বার্থপরতা—পাশবিকতা!

…প্রতিমার কথা মনে পড়ে? প্রতিমাকে ভালো লাগে চঞ্চলের। আজ সমীরের ওই কথাগুলোর জবাব দেবার পথ খোঁজে সে। জীবনে সুষমার ঠাঁই আজ হারিয়ে গেছে, নিছক দায়িত্বমাত্র সে। প্রতিমা তার জীবনে পথ চলার একটা সুর। যেখানে মনের মিল নেই, যেখানে ভালোবাসার কোন 'সম্পর্ক' নেই সেখানে শুধু পরিচয়টাও অসহ্য ঠেকে চঞ্চলের।

…সে বাঁচতে চায়—সব পেয়ে বাঁচতে চায় নোতুন করে।

—বাবু!

হঠাৎ কার ডাকে দাঁড়াল চঞ্চল—চেনা মুখ। একটি ছেলে আর মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। চঞ্চল চিনতে পেরেছে। ওরা দুজনেই চাল চালানের কাজ করতো, তখন চেহারা ছিল ভবঘুরের মতো, মেয়েটায় জামাকাপড়ও ছিল ময়লা। আজ তাতে একটু বাহার এসেছে মেয়েটার মাথায় সিঁদুর। পরণে লাল পাড় একটা মিলের শাড়ি।

—গোরাচাঁদ! তুই!

গোরাচাঁদ চঞ্চলকে ভক্তিযুক্ত হয়ে প্রণাম করে, মেয়েটাও।

গোরা বলে চলেছে।

—বিয়ে-থা করলাম, এখন কলোনীতে দোকান, মুদিখানা পানবিড়ির দোকান। আপনাদের ছিচরণের আশীর্বাদে তা চলেছে একরকম। ওসব ছেঁড়া কাম ছাড়ান দিলাম বাবু।

মেয়েটা হাসছে মুখ টিপে। কপালে ওর সিঁদুরের টিপ। চোখ দুটো বেশ ডাগর! চেহারায় এসেছে শান্ত মধুর তৃপ্তির আর নিশ্চিন্ততার আবেশ। ওরা সুখেই আছে সামান্য নিয়ে।

ভালোবাসা! দুজনে দুজনকে ভালবাসে!

—বাসুক! চঞ্চল মনে মনে হাসে। সামান্য চাওয়া তাই বোধ হয় ওই নিয়েই ওরা ঘর বেঁধেছে খুশি মনে। ভালোই আছে। আর সে!

চারিদিকে তার বুকজোড়া অশান্তি, বদনাম আর কামনার জ্বালা। ও যেন অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে।

পাখীগুলো কলরব করে। মাঠের ধারে বসে আছে চঞ্চল। ওদের দেওয়া আঘাতটা আবার ফিরিয়ে দেবে সে। সে জানোয়ার! ওরা দেবতা! সব দেবতাকেই চিনেছে চঞ্চল। মনে হয় নীট্‌শের কথা। আজকের কথা দুর্বল মানুষগুলো শুধু নীতিবাদের ফণা ধরে থাকবে, সনাতনী ঝুলিকেই—সেই মতো আর পথটাকে সত্য বলে থাকবে কিন্তু সব জীর্ণতাকে ভেদ করে উদয় হবে নোতুন সমাজ, তাকে শাসন করবে পথ দেখাবে নোতুন এক শ্রেণীর মানুষ।

আজ সেই ভাঙ্গনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। চঞ্চলের মতের কাছে তার চাওয়ার কাছে ওই জীর্ণ ঘুণ ধরা মানুষগুলোর সব শক্তি খর্ব হয়ে যাবে।

সে তছনছ করে দেবে সব কিছু।

তাই যেন কলম ধরেছে সে—তার জীবনাদর্শেও হবে তারই প্রতিফলন।

ফিরছে চঞ্চল। বাড়ির দিকে নয়। সমীরদের বাড়িতেই চলেছে সে প্রতিমাকেও ওরা অপমান করেছে। ওদের সব বিশ্বাসকে সে আজ চুরমার করে দেবে, নীতিবোধকেও।

রাতের আবছা অন্ধকারে এবাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল চঞ্চল।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমেছে, বাতাসে কোথায় রাতজাগা হাস্নুহানার সুবাস ওঠে, আকাশ বাতাস কি বেদনায় ভরে তুলেছে। প্রতিমার মনে হয় তার সারা জীবনে অমনি বেদনার ছায়া। অচেনা কোন একটি লোককে মেনে নিয়ে তার আলোভরা ভালোলাগা জগৎটাকে ছেড়ে যেতে হবে।

…হাঠাৎ কার ডাকে চমকে ওঠে প্রতিমা।

চঞ্চল!

—চঞ্চল বাইরে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছে। চঞ্চল ওদের বাড়ি ঢোকে নি বাইরে থেকেই ডাকছে তাকে। প্রতিমা বের হয়ে এল বাইরে। বলে—

—ভিতরে যাবে না?

চঞ্চল জবাব দেয়।

—ভিতরে গেলে সমীরবাবু আবার অপমান করতে পারে। তুমি চলে আসবে প্রতিমা!

প্রতিমা এমনি আহবানের প্রতীক্ষা করেছিল সারা মন দিয়ে। তার জীবনের এই যেন একমাত্র কামনা। এতদিন যা পেয়েছে তার দাম কি! আজ তবু সারা মন গুমরে ওঠে। অনেক কিছু পাবে সে। একজনকে নিঃশেষে ভালবেসে আবার বাঁচবে

…চঞ্চল বলে।

—আমি সব ভেবে চিন্তেই এ কথা বলছি প্রতিমা। আবার নোতুন করে বাঁচতে চাই। তুমি কি পারো না সব ছেড়ে চলে আসতে। এমনি করে বেঁচে থাকার সার্থকতা কি আছে? নীতি বিবেক—সংস্কার?

প্রতিমার কাছে ওসব আজ অর্থহীন বলে মনে হয়। কে কি ভাববে তাও আজ গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না সে। চঞ্চল বলে।

—ভালোবাসার স্পর্শ যেখানে নেই সেখানে বাঁচা যায় না।

প্রতিমা তেমনি নিঃশেষ ভালোবাসারই সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়েছে। চঞ্চল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে, প্রতিমা ভিতরে গেছে। তারাজ্বলা রাতের অন্ধকারে সে দেখে নি চঞ্চলের মুখে লালসা আর প্রতিশোধের ছায়াটি।

ভালোবাসা!

চঞ্চল আজ নিজেই সেই বিচিত্র অবিশ্বাস্য কথাগুলো বলে চলেছে সহজ ভাবে। ওরা সকলেই এই কাল্পনিক একটা জীবনসত্যের কল্পনা করে নিয়েছে। প্রতিমাও তারই স্বপ্ন দেখে। জীবনে ওটাই যেন পরম কাম্য।

সমীরের অসহায় কালো মুখখানা চঞ্চলের সামনে ভেসে ওঠে। ওকে আঘাত দেবার দুর্বার শপথ চঞ্চলের মনে।

অন্ধকারে এগিয়ে আসে প্রতিমা। তার মন স্থির করে ফেলেই বলে সে চঞ্চলকে।

চলো!

ওর হাতখানা চঞ্চলের হাতে। অন্ধকার পথে অসহায় একটি নারী অনেক কামনা নিয়ে ওর সঙ্গে বের হয়ে এসেছে পিছনের সব স্নেহ প্রীতি কর্তব্যের পরিচয় ফেলে রেখে। সেই দীর্ঘদিনের আশ্রয়টাকে আজ তুচ্ছ করে পথে বের হয়ে এল প্রতিমা।

দুজনে চলেছে। আজ চঞ্চল মদ খায় নি এখনও। মনে হয় তার সব মনের কাঠিন্য—অন্তরের দৈন্য এখুনি বের হয়ে পড়বে। সেই অতলের নীচ মনটা টুঁটি টিপে দম বন্ধ করতে চায়।

প্রতিমার মনে খুশীর জোয়ার। তার ভালোবাসা ব্যর্থ হয় নি। দিদি—ওই দাদার—মায়ের সব অপমান আর অবহেলার জবাব দিতে পেরেছে সে। আজ তাই মনে হয় প্রতিমা জিতেছে।

···রাতের ট্রেনখানা কলকাতার দিকে ছুটে চলেছে। এখন কলকাতায় যাবার যাত্রী তত নেই। স্টেশন—কারখানার চিমনির মাথায় লাল আলোর আভা—ওই ছায়াঘন গুলমোহর গাছটা আজ—ভালো লাগে প্রতিমার।

চঞ্চলের দু চোখে সেই নেশার আমেজ। প্রতিমার যৌবনবতী দেহের আকর্ষণ তাকে আজ উন্মাদ করে তুলেছে। তার কাছে ওকে পাবার আজ কোন বাধা নেই। সব বাধাকে সে আজ তুচ্ছ করেছে।

—কোথায় উঠবো আমরা?

প্রতিমার চোখে আজ ঘরের স্বপ্ন, নিজের একটি নীড় রচনা করবে সে। তার সব চাওয়ায় যেন পূর্ণতা এসে গেছে।

রাতের অন্ধকারে ট্রেনটা ছুটে চলেছে; প্রতিমার মনে অমনি কোন উজ্জ্বল আলোক স্বপ্ন।

চঞ্চল ওর কথার জবাব দেয়।

—কোন হোটেলে উঠবো। পরে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

…খবরটা রাতের অন্ধকারেই দিনের আলোর মতো প্রকট হয়ে পড়ে। সুষমাও এবাড়িতে এসেছে। বৃদ্ধ হরিপদবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন, কল্যাণীর চোখে জল।

সমীর এদিক ওদিক প্রতিমার বন্ধুদের বাড়িও খুঁজছে। কিন্তু প্রতিমার কোন খোঁজই পায় নি। কল্যাণী জানায়।

—সন্ধ্যাবেলায় দেখলাম ঘরে, বসে আছে চুপ করে—কেউ তো আসে নি গেল কার সঙ্গে?

সুষমাও জানে না ব্যাপারটা। চঞ্চল সকাল থেকেই বের হয়ে গেছে। বোধ হয় কলকাতাতেই গেছে। সমীরও বলে নি বাড়িতে কোন কথা। হাসপাতাল—রেল-লাইন এদিক ওদিক ও খুঁজেছে। কল্যাণী কাঁদছে—শুধু শুধুই বাছাকে যা তা বললি। কে জানে মনের দুঃখে আত্মঘাতী হ'ল কিনা?

গঙ্গার দিকেও খোঁজ নিতে গিয়েছিল। সেখানেও কোন খবর নেই। সমীর চুপ করে থাকে। ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। প্রতিমাকে অবশ্য কড়া কথাই বলেছে সে। কিন্তু যা বলেছে তা তারই ভালোর জন্যে।

আজকাল ওরা সকলেই যেন স্বাধীন হয়ে উঠেছে। মান অভিমান তো আছেই তার প্রতিবাদও করে সদাপে। নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হয় সমীরের।

রাত বেড়ে চলে।

সুষমা ফিরে গেছে, কল্যাণীও জানায়।

—চঞ্চল ফিরলে যদি কোন খবর থাকে জানাস বাছা। মেয়েটার জন্য ভাবনায় পড়েছি। সোমথ মেয়ে।

সমীর ভাবনায় পড়েছে আগামীকালের ব্যাপার নিয়ে। ছেলেদের তরফ থেকে দেখতে আসবে প্রতিমাকে, মেয়েই যদি না থাকে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। যেমন করে হোক খবরটা চাপা রেখে তাদেরকে অন্য কথা বলে বিদায় করতে হবে।

তবু মনের মাঝে একটা সন্দেহ জাগে সমীরের।

—চঞ্চলও ফেরে নি। কোথায় গেল কে জানে! আজ সেও দেখেছিল চঞ্চলের মুখে বিশ্রী সেই হাসিটা, রাতের অন্ধকারে কোন হায়নার হাসির মতো তাতে শ্বাপদ লালসা ফুটে উঠেছিল।

তারপরও বোধহয় চঞ্চল তার সামর্থ্য আর প্রতাপ দেখিয়ে গেছে তারই সামনে।

ঘুম আসে না। চারিদিকে নেমেছে সুপ্তির প্রশান্তি। এ বাড়ির ক'টি মানুষের চোখে ঘুম নেই।

তিনকড়ি একজনকে রাজী করিয়েছে ঘাট ডাকতে। বাজারেব নন্দ সাহুই এগিয়ে আসে। নৌকা ক'খানা হাতে থাকলে রাতবিরেতে কালনা—বর্দ্ধমানের দিক থেকে চাল আনতে পারবে নন্দ। আসলে সহরে তার চালের ব্যবসা। দিনগুলোয় কলোনীর

শ'কয়েক ছেলেমেয়ে নিদেন বেশ কিছু চাল আনে, সবই তার নন্দ সাহুর লোক। তাদের দিয়ে থুয়ে নন্দের অনেকটাই থাকে।

বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রেখে সেই চাল আবার দর তুলে বাজারে ছাড়ে। তিনকড়িবাবুকে তার হাতে রাখার প্রয়োজন তাছাড়া তার ব্যবসারও সুবিধে হবে। নন্দলাল সাহু তাই ঘাট'এর জন্য দর দিয়েছে। আর আড়ালে তিনুবাবুকেও নগদ প্রণামী দিয়েছে।

ওটা তার ভেট। তিনুবাবুও অভয় দেয়।

--ঠিক আছে।

এতদিন পর পথ পেয়েছে। তারপর তিনুবাবু দেখবে ওই কদমকে। দরকার হয় উৎখাতই করে দেবে।

এমনি দিনে ওরা খবরটা শুনে অবাক হয়।

সমীরের বোন নাকি উধাও হয়েছে বাড়ি থেকে। শ্রীদাম মদন তিনুবাবু ষ্টেশনের বাইরে মদনের দোকানে বসে কথাটা শুনেছে।

মদন বলে—সেই সঙ্গে তোর গুরু ওই চঞ্চলদাও উধাও হয়েছে।

কথাটা অনুমান করে তিনকড়ি। কালই দেখেছে দুপুরবেলায় গোবিনের দোকানের সামনে এই নিয়ে কি সব বচসা হয়ে গেছে। সমীর এসব কথা টের পেয়েই বোধ হয় কাল প্রকাশ্য রাস্তায় চঞ্চলকে অপমান করতে এসেছিল, শুধু অপমানই নয় —হয়তো তারা এসে না পড়লে চঞ্চলের গায়েও হাত তুলতো।

—ঠিক ধরেছি বাবা ইন্‌টু ইন্‌টু ব্যাপার চলেছে—নইলে ছুঁড়ি গেল পিছু পিছু—ওই গুরু!

দুপুরের পর বৈকাল নামছে। মিষ্টি রোদের হলুদ আভা পড়েছে ষ্টেশনের দেওদার—মেহগিনি গুলমোহর গাছের পাতায়, কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলো লালফুলের আস্তরণে ঢেকে গেছে। এমনি সময় কে খোঁজ করছে সমীরের, ক'টি ভদ্রলোক। একটি বয়স্ক লোকও রয়েছে পিছনে। হাতে রুপো বাঁধানো লাঠি। গলায় চাদরটা জড়ানো। ভদ্রলোক বাতাসেও যেন এখানে কিসের গন্ধ পান। তিনি কলকাতার লোক —কোনদিন যেন বাইরে বের হন নি।

—এ কোথায় এলাম রে পতু! ···এ্যাঁ—নোংরা—ধুলো। এখানে কোথায় মেয়ে দেখতে যাবো? সবইতো দেখেছি রেল ইষ্টিশান আর দোকান পত্তর! ওহে ছোকরা —সমীর দত্তের বাড়ি কোন্‌দিকে জানো?

তার বাবা—

পকেট থেকে কাগজটা বের করে বলে।

—সমীর দত্ত! ··পাটকলে চাকরী করে? তার বাড়ি—

শ্রীদামই বলে—এই তো, এই পথ দিয়ে চলে যান—শেষের ছোট্ট পুরানো বাড়ি— সামনে মাঠ আছে। সেইটাই।

ওরা খাবার আয়োজন করছে। বৃদ্ধই বলেন।

—ওর একটি বোন আছে না—কনিষ্ঠা বোন! তাকে বোধহয় চেনো—পাড়াতেই থাকো। তা মেয়েটি কেমন বাবা—ছোকরা বৃদ্ধকে নিয়ে এগোতে চায়। পথে ঘাটে এসব কথা পাড়তে চায় না সে। বৃদ্ধই ধমক দেয় যুবককে।

—তুই থাম পেতো। বিয়ে বলে কথা—কন্যার সম্বন্ধে—তার মা বাবার সম্বন্ধে প্রতিবেশীদের কাছে সংবাদ নিয়ে তারপর কথা! বলে না লাখ কথার পর তবে বিয়ে, একি হলেই হ'ল! ও ছোকরা—চেনো তালে?

আরও দু একজন লোক জুটে যায়। কে যেন ওদিক থেকে খবরটা ছুঁড়ে দেয়। কালকের সেই তাজা খবর। ওরা যেন এই সুযোগটা ছাড়তে রাজী নয়।

যুবকটি বলে—পথে দাঁড়িয়ে কি করছেন মামাবাবু, চলুন ওখানে গিয়ে যা হয় কথাবার্তা হবে।

সমীর চুপ করেই বসে আছে। কাল সন্ধ্যা থেকে বের হয়ে গেছে প্রতিমা এখনও ফেরেনি। বাবা চুপ করে গেছে, কল্যাণীর মুখে ভাষা নেই।

শুধু তিমির তবু এরই মধ্যে দোকান থেকে সন্দেশ মিষ্টি এনেছে। ইতিমধ্যে সমীর পাত্রপক্ষকে কোন খবর দিতে পারে নি।

তারা এসে পড়বে হয়তো, কি জবাব দেবে তাদের তাই ভাবছে। মনে হয় যা হয় বলবে, সত্যি কথাটাই জানাবে। তবু ভদ্রলোকেরা সেই বেহালা থেকে আসবেন আর অপমানিত হয়ে ঘুরে যাবেন সেই কথাটা ভেবেই সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

তবু এসে মুখোমুখি হতেই হবে তাকে।

এক একসময় মনে হয় বের হয়ে যাবে বাড়ি থেকে, বাবাই যেভাবে হোক তাদের জবাব দেবে। কিন্তু বুড়ো অসুস্থ মানুষকে এই যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে সব অপমান নিজের মাথায় তুলে নিতে চায় সে।

দরজার কড়াটা কে নাড়ছে।

সমীর কি ভেবে উঠে গেল।…দরজাটা খুলতেই সামনে দেখে সেই ছেলেটি আর ছটি ভদ্রলোক, পিছনে কিছু কৌতূহলী জনতা। বয়স্ক ভদ্রলোক বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে আর সেই ছেলেটিই তাকে থামাবার চেষ্টা করে।

-- মামাবাবু!

ভদ্রলোক রেগে উঠে বলেন।

—এইটে হরিপদবাবুর বাড়ি? তুমি বুঝি তার ছেলে? আমরা আসছি বড়শে বেউলো থেকে, তা তোমার ছোট বোনকেই দেখতে এসেছিলাম—

সমীর ওদের অভ্যর্থনা করে।

—দয়া করে ভেতরে আসুন।

—ভদ্রলোক খ্যাঁক করে ওঠেন।

—থাক, আর ভিতরে গিয়ে কাজ নেই। ভগবান বাঁচিয়েছেন, এমনি মেয়েকে

ঝি ওই পরের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিলে ? তা মেয়ে তো শুনেছি কোন লাবারের সঙ্গে পইলছে। তা বাবা—নিজের ঘর সামলাতে পারো না—অন্যের সর্বনাশ করার তলব কেন ? এ্যাঁ ? সমীরের গালে কে যেন উপর্যুপরি কয়েকটা চড় কষেছে। বর্ণ হয়ে উঠেছে সে। জীবনে এর চেয়ে সে বেশী অপমানিত বোধ করে নি।

আমতা আমতা করে।

—খবরটা সঠিক নয়। কাল থেকে মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—বুড়ো সদর্প দাপে জবাব দেয়।

—ওই একই কথা। খপর দাও—দেখবে উড়েছে। পাখী উড়েছে।

ভদ্রলোকের বেশ সতেজ গলা, তাকে দুর্পদা আরও উঁচুতে তুলে ভাগ্নেকে শাসান।

—আর বিয়ে করে কাজ নেই পতে, চল। তখনই বলেছিলাম অজ্ঞাত-কুলশীল লোকের মেয়েকে ঘরে আনিস না। দিন কাল খারাপ যে। ছিঃ ছিঃ। আমরা কিনা ও খুঁটির কুলীন, ঘোষ বোস মিত্তির ছাড়া করণ কারণ নেই, তুই এসেছিলি এই টে ? চল, ফেরার ট্রেন কখন দেখিগে। সমীর তবু বলে।

—একটু মিষ্টিমুখ না করে যাবেন ?

—থাক, যা মিষ্টি খাইয়েছো চেরকাল মনে থাকবে। চইল্লে আয় পতে। যত্তোসব নাংরা কাণ্ড কারখানা। বেউলে হলে বাস উইঠে দিতাম—হ্যাঁ। ভদ্রলোক গে অপমানে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেলেন। ভাগ্নের হাত ধরে টানতে টানতে লেছেন তিনি। সমীর বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। এমনি অপমানই তার প্রাপ্য ছল। সব তার হারিয়ে গেছে।

—সমীর।

মায়ের ডাকে সমীর চাইল। বৃদ্ধ হরিপদবাবু লাঠিতে ভর দিয়ে এসে াঁড়িয়েছিলেন, একটি কথাও বলতে পারেন না তিনি। চুপ করে ফিরে গেছেন নজের জীর্ণ তক্তপোষে।

মায়ের ডাকে সমীর চাইল। তার দু চোখ জলে ভরে উঠেছে। মাকে সান্ত্বনা দবার ভাষা নেই।

সমীর নিজের অসহায় পাণ্ডুর মুখ ঢেকে ঘরে ঢুকলো। এবাড়ির জীবনে প্রচণ্ড একটা অপমানের আঘাত নেমেছে। চারিদিকে অন্তহীন স্তব্ধতা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সমীর বের হয় নি বাড়ি থেকে। আজ কাজে যেতেও মন য় না। অতল অন্ধকারে সে যেন হারিয়ে গেছে।

কোথায় গেল তারা জানে না, প্রতিমা কি সত্যই নিজেকে শেষ করে দিয়েছে ? কিন্তু সমীরের মনে হয় তার মৃত্যুর জন্য সে দায়ী, হয়তো সবটাই ভুল সন্দেহের শেই তাকে চরম অপমান করেছিল।

হঠাৎ অন্ধকারে মায়ের কথা শুনে চমকে ওঠে সে।

—তুই! প্রতিমা! কোথায় ছিলি কাল রাত থেকে?

প্রতিমা ফিরেছে তাহলে! সমীরের মনে চাপাপড়া রাগটা ঠেলে ওঠে। তা(এমনি করে অপমান করতেই চেয়েছিল প্রতিমা। বাইরে প্রতিমা কি জবাব দি শোনা গেল না।

· বাবা মাও কি বলছে। সকলের কণ্ঠস্বরকে দাবিয়ে দিয়েছে প্রতিমা।

—যা ভালো বুঝেছি করেছি।…

মা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। বাবা কি বলছেন বোঝা যায় না। বাইরে দাওয়ায় কি একটা তিক্ত আলোচনাই চলেছে। মা কি বলে।…

প্রতিমার কণ্ঠস্বর বেশ সতেজ।

হঠাৎ তারই প্রায়ান্ধকার ঘরে ঢুকেছে প্রতিমা। বারান্দার একফালি আলো এ পড়েছে তার মুখে। সমীর চমকে ওঠে।

এ যেন অন্য কোন নারী। ওর পরণে দামী একটা গোলাপী রং-এর শা গায়ে সাটিনের ব্লাউজ। হাতে কি সব গহনাও পরেছে।…সমীর স্থির দৃষ্টি ওর দিকে চেয়ে আছে। দু চোখে ওর বিস্ময়। প্রতিমার সিঁথিতে সিন্দ রেখা।

কঠিন হয়ে উঠেছে সমীর। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে বিস্ময়ের। প্রতিম ওর দু চোখে সেই পুঞ্জীভূত বিস্ময় দেখে কঠিন স্বরে জানায়।

—তুমি ক্ষমা করবে না জানি, কিন্তু এ ছাড়া সামনে আর পথ পেলাম ন আমরা বিয়ে করেছি।

প্রতিমা প্রণাম করছে তাকে। মনে হয় ওটা প্রণাম নয় প্রণামের ভঙ্গীতে কঠি ভাবেই তাকে অপমান করছে প্রতিমা। সমীর অস্ফুট আর্তস্বরে বলে ওঠে।

—চঞ্চল! চঞ্চল শেষকালে এমনি কাজ করলো?

—তার কোন দোষ নেই। আমিও জেনেই সেই মত দিয়েছি। তুমি স্বীক না করলেও আমার কাছে এইটাই সত্য।

সমীর কঠিন স্বরে বলে।

—এরপরও এ বাড়িতে ঢুকতে পারলি? এই মুখ দেখাতে লজ্জা হ'ল না?

তার চোখের সামনে হাজারো মানুষের নীরব ব্যঙ্গের ছবি ফুটে ওঠে। আ দুপুরে সেই বয়স্ক ভদ্রলোক যা তা ভাবে অপমান করে গেছে তাকে। প্রতিমা ত কথা একবারও ভাবে নি। শুধু তাই-ই নয় তার দিদিকেও বঞ্চিত করেছে।

চঞ্চলের দু চোখে লালসার ছায়া সে দেখেছিল। ওরা সেই নরকের কীট যা বার বার সমীরের মনের সব সুন্দর অনুভূতিটাকে কেটে কুটে তছনছ করে দিয়েছে।

আজ আর কোন আপশোষ করতে চায় না সে। সব তার হারিয়ে গেছে।

প্রতিমা দাদার কথার কোন জবাব দিল না। সমীর বলে ওঠে।

—সব ব্যবস্থাই যখন করেছো। তখন এখানে আর তোমার না থাকাই ভালো। ঞ্চলকেও কথাটা জানিয়ে দিও।

সমীর এতক্ষণে দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছে। মনে হয় তার কাছে প্রতিমার আর কোন স্তিত্ব নেই। তার মৃতদেহটাকেই সে যেন দেখেছে। আগেকার প্রতিমা মারা ছে।

প্রজাপতির মতো সুন্দর রঙ্গীন সেই কুমারী মেয়েটিকে আজ কোন নিষ্ঠুর নব টুঁটি টিপে হত্যা করেছে। জ্বলন্ত প্রদীপের শিখায় সে উড়ে গিয়ে লাফ দিয়ে ড়ছে। পুড়ে পুড়ে ও ছাই হয়ে যাবে। শেষ হয়ে যাবে।

প্রতিমা সেই আগামী সর্বনাশের খবর জানে না। আজ সে মনের খুশীতে রপুর হয়ে ওঠে।

সমীর আর ও নিয়ে ভাববে না। তার ভাগ্যে চরম পরিহাস আর অপমান টেছে। পেয়েছে সে নিষ্ঠুরতম আঘাত, সে আঘাতের মূল ওই চঞ্চলই। তার জের হাতে তুলে আনা বিষবৃক্ষে আজ বিষ ফলই ফলছে।

বের হতে যাবে সমীর, বাড়ির সমস্ত আবহাওয়া যেন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। াৎ সামনেই হন্তদন্ত হয়ে সুষমাকে ঢুকতে দেখেই থমকে দাঁড়াল সমীর।

সুষমা সবই শুনেছে। চঞ্চল বাড়ি ফিরেছে।

আজ তার নোতুন মূর্তি দেখে চমকে উঠেছিল সুষমা। কথাটা কানে গেছে র।

দুজনে বাড়ি ঢুকছে। প্রতিমা আর চঞ্চল।

প্রতিমার বিয়ের কনের বেশ। পথের কিছু কৌতূহলী জনতাও ভিড় করেছে। পিছন থেকে বলে ওঠে।

—ফিরে এসেছে। জোড়ে ফিরেছে।

কোন্ ফচ্‌কে ছেলে আবার উলুধ্বনি দিয়ে ওঠে। সুষমা পাথরের মূর্তির া চেয়ে দেখছে। তারই ঘরে আজ চঞ্চল নীরবে তার উৎখাতের পরোয়ানা ছে। তার নারীমন রাগে অপমানে জ্বলে ওঠে। প্রতিমার মনের লোভটা এমনি তায় পরিণত হবে তা ভাবে নি। চঞ্চলের উপরই ঘৃণা হয় তার।

বলে ওঠে সুষমা।

—এ বাড়িতে না এলেই পারতে ?

প্রতিমা থমকে দাঁড়াল। দিদির দিকে চাইল সে।

চঞ্চল ধমক দেয় সুষমাকে।

—পথ ছাড়ো ? এসো প্রতিমা।

প্রতিমা দাঁড়ায় নি, ও বাড়িতেও ঢোকে নি। এত লোকের সামনে দিয়ে এ ড়িতেই আবার ফিরে এসেছে।

চঞ্চল সুষমার গায়েই যেন হাত তুলবে। গর্জন করে চঞ্চল।

—তোমাকেই বের করে দিতে পারি জানো ? ও এখানেই থাকবে। সুষমা ক
কয় না। বেবী বড় হয়েছে। সেও দেখেছে বিচিত্র ব্যাপারটা। ভয় পায় সে।

চঞ্চল কোন দিকে চাইল না। উপরে উঠে গিয়ে নিজের ঘরে বসল গুম হ
বই এর র‍্যাক আলমারির পিছনেই তার সংগৃহীত মদের বোতল দু চারটে থা
তারই একটা বোতল বের করে গিলতে থাকে।

মনের মধ্যে দুঃসহ সেই রাগের জ্বালাটা কমছে, ওই মদের ঝাঁঝের সঙ্গে
মিলিয়ে যায়। চোখের সামনে প্রতিমার সুন্দর সুগঠিত দেহটা ফুটে ওঠে। নিটো
মাখনের মতো দুটো হাত—হাসলে গালে টোল পড়ে প্রতিমার।

তবে জীবনের সেই চিরন্তন কামনা আর তৃষ্ণাটা বাড়ছে।···

সুষমা আজ সেই জগৎ থেকে হারিয়ে গেছে। তার কোন দাম নেই চঞ্চলের কা

···হঠাৎ মনে হয় সে বেঁচে আছে—কি এক মিষ্টি স্বপ্ন নিয়ে। এমনি করে
পেতে চায় সে। অনেক কিছু।···কাল রাতের সেই হোটেলের ঘরের কথা মনে প
আজ প্রতিমাকে আরও কাছে পেতে চায় সে।

সুষমা জানতো না এমনি করে তার সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে। আজ তার
হারিয়ে গেছে। নিজের সেই বেদনাময় শূন্য জীবনের কথাই মনে হয়।

অতীতে একদিন গোপালকে ছেড়ে এসেছিল—সেও ছিল মদ্যপ। কিন্তু এ
করে সে অন্তঃপুরের অধিকারকে বিষিয়ে তোলে নি। এক জায়গায় তার স
মনুষ্যত্ব কিছুটা তবু ছিল। সে নিজে এসেছিল তাকে নিয়ে যেতে।

কিন্তু সেদিন চঞ্চলকেই কেন্দ্র করে তার মন সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছি
ভেবেছিল ওই তার কাছে আদর্শ মানুষ।

দুজনে ঘর বেঁধে ছিল। সুষমা সেদিন চেনে নি তাকে, ক্রমশঃ চিনেছে চঞ্চল
মানুষ এমনি করে বদলে যায় জানতো না সে।

·· ক্রমশঃ তার জীবনে এসেছিল প্রতিমা।

প্রতিমার লোভী মন চেয়ে ছিল অনেক কিছুই। মনে মনে তার রূপকে
করে ছিল অপরিসীম গর্ব। সুষমাকেও হিংসা করতো মনে মনে।

তাকে চরম আঘাত দেবার জন্যই ওই চঞ্চলের জালে পা দিয়েছিল সে। প্রতি
এই ব্যাপারে মনে হয় সুষমার—তার মায়ের দিক থেকে কোন সমর্থন ছিল। ন
সেই তো বাধা দিতে পারতো—তা দেয় নি।

তিমিরের চাকরী করে দিয়েছে, দায়ে অদায়ে অর্থ সাহায্য করেছে, এমনি
মায়ের মুখ ও বন্ধ করে, সে চতুর সাবধানী পা ফেলে ওই প্রতিমাকেও প্রল
করেছে।

প্রতিমা এতকাল কাদার মতো মেয়ে—শুধু চমক দেখেই ভুলে গেছে।

আজ সুষমার মনে পুঞ্জীভূত অভিযোগ। ব্যর্থতার হাহাকারে সে কান্নায়
পড়ে। তাই ছুটে এসেছে এ বাড়িতে।

দাদাকে সামনে দেখে আর্তনাদ করে ওঠে সুষমা।

—দাদা! এসব কি হয়ে গেল? তুমিও চুপ করে সইবে সব কিছু? এতবড় ন্যায়—

সুষমা আজ অসহায় কণ্ঠে ওর কাছে অভিযোগ করে। কিন্তু কি জবাব দেবে জানে না সমীর, চুপ করে সুষমার দিকে চেয়ে থাকে।

অসহ্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সুষমা।

—আমার সব হারিয়ে গেল দাদা! আমার মান—আমার ভালোবাসা সবকিছু?

এগানি অন্ধকারে মানুষের সবই হারিয়ে গেছে বারবার। সমীরের মনেও সেই ত্যার বেদনা। ও কাঁদতে পারে না। দুঃসহ অপমানে চঞ্চল তাকে জর্জরিত তুলেছে। আজ সুষমা শুধু কাঁদে।

ওরা কাঁদবে। অন্য দল হাসবে, বিজয়ীয় হাসি। গর্বের হাসি। তারা ওদের কছু লুণ্ঠনই করবে। চঞ্চল তাই করেছে।

প্রায়ান্ধকার ঘরের একপাশে একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। ম্লান আলোর য় দেখা যায় ঘরখানার চারপাশে ঠাসা রয়েছে নোতুন পুরোনো বই—খাতাপত্র। মাঝখানে একটা ছোট তক্তপোষে শুধুমাত্র সতরঞ্চি পাতা—ওদিকে পড়ে আছে চিটে একটা বালিশ।

দড়ির আলনায় ঝুলছে ময়লা ধুতি-ফতুয়া-একটা গলাবন্ধ কোট। ঘরের কোণে া কুঁজো—দুটো এনামেলের থালা কাৎ করা। এইটেই সদানন্দবাবুর দীর্ঘ শ বছরের বাসস্থান।

সারাজীবনে তার জমার খাতা শূন্যই রয়ে গেছে, যৌবনে রাজনীতি করেছেন, শের বিরুদ্ধে সেদিন বিদ্রোহীদের দলের তিনি ছিলেন অন্যতম। সশস্ত্র ালনে ছিলেন বিশ্বাসী; জেল—কারাবরণ এসব তার যৌবনের প্রদীপ্ত জ্বালাকে করতে পারে নি। যেদিন বক্সা—হিজলী—মায় দেউলি জেল ঘুরে বাইরের া দেখলেন—সেদিন ব্রিটিশের শক্তি খর্ব হয়ে আসছে। দিগন্তে দেখা দিয়েছে র আশা।

তাই সেদিন বিপ্লবের পথ ছেড়ে এলেন শিক্ষকতার পথে। নোতুক দেশ তার গড়তে হবে নোতুন জাতি, তাদের ভবিষ্যৎ সমাজের গঠনের দায়িত্ব তুলে নিয়ে নেই স্কুলের কাজে হাত দিলেন। টিমটিম করে চলতো এখানের ইস্কুল, ভাঙ্গা া বাড়ি মাঠের ধারে অবহেলায় মুখ বুজে পড়ে আছে। খড়ো চাল—ওদিকে মিলের বিদেশীদের প্রতাপ। তাদের কারখানা—আর দাপট এ শহরের জীবনকে য়ে দিয়েছে।

দানন্দবাবু ওই বিদেশীদের প্রতাপের মধ্যেই তার সংগঠনের কার্যশিক্ষার তীর্থ তুলতে চাইলেন। ক্রমশঃ কিছু ভালো লোকও এগিয়ে এল। স্থানীয় মানুষও ক্ত সদানন্দময় সর্বত্যাগী পুরুষটিকে মেনে নিল।

মানুষের উপর বিশ্বাস হারান নি সদানন্দবাবু, তাদের কাছ থেকে নিজের ব
কিছু চান নি। চেয়েছিলেন এদের সামগ্রিক কল্যাণ। তাই আজ সেই স্কুল বি
একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে সত্যি, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে সদানন্দব
আজ কোথায় নিষ্ঠুর ভাবে প্রতারিত হয়েছেন।

যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা শূন্যে মিলিয়ে গেছে।

স্বাধীনতা এল দেশ বিভাগের অভিশাপ নিয়ে, লক্ষ লক্ষ মানুষ বিতাড়িত
তাদের গৃহ থেকে। ছিন্নমূল মানুষের দল তাদের সবকিছু হারাল; যুদ্ধ—দে
বিভাগ—মন্বন্তর—দাঙ্গা সবকিছু অভিশাপের মধ্যে দিয়ে সেই লক্ষ লক্ষ মা
আজ সব হারিয়ে পশুতে পরিণত হয়েছে। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য বি
করেছে তার মনুষ্যত্ব-বিবেক আর শুভবুদ্ধি।

আজ সে চোরা কারবারী—লোভ তাকে কালোবাজারে নিয়ে গেছে, হিংসা তা
রক্তলোলুপ করে তুলেছে। প্রতিষ্ঠা তাকে দুর্বার করে তুলেছে। নারী অ
পণ্যের পশরা।

···কোথাও কোন আশার আলো নেই। তাঁর চোখের সামনে দেখেছেন ত
হাতে গড়া সেই শান্ত শিষ্ট ছেলের দল আজ মদ্যপ—লম্পট লোভী অর্থপিশ
দানবে পরিণত হয়েছে। তিনকড়ি মদন শ্রীদামের কথা মনে পড়ে। তারই চো
সামনে দ্বিধাহীন চিত্তে তারা মদ খাচ্ছে—কুৎসিত আলোচনা করছে। রা
অন্ধকারে তারা নারীমাংসের সন্ধানে ঘোরে ঘৃণ্য পশুর মতো, দিনের আলে
তারাই বিশিষ্ট সমাজসেবীর ভূমিকা নিয়েছে এই শহরে।

স্কুল-শিক্ষায়াতনেরও কর্মকর্তা হয়ে উঠেছে টাকার জোরে—আর চর অনুচর
দাপটে।

সদানন্দবাবু দেখেছেন সত্যকে ওরা প্রথমেই টুঁটি টিপে হত্যা করেছে। টা
আর মদের নেশায় সত্যের পূজারী—সুন্দরের সেবক ওই শিল্পী স্রষ্টাদের কি
নিয়েছে। চঞ্চলও তাদের সঙ্গে বসে মাতাল হয়ে ওঠে।

তাই চঞ্চলের সৃষ্টির মধ্যেও এযুগের কুশ্রী কদর্য কামনা আর অমানুষিকত
তাকে প্রগতির যুক্তি দিয়ে—কাম্যু সার্তের এক্‌জিস্‌ট্যান-সিয়ালিজম্‌ এর-দোহ
পেড়ে ওরা সমর্থন করে। বলে নোংরা দেখেই তবু বাঁচবো—নোংরার মধ্যে আন
খুঁজে নোব।

শিউরে উঠেছেন সদানন্দবাবু এই মতবাদে। মানুষ সে চিরকালই সত্য সুন্দ
পূজারী, যতই অন্ধকার আসুক সে তার থেকে মুক্তির পথ খোঁজে—সেই অন্ধকা
পাঁকে হারিয়ে যায় না হারাতে পারে না। মানুষের সেই শুভবুদ্ধি আর ক
চেতনার মূর্তপ্রতিক তার শিল্প—তার সাহিত্য—তার সংস্কৃতি। সেই জাত
এরা বিষিয়ে তুলেছে। তারাও কাচ পেয়ে মহানন্দে মূর্খের মতো কাঞ্চনকে ভুলে
এতবড় দুঃসহ গ্লানি আজ সামনে।

…সদানন্দবাবুর মনে হয় সব শিক্ষা সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে।
এ তাঁদেরই সামগ্রিক পরাজয়, অন্তরের কোন আত্মবিশ্বাস—ধর্মের কোন নৈতিক ক্তিই তাদের এই অবক্ষয়কে রোধ করতে পারে নি।

সমীরকে ঢুকতে দেখে মুখ খুললেন তিনি।

—এসো!

নির্জন স্কুলবাড়ি, নীচে দারোয়ান কয়েকজন থাকে, স্কুলেরই একান্তে একটা র ওরা দয়া করে সদানন্দবাবুকে থাকতে দিয়েছে। আজ সদানন্দবাবুর শেষ শ্রয় বলতেও নিজস্ব কিছুই নেই।

গাছগাছালির মাথায় বাতাস দীর্ঘশ্বাস তোলে কি বেদনায়। সমীরকে দেখছেন নি। ওই একটি মানুষ—যে সংসারের জন্য নিজের সর্বকিছু ত্যাগ করেছে; ন্তর আছে তাই বেদনাই পায়—সেই নিদারুণ অবক্ষয়ের যন্ত্রণায় ও ক্লিষ্ট।

সমীর বলে।

—প্রতিমা ফিরে এসেছে মাষ্টার মশাই।

খুশী হন সদানন্দবাবু—আসবেই সমীর। তাকে ভুল বুঝো না—সমীর বলে।

—কিন্তু তার সব হারিয়ে গেল মাষ্টার মশাই, ওই চঞ্চলের জালেই সে জড়িয়েছে জেকে। নিজের, সুষমার—ওই কচি মেয়েটার কথাও ভাবে নি। ওরা কি শুধু ই লালসার নামে ঠকেই যাবে বারবার?

সদানন্দবাবু ব্যাপারটা অনুমান করতে পারেন। ও কথা ভেবে শিউরে উঠেছেন তনি।

—চঞ্চল এমনি করবে? এযুগে হয়তো সবই সম্ভব সমীর। ওরা সব বিবেক ীতিবোধ শালীনতাকে আজ মানুষের দুর্বলতা বলে মনে করে।

বৃদ্ধের মুখে চোখে অসহায় বেদনা। কি ভাবছেন তিনি।

জানলার ফাঁক দিয়ে ওই ফুলভরা কৃষ্ণচূড়া গাছটাকে দেখা যায়—তারও উর্ধ্বে কমক করে অন্ধকার আকাশে কয়েকটা তারার ম্লান দীপ্তি। সদানন্দবাবু বলেন ঢ়কণ্ঠে।

—তুমি দেখো সমীর, মানুষকে একদিন অনেক মূল্য দিয়ে জীবনের এই পরম ত্যকে ফিরে পেতেই হবে। যে মানুষ নিজে ধ্বংসের আয়োজন করে চলেছে তার ন্তর সর্বস্ব হারিয়ে—সে একদিন চমকে উঠবে। আবার নোতুন করে বাঁচতে চাইবে কুল আর্তি নিয়ে।

সমীর বলে—কিন্তু সেদিন তার বাঁচার দিন হয়তো ফুরিয়ে যাবে।

—তবু মানুষ বাঁচবে তার সব গৌরব নিয়ে, তাই আমরাও সেই দিনের সাধনায় বিষ্যতের দিকে চেয়ে আছি।

বৃদ্ধের শীর্ণ চোখ দুটোয় কি বেদনা—কি পরম ভালবাসার আশ্বাস। কিন্তু কি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে?

জানে না সমীর। তবে মনে হয় তার করার কিছু নেই, নীরব দর্শকের মতই সব সয়ে এই করুণ জীবনটাকে দেখে যেতে হবে সেই যবনিকাপাতের আগে পর্যন্ত।

একটা শান্তির আশ্বাস জাগে মনে।

রাতের বাতাস নীরব হাহাকারে চারিদিক ভরিয়ে তুলেছে, অন্ধকারে তারাগুলো জ্বলছে।

কদমও শুনেছে কথাটা।

নন্দসাহু ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে ডাক হবার আগেই দু-এক দিন ঘাটে এসে দে শুনে গেছে। খবর নিয়েছে ক'খানা নৌকা আছে, বাড়তি নৌকার মাঝিদের সঙ্গে কথা বলে গেছে।

কদম সেদিনই নোটিশটা পেয়েছে। ইতিমধ্যে তিনুবাবু দু একবার এসেছিল বটতলার ওপাশে কদমের নিজস্ব সেই ঘরখানা। সামনে একটু বাগানের মতো নদীর উর্বর পলিতে দু'চারটে কুমড়ো বেগুনের চারাও গজিয়েছে, ফল ফলেছে ল গাছে। গাঁদাফুলের গাছে এসেছে অজস্র ফুলের সমারোহ। তিনুবাবু বলেন।

—বেশ বাগানটা করেছিস কদম। তা কথাটা তোকে বললাম তবু থাকি ঘাটেই।

কদম ওর লোভী কুতকুতে চোখের দিকে চেয়ে থাকে। সর্বদা জ্বলে ওঠে ঘৃ আর রাগে। কদম জবাব দিল না। সরে গেল। ও মনে মনে তার পথ ঠিক ব নিয়েছে।

যা হয় একটা ব্যবস্থা সে করে নেবে। তবু ওই পশুদের ফাঁদে পা দেবে না।

তাই পথ ঘাটের ইজারা খারিজ হবার নোটিশটা আসতে হাত পেতে নি টিপছাপ দিয়ে দিল সহজভাবেই। বেশ জেনেছে কদম ওই টিপ ছাপের বদলেই পারাঘাটের সব স্বত্ব বিনা আপত্তিতে ছেড়ে দিল।

রাতের অন্ধকার তখনও কাটে নি।

নন্দসাহু আজ ভোরেই ঘাটে এসেছে নিজে। ওপাশে বেদীতে ফুলমালা দি পুজোর আয়োজন করা হয়েছে, নৌকার গলুই-এ তেল সিন্দুর মাখিয়ে তারা অ থেকে ঘাট পত্তন করছে।

সকলের আগেই সদানন্দবাবু স্নান করতে আসেন। পূর্বদিকে আলোর আ জেগেছে, বটগাছের মাথায় কলরব করছে পাখীর দল। সদানন্দবাবু এসে এ উৎসবের আয়োজন দেখে থমকে দাঁড়ালেন। রাতারাতি এখানকার শান্ত পরিবে বদলে গেছে। নন্দসাহু ভারি গলায় হাঁকডাক জুড়েছে।

—এ ভাই থোড়া জলদি তো করো। পুজাপাঠ সেরে নিয়ে আবার বাড়ি খানাপিনার ব্যবস্থা করতে হবে। বাবুরা সব আসবেন।

সদানন্দবাবু কদমকে তার ঝুপড়ির দাওয়ায় বসে থাকতে দেখে ওর দি চাইলেন। ঘাটের এই জায়গাটা এখন নন্দ সাহুর এলাকা। সে রাতারাতি এ

ফুলগাছ সবুজ লতাগুলো কেটে সরিয়ে একটা চালা বানাচ্ছে, ঘাটের মালপত্র রাখবে।

সদানন্দবাবু স্নান করে উঠে পুজোর জন্য এখানে আর ফুল পাবেন না। কদম হাসছে, মলিন একটু হাসি। জানায়।

—ঘাট থেকে আমায় তাড়িয়ে দিলে মাষ্টার মশাই!

সদানন্দবাবু তিনকড়িকে নিজে একথা বলেছিলেন, তিনি ভাবেন নি যে এত শীঘ্রই তিনুর উৎসাহে এই কাজ ঘটে যাবে। কদমই শোনায়।—নন্দবাবু তিনকড়িবাবুকে একহাজার টাকা নগদ দিয়েছে, আমি গরীব মানুষ কোথায় এতটাকা পাবো।

সদানন্দবাবু চুপ করে ওর কথাটা শুনেছেন। তার সুন্দর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। কদম বলে।

কোথায় দেশগ্রামের দিকেই চলে যাবো। এখানে থেকে আর কি হবে?

তিনকড়িও এসেছিল সকালেই—নন্দসাহুর প্রথম বউনির খেয়া ছাড়ছে ঘটা করে, ঢোল বাজছে পুজো হচ্ছে সমারোহে। নন্দবাবু ভরাটি গলায় জয়ধ্বনি দেয়।

—জয় সীয়াবর রামচন্দ্র কি জয়! জয়—

কলরব কোলাহল ওঠে। নন্দসাহুর গলার সুরে গলা মিশিয়েছে অনেকেই।

তিনকড়ি বাবুও রয়েছে, হঠাৎ সদানন্দবাবুকে সামনে দেখে একটু চমকে ওঠে সে। মনের পাপটা তার মুখে চোখে ফুটে ওঠে। পরক্ষণেই তিনকড়ি সেটাকে সামলে নিয়ে সহজ কণ্ঠে বলে—ভালো আছেন স্যার?

সদানন্দবাবু ওর দিকে চাইলেন স্থির সন্ধানী দৃষ্টিতে; ওকে ক্লাস ফাইভ থেকে দেখেছেন—প্রতিদিনই তার পিরিয়ডে তিনি ওর কান ধরে টেনে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দিতেন। আজও মনে হয় ও তেমনি বাঁদরই রয়ে গেছে—শুধু তাই নয়। একটা শয়তানও।

সদানন্দবাবু বলেন।

—খুব ভালো আছি। এত সুখে আছি যে বাঁচতে ইচ্ছা হয় না।

তিনকড়ি ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

কেন, কেন। ওকথা কেন বলছেন স্যার?

—তোমাদের মতো ছাত্র যে এত তৈরী করেছি তাদেরই দাপানির চোটে আকাশ বাতাস বিষে ভরে উঠেছে! তাই বলছিলাম তিনু, বাঁচতে আর সাধ নেই। দিন ফুরোলেই বাঁচি। এ কাজটা না করলেও পারতে সামান্য টাকার জন্য।

সদানন্দবাবু দাঁড়ালেন না, তিনকড়ির গালে কে যেন একটা চড় মেরেছে। গুম হয়ে থাকে সে—হঠাৎ মুখ তুলে দেখে ওপাশে তারই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কদম। ও শুনেছে সদানন্দবাবুর কথাগুলো। বৃদ্ধ মানুষটি আজ রেগে উঠেছেন!

তিনু মুখ তুলতেই চোখাচোখি হয়ে যায় কদমের সঙ্গে। কদমের চোখে ঘৃণাভরা চাহনি। ওর সুন্দর দেহে সকালের মিষ্টি আমেজ। মেয়েটার তবু জেদ

আছে। তিনকড়ি এত চেষ্টা করেছে—ওর সারা দেহে মাতন তুলেছে মেয়েটা, বারবার এসেছে সে।

তবু তিনকড়িকে সে দূর করে দিয়েছে। আজও সব হারিয়েছে তবু তিনকড়িকে সে আমলই দেয় নি। তিনকড়ির রক্তে জ্বালা জাগে। মেয়েটাই সবকথা জানিয়েছে সদানন্দবাবুকে। বুড়ো রেগে গিয়ে সাত সকালেই তাকে যা তা বলে গেছে। তিনকড়ি অবশ্য আর ওই নির্বিষ ঢোঁড়াসাপকে কোন পরোয়াই করে না, শুধু তাই নয়। আজকাল তিনু স্কুলকমিটির মেম্বর—তার দলের আরও ক'জন সেখানের কর্মকর্তা। তারাই দলে ভারি। ইচ্ছে করলে তিনু কদমকে যেমন এই ঘাট থেকে উৎখাত করেছে তেমনি করেই ওই বুড়োকেও স্কুল থেকে সরিয়ে দেবে। তার প্রতিষ্ঠিত স্কুল !

ধ্যাত্তোর ! ওসব যেদিন করেছে সে—করেছে ; এখন আইনসঙ্গত ভাবে তিনকড়িরাই সংখ্যাধিক্যে ওই স্কুলের কর্তা। দরকার হলে বুড়োকেই সরিয়ে দেবে। স্কুলের বাড়িতেও থাকতে দেবে না।

কদম ওকে দেখছে। তিনুর মুখে শয়তানির রেখাগুলো উদগ্র আর কঠিন হয়ে ওঠে। তিনু এগিয়ে এসে একটু কড়াস্বরেই শুধোয়।

—বুড়োকে এসব কথা বলেছিস ?

কদম জবাব দেয়।

—সারা শহরের লোক জানে, নন্দসাহু আপনকে টাকা দেয় নি ?

—সাক্ষী আছে ? খেঁকিয়ে ওঠে তিনু।

কদম হাসছে, ওর তীক্ষ্ণ ধারালো হাসিটা তিনুর রাগত দেহে তীব্র সাড়া আনে। জ্বলছে সে। শোনায় কদম।

—চোর চুরি করতে যায় পাঁচজন ভদ্দর লোককে সাক্ষী রেখে। তুমি যে রাতের আঁধারে এখানে ঘুর ঘুর করতে তারও কি সাক্ষী আছে ? এঁ্যা ?

তিনু কঠিন হয়ে ওঠে। তার সম্মান আজ অনেক বেশী। অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের অনেক শ্রমিক সভার সে মাতব্বর, এইটাই তার বর্তমান পেশা। তাই রাগটাকে চেপে থাকতে শিখেছে। তবে মনের মধ্যে পুষে রাখে সে রাগটাকে। ভোলে নি—সুযোগ পেলেই তীব্র ছোবল মারে। এই নীতিতে তার বহু প্রতিপক্ষকে সে ঘায়েল করেছে, একটা মেয়েতো ছার।

সরে গেল তিনকড়ি।

নন্দসাহুর চোখ চারিদিকে। সে দেখেছে কদমের সঙ্গে তিনুবাবুর ওই কথাবার্তা। মেয়েটা মহাধড়িবাজ, অবশ্য নন্দসাহুর ওদিকে নেশা নেই। দরকার হলে ওসব জিনিষ অনেক কত্তাব্যক্তিকে ভেট পাঠিয়েছে রাতের অন্ধকারে। তাই বলে—

—আরে ছোড়িয়ে দেন তিনকড়িবাবু, ওসব ঝুট। সকাল বেলায় মেজাজ খারাপ করিয়েছেন খামোকাই ; আরে বাবা এ কদোম তু ঘরমে যা।

হাসছে নন্দসাহু খিক্ খিক্ করে। সকালের আলো ফুটে উঠেছে। রাতের অন্ধকারের পর নোতুন পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকে কদম।

সব হারিয়ে গেল তার। ওই সুন্দর পৃথিবী—সবুজ গাছগুলো রোদ লাগা সবুজ মাঠ গঙ্গার রুপালী জলধারা সবকিছু থেকে নির্বাসিত হবে সে। সেই সুন্দর পৃথিবীটায় আজ বড় হয়ে টিকে থাকবে ওই নন্দসাহুর মতো ধূর্ত কালোবাজারী মানুষ তিনকড়ির মতো লম্পট অর্থ-লোভী দালাল আর তাদের অপদার্থ অমানুষের দল। ওদের লোভী হাত সবকিছু ছিনিয়ে নেবে।

তিমিরও সরে যাবে এ আর নোতুন কথা কি! এখান থেকে যাতায়াত করতে অসুবিধা হয় সেই অজুহাতে তিমির জানিয়েছে সে মেসেই থাকবে কলকাতায়। এবাড়ির নগ্ন অভাবের ছায়াটাকে সে ভয় পায় তাই সরে যাবে। টাকা পয়সা তাই বিশেষ দিতে পরবে না সে। একজন মনে মনে খুশী হয়েছে। এবাড়ির মানুষগুলোকে বিশেষ করে দাদাকে সে দেখতে পারে না। সইতে ও পারে না। তাকে আঘাত দিয়েছে তিমির—প্রতিমা তাতে খুশীই হয়।

কল্যাণী ভাবনায় পড়েছে। তিমিরের বেশী টাকা দেবার কথা ছিল, মুদির দেনা মিটিয়ে দিয়ে রেশন আসতো তাতে, কিন্তু তা হয় নি। রেশন আনবার টাকা নেই। কল্যাণী জানায়।

—তাহলে কি হবে সমী! রেশন ধরতে হবে যে।

প্রতিমা দাঁড়িয়েছিল। বিজয়িনীর ভঙ্গীতে সে বলে।

—টাকা আমি দিচ্ছি।

সমীর অবাক হয়। ওকে এখানে দেখতে চায় নি। ওই সিঁথিতে সিঁদুর দেবার পর থেকেই জ্বলে উঠেছে সে। আজ টাকা দিয়ে সে তাদের মুখের গ্রাস যুগিয়ে আরও অপমান করতে চায়। সমীর কঠিন কণ্ঠে মাকে বলে।

—ও টাকায় রেশন আসবে না। দেখি যদি টাকা পাই রেশন আনবো না পেলে আসবে না। উপোস দেবো। আর ওকে বলে দিও গরীবের ঘরে থেকে বড়লোকী চাল যেন না দেখায়। উপোস দিয়ে থাকতে পারলে এখানে থাকবে—না পারে চলে যাক এখান থেকে। গিয়েছিল—আবার ফিরে এলই বা কেন গরীবদের ঘরে?

কথাগুলো প্রতিমার মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বের হয়ে গেল সমীর। একটা টুইশানি করে—যদি সেখানে কিছু টাকা আগাম পায়—তাই-ই দেখবে।

প্রতিমা মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মনে হয় এবাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকবে না। এই অপমানবোধটা আগে ছিল না এখন তার বেশ টনটনে হয়ে উঠেছে। মনে মনে একটা তেজও রয়েছে তার।

…তাই বোধহয় এবাড়িতেই প্রতিমা আসে সেইদিনই কথাটা জানাতে। সুষমা বোনকে দেখল মাত্র। কিছুদিন ধরে সুষমাও ঠিক করে নিয়েছে চঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কটা

তার মুছে গেছে। কঠিন আত্মসচেতন একটি নারী। চঞ্চলের কাছ থেকে এই অবহেলা আর আঘাতটাকে সে নীরবে সয় নি।

নিজের পথ নিজেই করেছে। গানও মন্দ গায় না—সহরের অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের মেয়েরাই তার গানের ছাত্রী। ক্লাশও করে গানের। মিশে মিশে যা রোজকার করে তাতে মা মেয়ের ভালোই চলে যায়।

তাই চঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্ক তার বিশেষ নেই। এক বাড়িতে থাকে সেই মাত্র। মেয়ে বেবীও বড় হচ্ছে, স্কুলে যায়।

সেও বাবাকে মনে মনে কোথায় ক্ষমা করতে পারে নি। ব্যাপারটা সে ও যেন বুঝেছে।

তাই চঞ্চল এ বাড়িতে একটা বাইরের লোক।

ওপরে নিজের ঘরে থাকে সারাদিন। কাজকর্ম করে আর সন্ধ্যার সময়ই বের হয়ে যায় সেজেগুজে। ওটার বাহার আজকাল বেড়েছে। ফেরে সেই গভীর রাত্রে তখন অর্দ্ধঅচৈতন্য অবস্থা। টলছে মদের নেশায়।

লোকটাকে আজ সারা মন দিয়ে ঘৃণা করে সুষমা। সেদিন বলেছিল। --নেশা করে এতরাতে বাড়ি ফিরো না, যেখানে বসে মদ গেলো সেইখানেই পড়ে থেকো, না হয় বাজারে মেয়েছেলেদের ঘরেও যাও শুনেছি—সেইখানেই রাত শেষ করে মানুষের মতো জ্ঞান ফিরলে বাড়ি এসো।

—কেন? চঞ্চল অবাক হয়।

—সুষমা জবাব দিয়ে দেয়।

মেয়ে বড় হচ্ছে। বাবার সম্বন্ধে এমনি ধারণা হলে জীবনে সুখী হতে পারবে না। মা বাবা তাদের শিশু মনের সামনে প্রধান এবং প্রথম জন। সবচেয়ে বড় নির্ভর আর বিশ্বাস। সেটা ভেঙ্গে গেলে সারা জীবনে কোন অবলম্বন খুঁজে পাবে না।

হাসছে চঞ্চল। নেশায় জড়ানো তার কণ্ঠস্বর। হঠাৎ মনে হয় সুষমা তার অজ্ঞাতসারেই অতি বড় একটা সত্য কথা বলে ফেলেছে। এ তারই জীবনের এই চরম বিপর্যয়ের মূলতত্ত্ব কথা।

· বাবার সেই মদ্যপ চেহারাটা ভেসে ওঠে—তার মাও তাকে ফেলে গেছে শৈশবে। বাবা—মা!

জীবনের প্রথম দিন থেকেই সে সর্বদিক থেকে বঞ্চিত - ব্যর্থ। তাই যেন জ্বলছে অহরহ! তার মেয়ে বেবী! ···সব কেমন ঘুলিয়ে যায় তার।

মাথার মধ্যে দুর্বার একটা সাড়া জাগে। সারা দেহ কাঁপছে দুঃসহ রাগে। গলার কাছে কি তৃষ্ণা। চমকে ওঠে চঞ্চল। সারা দেহে তার সেই চাঞ্চল্য। চীৎকার করে ওঠে।

—খবরদার। একটি কথাও বলবে না?

সুষমা ওর রুদ্র মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে ঘৃণাভরে।

মারবে নাকি ! মদ খেয়ে অনেক কিছুই করেছো, ওটাই বা বাদ থাকে কেন ?

চঞ্চল শাসায়—এ বাড়ি থেকে দূর করে দোব !

সুষমা হাসে—সেটাই করো !

চঞ্চল যেন ওর কাছে হার মেনেছে। ধীরে ধীরে উপরে উঠে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলো। বই-এর আলমারীর ফাঁকে দু-চরেটে বোতল থাকে। তারই একটা খুলে নিয়ে বসল। আকণ্ঠ পান করে ওই দুর্বার জ্বালা আর গ্লানিটাকে ভুলতে চায় সে। সুষমা তাকে চরম অপমান করেছে।

···ভালোলাগে !

মনে হয় চঞ্চলের এ বাড়ি থেকে সে দূরে—অনেক দূরে কোথায় হারিয়ে গেছে। কোন ছায়াছন্ন সবুজ জগতে। তার দু'চোখে সেই নীল নেশা।

হঠাৎ একটা নরম পেলব স্পর্শে চোখ মিলে চাইল চঞ্চল। এখন এ ভাবে পড়েছিল জানে না সে।···কে তাকে ডাকছে।

কোন রকমে দু চোখ খুললো।

···প্রতিমা !

প্রতিমার দু হাতের মধ্যে আজ নিবিড় নির্ভর খোঁজে একটি মানুষ। প্রতিমা বাবা আর দাদার কথা শুনেই বের হয়ে এসেছিল ওবাড়ি থেকে। চঞ্চলকে সব কথা জানাবে আজ। ওখানে আর থাকবে না। দাদার সবকিছু আজ তার কাছে বিশ্রী ঠেকে।

ওবাড়িতে কেউ টিকতে পারবে না। তিমিরও তাই চলে গেছে। আদর্শ ! কর্ত্তব্য ! প্রতিমা ওসবে আজ বিশ্বাস করে না। কোন দাম নেই। এ বাড়িতে আবহাওয়া অন্যরকম। সুষমা আর বেবী থাকে নীচে—দোতলায় চঞ্চলের ঘর। সুষমা প্রতিমাকে ঢুকতে দেখে একবার চাইল মাত্র। সে তার গানের টুইশানি নিয়ে ব্যস্ত। বেবী ও ঘরে পড়ছে।

গত রাত্রের সেই ঘটনাটা মনে পড়ে সুষমার। চঞ্চলকে সে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিয়েছে তার এইসব নোংরামি সে সহ্য করবে না। তার বাড়িতে সে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়। চঞ্চল যদি ওই সব ব্যাপার করে সে তার খুশিমতো অন্যত্র চলে যেতে পারে।

প্রতিমাকে আসতে দেখে সুষমা কথা বলে না। গান শিখছিল যে মেয়েটি সেও এসব খবর জানে। জানে চঞ্চল আর প্রতিমার ব্যাপারটা। সারা শহরের লোকই জেনেছে এটা। তাই একবার প্রতিমার দিকে চাইল। ওর মুখে ফুটে ওঠে একটু হাসির আভা। সুষমার তা নজর এড়ায় না।

ওদের সকলের সামনেই চঞ্চল প্রতিমা আর তাকে জড়িয়ে নানা কথা ওঠে। সুষমার কাছে বিশ্রী ঠেকে। ওসব পরিচয় আজ তার কাছে মনে হয় লজ্জা আর অপমানের। তবু আবার গান শেখাবার চেষ্টা করে সহজভাবেই।

প্রতিমা ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল, চঞ্চল পড়ে আছে বিছানায়। এদিক ওদিক নোংরা, বিছানার ঔরঙ্গবাদী কাজ করা চাদরে বমির দাগ—মেজেতে পড়ে আছে দুটো বোতল, কাৎ হয়ে ঘাড় গুঁজে শুয়ে আছে চঞ্চল।

প্রতিমার মনে নীরব একটা বেদনা জাগে ; দিদির উপর রাগ হয়। মানুষটাকে এত অবহেলা করে সে জানতো। জানে তার কারণ আজ সে চঞ্চলকে ঘৃণা করে সারামন দিয়ে। তার অবহেলা—অবজ্ঞাই যে চঞ্চলের মতো মানুষকে তার উপরে এত বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে সেটা বোঝে নি সুষমা। চঞ্চল প্রতিমার কাছে বাঁচার আশ্বাস চেয়েছে।

প্রতিমা এগিয়ে যায়।···ডাকছে চঞ্চলকে।

—এ্যাই।··শুনছো ?

···ওকে সন্তর্পণে তুলে মাথার নীচে বালিশটা দিয়ে দেয় চঞ্চলের নেশার জড়তা কাটছে ওর স্পর্শে! চোখ মেলে চাইল। অবাক হয় সে।

—তুমি! এখানে ?

প্রতিমা দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয়।

—এলাম। দেখতে এলাম কি ভাবে বেঁচে আছো ? ছিঃ-ছিঃ—এর মধ্যে আছো কি করে ?

চঞ্চল হাসছে। সারা দেহ মনে ওর ঝড় বয়ে গেছে। প্রতিমা এসেছে। সকালের মিষ্টি আলোয় পাখীগুলো কলরব করছে। কৃষ্ণচূড়ার ফুলে মিষ্টি বাতাসের শিহর। চঞ্চলের কাছে হঠাৎ সকালের এই সোনাসকাল ভালোলাগে।

প্রতিমার নিজেরই মনে হয় তার করার কিছু আছে, মানুষটার অন্তরের অতলে কি বেদনা রয়েছে—রয়েছে কি শূন্যতা। প্রতিমা তার ভালোবাসা দিয়ে সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করে দেবে। সার্থক করে তার জীবন, নিজেও সুখী হবে।

বলে প্রতিমা।

—থাকবো বলেই এলাম।

চঞ্চল কি ভাবছে। প্রতিমাকে দেখেছে ভালোলেগেছে, তার অবচেতন মন ওর মধ্যে হারানো যৌবন, ফেলে আসা সেই বসন্ত দিনকেই আবিষ্কার করেছিল। তাই চঞ্চল তাকে কাছে টেনে এনেছে ; কিন্তু এই সুষমা এ বাড়িতে আজ অন্য পরিবেশ রচনা করেছে। এখানে চঞ্চল স্বামী—তার সন্তানের বাবা। এ বাড়িতে শুধু কর্তব্য আর নীতিবোধই বড় হয়ে উঠেছে। যৌবনের উচ্ছ্বাস লাস্যের স্থান নেই এখানে, এখানে বসে চঞ্চল তার হারানো যৌবনকে নোতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তার চিরপ্রেমিক চিরবুভুক্ষু সত্ত্বার ঠাঁই এখানে নেই। তাই বোধ হয় প্রতিমাকে এই বাড়িতে রাখতে পারে না। তার নিজের কাছে এই দ্বৈত পরিচয় বিচিত্র ঠেকে। প্রতিমা জানে না ওর মনের অতলের সেই সংশয় আর দ্বিধাটাকে।

জিজ্ঞাসা করে।

—কি ভাবছো ?

প্রতিমার কথায় চঞ্চল জবাব দিল না। প্রতিমা বলে চলেছে।

—এ ভাবে তোমার চলবে না। আরও মন দিয়ে কাজ করতে হবে। আরও লিখবে তুমি। একটা নির্জন পরিবেশ গড়ে তুলবো।

হঠাৎ কার হাসির শব্দে থমকে দাঁড়াল প্রতিমা। দরজার দিকে নজর পড়তেই দেখে সুষমা, হাসছে সে ওর কথাগুলো শুনে। সুষমা জানতো প্রতিমা অনেক স্বপ্ন দেখেছে ওই চঞ্চলকে কেন্দ্র করে। তেমনি অনেক স্বপ্ন দেখেছিল সুষমাও। সেও তার যৌবন উছল মনে চঞ্চলকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন রচনা করেছিল। চঞ্চল বড় হবে, দিকপাল সাহিত্যিক হবে, হবে সর্বজন পূজ্য একটি আদর্শ মানুষ। যে সমাজের কল্যাণের জন্য কিছু অবদান রেখে যাবে।

কিন্তু তার সব আশা ব্যর্থ হয়ে গেছে। চঞ্চল আজ সাহিত্যের ক্ষেত্রে একজন বিকৃত শ্রষ্টা। সাহিত্যের প্রতিভাকে পণ্যে পরিণত করেছে, দেহ সর্বস্ব বর্ণনায় তার মনের অঞ্চলের পাঁক ঠেলে উঠেছে কদর্য ভাবে। পয়সা সে পায় কিন্তু কি ভাবে ? ওই বাজার পাড়ার মেয়েরা দেহ বিক্রী করে অর্থ পায়—ও তেমনি মনের পাপটাকে সোচ্চারে প্রকাশ করে মানুষকে বিকৃত আনন্দে দিয়ে পয়সা পায়—আর নিজেও গ্লানির অতলে তলিয়ে যায়।

ওকে সম্মানজনক কোন স্রষ্টার আসনে বসাতে পারে নি সুষমা। শুচিতা নীতি-বোধ মনুষ্যত্ব কিছুই নেই। ওর মন জুড়ে শুধু লোভ-লালসা আর জৈবিক ক্ষুধা।

প্রতিমা সেটা জানে না। তাই ভালোবেসেছে ওর বাইরের চকচকে স্বরূপটাকে। নীল চশমায় ঢাকা মানুষটার অতলে সেই চির-অতৃপ্ত জানোয়ারটাকে যেদিন দেখবে—সেদিন শিউরে উঠবে।

প্রতিমা দিদির দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় স্বার্থপর একটি নারী।

চঞ্চলও দেখছে সুষমাকে। আজ তাকে সে এড়িয়ে থাকতে চায়। তার অন্তরের প্রকৃত পরিচয় ধরা পড়ে গেছে সুষমার কাছে। ওকে তাই এড়িয়ে চলতে চায় সে।

সুষমা তবু বলে।

—অনেক স্বপ্নই দেখেছিস প্রতিমা। আমিও দেখেছিলাম। আজ সব আমার ভেঙ্গে গেছে। তাই বলছিলাম—আজ মা ; মেয়ের কাছে আমার সম্মান আছে। যদি থাকতেই হয় এভাবে থাকা যায় না।

জবাব দেয় প্রতিমা।

—দরকার হয় এ বাড়ি ছেড়ে দোব। এখানে থাকবো না আমরা।

চঞ্চলই খুশীই হয় মনে মনে প্রতিমার এই জবাবে। সেও কলকাতার স্বপ্ন দেখে। এখানে বাঁধা পড়ে সে যেন হারিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিমা বলে।

—দরকার হয় কলকাতাতেই থাকবো।

সুষমা বোনের তেজদৃপ্ত মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে। ও জানে না কিসের ওপর

ভর করে এই উত্তাল সংসারে পাড়ি দিয়েছে। সুষমা কথাটা জানাতে গিয়েও পারল না। জবাব দেয়।

—তাই বোধহয় ভালো হবে। চোখের সামনে এই বিশ্রী কাণ্ডগুলো দেখতে আমি চাই না। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে।

সুষমা স্থির কণ্ঠে জবাব দেয়।

—হ্যাঁ। আমার—আমার মেয়েরও লজ্জা বোধ হয়। সমাজে মিশতে হয় যে আমাদের। সেখানে এখনও সব মানুষ এমনি জানোয়ার হয়ে ওঠে নি।

—তবে আলার টাকা নিতে লজ্জা হয় না? চঞ্চলের গলার স্বর চড়ায় ওঠে। সুষমা শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়…

- ওটাও নেব না ভেবেছি। ওই পাপের অন্ন আমার সংসারেও পাপের ছায়া আনবে। আমার দিন চলে যাবে। তোমরা বরং এখান থেকে গেলেই ভালো করবে।

সুষমা বের হয়ে গেল। প্রতিমা দিদির দিকে চেয়ে থাকে। চঞ্চল তখনঃ গজরাচ্ছে—নীতিবোধ, সম্মান—লজ্জা! ওসব ভুয়ো, বুঝলে আজকের দিনে ওগুলো দুর্বলতা, যে মানে সে কাওয়ার্ড। কি ওর দাম! সমাজের সবকিছুই আজ হারিয়ে গেছে। আসল হল টাকা। যত টাকা থাকবে তোমার…যত নাম থাকবে, ততই লোকে ভাববে তুমি অনেক উঁচুতে। ওই বদনামগুলোই তখন হবে কৃতিত্বের পরিচয়। প্রতিমা কথাটা ঠিক বোঝে না। ওসব নীতি তত্ত্বকথার ধার ধারে না সে। সে অনেককিছু পেয়ে আনন্দে বাঁচতে চায়।

আজ চঞ্চলকে একান্ত নিজের করেই পেয়েছে সে, তাই মন খুশীতে ভরে ওঠে। ওরা ঘর বাঁধবে দুজনে। প্রতিমা সার্থক হবে।

ঘর বাঁধা কই আমার হলো না!
মানস-মুকুল ফুটেছিল গুরু
ফসল ফল্‌লো না!
ঘর বাঁধা কই আমার হ'ল না!

সুরটা উঠছে রিণি রিণি! একতারার সুরে ঠাঁই ভরে উঠেছে। পারঘাটের ধারে বটগাছের চাতালে বসে খেয়া-পারের বাউল গাইছে। শান্ত দুপুর। মাথায় ধূলিধূসর পগ্‌গ, পটি লাগানো আলখাল্লাটা খোলা। ওই বাউলের চোখে দিগন্তের আহ্বান।

গঙ্গার জলে দুপুরের রোদ ঝিকিমিকি তুলেছে। দু একটা নৌকা পাল তুলে ওই স্রোতে ভেসে চলেছে কোন নাম না জানা লক্ষ্যের দিকে। কদম বসেছিল তার ঝুপড়ির দাওয়ায়। তার মনে অমনি শূন্যতার হাহাকার। ক'দিন থেকেই সে দেখেছে এখানে তার কোন কাজ আর নেই। ঘাটের হাঁকডাক বেড়ে গেছে। দিনের বেলায় যাত্রী পারাপার করে, রাতের অন্ধকারের ওপারের পল্লী অঞ্চল দূর কালনার দিক থেকে আসে বস্তা বোঝাই নৌকা, সে সব বস্তায় আসে চাল। সব বস্তাই গিয়ে

নন্দ সাহুর গুদামে, নাহয় কলকাতার দিকেও চলে যায় নৌকায় করেই।
[ঘ]াটের আলো জ্বলে না। অন্ধকারে বসে থাকে কদম।

এমনি করে বসে বসে খেলে ক'দিনই বা চলবে। তাই দাওয়ার ওপাশেই পান [..] সিগ্রেট নিয়ে বসেছে, তেলেভাজাটাজা করবার জন্য উনুনও করেছে।

তবু মনে হয় কদমের এভাবে এখানে বসে থাকার কোন অর্থ নেই। একবার বাঁধনই যখন কেটে গেছে তখন আর এখানে বসে থাকা কেন?

সুরটা উঠছে।

ঘর বাঁধা কই
আমার হ'ল না।

কদমেরও মনে হয় সেও চেয়েছিল অনেককিছু। একজনকে ভালোবেসেই এখানে [..]ছিল। আগেকার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। সে আর তার সেই [..]লালাগা মানুষটা দুজনে ঘর বেঁধেছিল। কিন্তু সে চলে গেছে—তারপর আর [..] কেন জানে না ভালোবাসতে পারেনি কাউকে। ঘাটের খাতাবাবুও আসে [..] মাঝে, চা টা খায়। অনেকদিন ধরে তাদের পরিচয় তবু কদমের লোকটাকে [..]লে হাসি পায়, জবুথবু একটা লোক! তাকে নিয়ে ঘর বাঁধা!...

কদম মনের অতলে খোঁজ করে আজ, তবু কোথাও কাউকে সে দেখে নি। মানুষকে দেখেছে—মনে হয়েছে তাদের মধ্যে এমন কিছু পায় নি যাকে নিয়ে সব ভুলে [..]তে পারে। তার সামনে চঞ্চল-তিনকড়ি-শ্রীদামের মুখটা মনে পড়ে। তিনকড়িকে ঘৃণা করে। তার সেই লালসার স্বাদ মেটাতে পারে নি—তাই কদম আজ হারিয়েছে। চঞ্চল! মনে হয় জীবনের সব সুরই ছিল ওর মধ্যে। ভালোবাসতে [..]জানে কিন্তু ওর নিজের মনের জ্বালা ওকে পথের সন্ধান দিতে পারে নি, সেই [..]লার বিকৃতিতেই ও নিজেকে—চারিপাশকে জ্বালিয়ে তুলেছে। সেই রৌদ্রদগ্ধ [..]রিক প্রান্তরের মতো একটা দৈন্য আর নিঃস্বতা ওর সব সাধনাকে কোথায় সিদ্ধির [..]প্রান্তে এনে আনন্দস্পর্শ থেকে বঞ্চিত করেছে।

ওর জন্য দুঃখবোধ করে কদম। নিজের সব হারিয়ে গেছে—তবু অপরের জন্য [..]বে সে!

—ঘোষপাড়া কতদূর মা?

বাউল তাকেই প্রশ্ন করে। কদম জানে সেই তীর্থপথের সন্ধান, কিন্তু তার [..]ছে আজ সব তীর্থও যেন সমান হয়ে গেছে। সেও একদিন তীর্থে গিয়েছিল—[..]ন্তু কি দেখেছে?

চঞ্চলের মতো মানুষের মনের অতলের গ্লানি আর পুঞ্জীভূত বেদনাটাকেই দেখেছিল [..]ধার বিকৃতরূপে। তবু হাত দিয়ে দূরের ওই ছায়াছায়া গ্রামসীমার দিকে দেখাল [..]ওই দিকে বাবাজী!

পথের আনন্দে ও মেতে আছে। তাই বোঁচকাটা তুলে বের হয়ে গেল ওই ম
দিকে।

কদম মিষ্টি রোদে ওর দিকে চেয়ে থাকে। এমনি করে যেন অনন্ত অসীমে খুঁজে মরছে সবাই। করুণার কথা মনে পড়ে। তাকে দেখেছিল সুন্দর এ
মেয়ে। সমীরের সঙ্গে দেখেছিল মাঝে মাঝে।

...আজ করুণাও কোথায় ছিটকে পড়েছে। মুখে চোখে পথ হারানোর বেদনা। কোন রকমে বেঁচে আছে জীবনের সব গরল-যন্ত্রণা সয়ে।

কালই রাতের অন্ধকারে তাকে এখানে দেখেছিল কদম। ওরা অনেকেই ঃ অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে, কেউ আসে এখানে শ্বাপদ লালসা মিটোবার সন্ধ কেউ মানুষের মুখের অন্ন নিয়ে বেসাতি করে। কেউ পথ খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত মনের সব গ্লানি ধুতে আসে পাপহারিণী গঙ্গার পুণ্য সলিলে।

কদম সেই জ্বালাযন্ত্রণা ভরা জীবন নদীর কূলে বসে আছে, নিজের কথাও ভুলে গেছে সে।

—বাবাঠাকুর!

সদানন্দবাবুর ওপারে কোথায় একটা অনুষ্ঠানে যেতে হবে, কোন স্কু বার্ষিক উৎসব। পারঘাটে এসে দাঁড়িয়েছেন। কদমকে দেখে মুখ তুললেন তিনি

—দোকান চলছে কেমন রে?

কদম হাসল, মলিন একটু হাসি।

—চলছে মন্দ নয়। আপনার শরীর ভালো?

—আর ভালো? কত বছর এই শরীরটাকে টানাপোড়েন করছি, কম ধকল গে এর উপর দিয়ে? এখন একটু বেতালা গাইলে এর দোষ কি বল? তবু চলতেই হ

পারের নৌকা এসে পড়েছে। সদানন্দ বলেন।

বৃদ্ধ সদানন্দ চলে গেলেন। কদমের মনে হয় ওই একটি মানুষই বোধ জীবনে ঘরের সন্ধান করে নি। পিছু ফিরেও চায় নি। তবুও আনন্দেই আছে তাহলে জীবনে আনন্দ কথাটার মানে নানা রকম; শেষ কথা কি তা জানে না বোধহয় সেটা নিজের কাছেই পরম হয়ে দেখা দেয়।

সেই আনন্দের পথ চেনে নি ওরা—তাই বুক ভরা জ্বালা নিয়েই ফিরছে পথে। ওই বাউল সন্ধান করে পথের। ওরাও করে। তবে ভুল পথেই ব তাই বারবার পথ ভুলেই জ্বলে মরছে।

মাঝে মাঝে বের হয় কদম।

চেনে ওই সুষমা। ওদের সংসারের খবর ও জানে।...তবু বলেছিল ক সুষমাকে।

—বুঝলে দিদি—ও মানুষটা অনেক বড়। তাই ওর জ্বালাও অমনি। তোমা

ার সব ভার নিতে হবে। ভালোবাসা দিয়ে ওর মনের সব ফাঁক আর জ্বালাকে ভরিয়ে দিতে পারো না ?

সুষমা ওর কথা শুনে চেয়েছিল কদমের দিকে।

মেয়েটা অমনি অদ্ভুত কথা বলে। তবু মনে হয় সে সব একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুষমাও সেটা জানে। ও ভেবেছিল প্রথমে। কিন্তু পারেনি। তার দিক থেকেও দোষ ছিল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সুষমা ওর দিকে চেয়ে থাকে।

কদম আজ এসেছে ওর বাড়িতে। চঞ্চলের জন্য তার মনের অতলে কোথায় একটা বেদনাই রয়ে গেছে।..এসে দেখে চঞ্চল বাড়িতে নেই। সুষমা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কদম স্বভাবজাত হাসি দিয়ে ওর শূন্যঘর ভরিয়ে তোলে।

—দিদির কি বিরহ নাকি গো ?

সুষমা ওর দিকে চাইল। কদম বলে।

—গান নেই, সুর নেই। মনের এত দুঃখ তালে ভুলবে কি করে দিদি ? কত্তা কোথায় ?

চঞ্চল প্রতিমাকে নিয়ে চলে গেছে আজই। সেইখানেই ওরা নোতুন করে ঘর পাতবে।...কথাটা জানায় সুষমা।

কদম ওর দিকে চেয়ে থাকে। কি ভাবছে !

—দোষ তোমারও দিদি। মানুষটাকে যদি ভালোবাসতে তাহলে তার এটুকুকেও মেনে নিতে। দূরে সরিয়ে দিলে তাতে তারও জ্বালা—তোমারও জ্বালা।

সুষমা আজ ওর কথার প্রতিবাদ করে না। মনে হয় নিছক মিথ্যা কথা নয় সেটা। তার দিক থেকে নীরব অবহেলা আর প্রচ্ছন্ন ঘৃণাই চঞ্চলকে এমনি বেপরোয়া করে তুলেছে।

আজ মনে হয় ওরা কেউই একথা খেয়াল করিয়ে দেয় নি।

—রাগ করলে দিদি ?

কদম ওকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করে। সুষমা হাসল ম্লান একটু হাসি—না।

কদম বলে—ওকে আরও দুঃখের মধ্যে ঠেলে দিলে দিদি। মস্ত লোক গো—অনেক বড় মন! ওদের যদি মানুষের নীচ ভাব—আর স্বার্থপর ভাবটাই কেবল আঘাত দেয়—তাহলে সেটা ওদের মনে দ্বিগুণ হয়ে বাজে। তাতে ফল খারাপই হয়। ওরা চায় ভালবাসা—মানুষের কাছে এইটুকু মাত্র তাদের চাওয়া; তাকে ফিরিয়ে দিয়েছো তুমি। তাই তো সে খুঁজে ফিরছে—কে তাকে ভালোবাসে তারই খোঁজে!

—কদম চুপ করে। এ যেন তার নিজেরই মনের কথা।

তারই সন্ধানে ঘোরে ওই বাউল—সেই ভালোবাসার সন্ধান করে কদম নিজে,... করুণা সেই ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়ে জ্বলে পুড়ে মরছে।...সেই ভালোবাসাকে সব

কর্তব্য আর নীতিধর্মের বোঝায় কুঁকড়ে মেরেছে সমীর। ও জ্বলছে। যা:
অমানুষ তারা ওসবের ধার ধারে না। জানোয়ারের মতো খেয়ে আর জৈবিক ক্ষ:
মিটিয়েই তারা ক্ষান্ত। তারই অন্বেষণে ঘুরছে ওই তিনকড়িবাবু শ্রীদামবাবুর দল।

···ওরাই চঞ্চলের ব্যর্থ মনের জ্বালাকে তাদের পাশব প্রবৃত্তির উত্তেজনা দি
ভরিয়ে দিতে চায়, মনে করে তাদেরই দলের একজন। কিন্তু চঞ্চল যে ওদের চে
অনেক বড়—অনেক মহৎ অনেক সুন্দর, তা ওরা ভাবতেই চায় না।

···চঞ্চলকে টেনে নোংরায় নামিয়েছে ওরাই।

কদম বলে একদিন সে ফিরছেই দিদি, যদি তোমার নিজের মনের সব জ্ঞানে
সরিয়ে দিয়ে ভালোবাসতে পারো আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

সুষমা সামান্য নারী, তার মনের স্বার্থপরতা—আর হিংসাটাকে আজ স্পষ্টত
করে দেখতে পায়।

মনে হয় সেও এর জন্য দায়ী।

···প্রতিমা অনেক আশা নিয়ে ঘর বেঁধেছে কলকাতায়।

বিচিত্র এর সমাজ তাদের ছোট্ট সহরের সেই চেনা-জানার আন্তরিকতা এখা
নেই। মানুষ এখানে সবাই স্বতন্ত্র, পৃথক একটি সত্তা। তাদের ফ্ল্যাটটাকে প্রতি
মনের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে।

কয়েকদিন কেটেছে ওই নিয়ে; এইবার প্রতিমার মনে হয় সে একা। চঞ্চল বা
থেকে বের হয়ে যায় সকালেই। কোথায় কোন উপন্যাসের চিত্রনাট্য লিখতে হ
দুপুরেও সেইখানেই লাঞ্চ খেয়ে নেয়। তারপর এখানে ওখানে বন্ধুমহলে আ
দিয়ে ফেরে রাত্রিতে। প্রতিমা বসে থাকে বাড়িতে, একা একা সময় আর কাটে না।
প্রতিমার মনে হয় এমনি করে তাকে শাস্তি দেবার জন্যই বোধহয় তাকে এখানে বন্দ
করে রেখেছে। কথা বলার লোক নেই।

কেউ কাউকে চেনে না।

তাই চঞ্চল ফিরলেই প্রতিমা বলে।

—এত দেরী করো কেন?

চঞ্চলের কাছে প্রতিমা যেন পড়া একটা বই। যতদিন তাকে হাতে পায়
ততদিন সে ছিল তার কাছে বিচিত্র একটা আকর্ষণ। কি এক নেশার মতো পে
বসেছিল তাকে, মনে হয়েছিল তার মনের সব সুরই ওকে ঘিরে উঠেছে।

আজ এ বাড়িতে তার কোন আকর্ষণ নেই। সকালের দিকে বাড়িতে থাক
কাজ নিয়ে বসে। বারবার মনে হয়েছে এই লেখাটাই তার আসল কাজ, এইটা
সে অবহেলা করেছে কি মোহের বশে। তারই সামনে নোতুন কোন লেখক মা
তুলছে, নোতুন চিন্তাধারা আর দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে—মানুষকে দেখছে।

—শুনছ!

লেখায় বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়ে ওঠে চঞ্চল। প্রতিমার দিকে চাইল।

—ওকে দেখে আর নেশা লাগে না।

কেমন বিশ্রী হয়ে ভেঙ্গে গেছে ওর গালদুটো, নিটোল হাতের সেই মসৃণ পেলবতাটুকুও হারিয়ে গেছে। বরং কুশ্রীই লাগে—একটা যেন মাংসল জীব তার সামনে দাঁড়িয়ে যাকে ক্ষণিকের জন্য ভোগ করা যায় মাত্র, চঞ্চলের মনের সেই বেদনা আর জ্বালার সন্ধান সে রাখে না।

প্রতিমা বলে চলেছে।

—এখানে একা একা ভালো লাগে না। আজ চল না বৈকালে একটু বেরুবো।

প্রতিমা দেখেছে ওপাশের ফ্লাটের স্বামী-স্ত্রীকে—আরও কতকজনকে বের হতে। সেজে গুজে তারা বের হয়। প্রজাপতির মতো।

চঞ্চল জানায়—এখন কাজ আছে। বৈকালেও বেরুতে হবে।

প্রতিমা জবাব দেয়।

—কাজ তো থাকবেই। ফিরবে সেই মাঝরাতে টলতে টলতে। এই তোমার কাজ!

চঞ্চলের সারা মন জ্বলে ওঠে।

—বিরক্ত করো না। এখন যাও বলছি।

প্রতিমা সরে এল ধমক খেয়ে। চঞ্চল কাজে মন দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু ‌পারে না। মনে হয় চঞ্চলের তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে এই পরিবেশে লিখতে ‌আর পারবে না সে। ফুরিয়ে আসছে।

কলম ফেলে উঠে পড়ল।

প্রতিমা গুম হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ওকে বের হবার আয়োজন করতে দেখে জিজ্ঞাসা ‌করে••কোথায় যাচ্ছো?

—জহান্নামে!

চঞ্চল বিরক্তভরে জবাব দিয়ে বের হয়ে গেল।

…প্রতিমাও তার মনের বারবার নিষ্ফল যন্ত্রণায় এমনি করে কেঁপে উঠেছে। ততই ‌মনে হয়েছে তার নিজের কাছে ব্যর্থতার কথা। বাবা মায়ের অমতেই সে বিয়ে ‌করেছিল, দাদার সম্পূর্ণ আপত্তিই ছিল এতে। দিদির কথা মনে পড়ে। তার দু ‌চোখে জল নেমেছিল তবু দিদিই বলেছিল তাকে চঞ্চলের মতো মানুষকে নিয়ে ‌কোন মেয়েই সুখী হতে পারে না। ওর চাওয়া অসীম অথচ কারোও প্রতি তার ‌যে কোন কতর্ব্য আছে সেইটা স্বীকার করে না। এক তরফা শুধু লুট করতেই ‌চায় ও।

কথাটা আজ সত্যি বলেই বোধ হয় প্রতিমার।

নীরব অসহায় রাগে সে জ্বলছে।

••চঞ্চলও ভেবেছে কথাটা। আজ তার জীবনের বাধামুক্ত পথে ওরা বারবারই

জড়ায়। নারীকে সে দেখেছিল ভোগের বস্তু হিসাবে, তাদের মোহে জড়িয়ে পড়ে ভুলই করেছে। সেই বাঁধনকে যেখানে না মেনেছে সেইখানেই সে সুখী। তাই মিস চ্যাড্রি, মিসেস দে কণিকা—আরও কতজনের কাছে সে চিরকাম্যই রয়ে গেছে। করুণ কদমের কথা মনে পড়ে!

...তারা আজও বেঁচে আছে চঞ্চলের কাছে সেই নেশার সাড়া নিয়ে, আর সুষমা—প্রতিমা! কোন মোহ নেই।

—আরে তুমি! পথ ভুলে নাকি! এসো এসো।

চ্যাড্রির ফ্লাটে গিয়ে হাজির হয়েছে চঞ্চল সকালেই। মিস্ চ্যাড্রি সব সময়েই সেজেগুজে থাকে। স্নান সেরে পরেছে একটা আসমানী রং-এর শাড়ি, চুলগুলো তখনও আঁচড়ায় নি। ছোট করে কাটা চুল-গুলোয় স্যাম্পুর মিষ্টি গন্ধ, গালে ক্রীম মাখছিল, সারা মুখখানাকেও বহু পরিশ্রমে তবু সরস করে রেখেছে, হাসিটুকুও নেশা লাগানো।

—সাতসকালে? কি ব্যাপার? প্রতিমার উপর রাগ করে বের হয়ে এলে নাকি—নটি বয়!

আদর করে চ্যাড্রি ওর গালেও একটু ক্রীম মাখিয়ে দেয়। চঞ্চলের রাগ তখনও পড়ে নি চ্যাড্রির ওই চাহনি ওই হালকা স্পর্শে অন্য সময় তার মনে মাতন লেগেছে ওই দেহটাকে সে চেনে। আজ তবু চঞ্চলের মনে ঝড় জাগে না। জবাব দেয়।

—ওদের কেন যে ভালো লেগেছিল তা জানি না মিস: চ্যাড্রি!

—এ্যা, কথাটা এ্যাদ্দিন পর বুঝলে?

হাসছে চ্যাড্রি, হাসির ধমকে তার সারাদেহ কেঁপে ওঠে, কাঁপছে তার উন্নত বুক—ওই নিটোল দেহে হাসির ছন্দ সাড়া তোলে।... চঞ্চলের সারাদেহে ওর মদির দেহের সুরভি, উষ্ণ একটু স্পর্শ!... চ্যাড্রির হাসিতে ফুটে ওঠে খুশীর আভাস। ও জানতো এই কথা একদিন বলবে চঞ্চল। তার নিজেরও এই রোগ এই জ্বালা।

কোন পুরুষকে নিয়ে একান্তে তাই ঘর বাঁধতে পারে নি, প্রজাপতির মতো সেজে গুজে কেবল উড়ে বেড়িয়েছে ফলেরই সন্ধানে' দুদিনের পরিচয়কে পরিণামে পরিণত করে নি সে।

তাই চঞ্চলের কথায় হাসছে সে। ওর হাতখানা চঞ্চলের দেহকে ঘিরে ধরেছে। পুরুষের মনের এই জ্বলাটাকে তার ভালো লেগেছে। ফিসফিসিয়ে বলে চ্যাড্রি!

—তুমি কাউকে ভালোবাস নি চঞ্চল! কারো দেহ-মনকে। চঞ্চল ওর দেহের নিবিড় স্পর্শে আজ মাতে না।। সারা মনে ওর ফুটে ওঠে নারীর সেই কামনামদির বিশ্রী রূপটা। ওরা তাকে বারবারই পথ ভুলিয়েছে। কেবল অতল উন্মাদনার অন্ধকারেই টেনে নিয়ে গেছে।

তার জীবনে তারাই এসেছে বার বার। তার জন্মলগ্নেই নারীর ওই বিষাক্ত কামনার নীলবিষ তার রক্তপ্রবাহকে কলুষিত করেছে।

ঘৃণায় বিরক্তিতে চঞ্চল ওর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। চ্যাড্রির ভাঙ্গা-গলা কাঁপছে বার্থতার জ্বালায়।

—চঞ্চল!

—চুপ করো।···শুধু দেহের ক্ষুধাটা দিয়েই আমাকে তোমরা ভুলিয়েছো। তোমরা সবাই। তোমাদের কাছে আমি কোন বুভুক্ষু জানোয়ার মাত্র! তার বেশী কিছু নই।

···ওকে সরিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেল চঞ্চল। তার মনের জ্বালা তাকে পুড়িয়ে মারছে। মাঝে মাঝে মনে হয় পথের ওই সব মেয়েরাই যেন কাপড়ে ঢাকা এক একটা জঘন্য কামনার মূর্তি! তার বেশী কিছু নয়।

স্নেহ—মমতা—করুণা—প্রেম!·· সব কিছু মিথ্যে!···তার কাছে দুনিয়ার সব আলো হারিয়ে গেছে; মানুষ নয়—ওরা কেবল বিচিত্র এক প্রাণী!

·· গোবিন্দের দোকান নেই। তবু চায়ের অভাব নেই।

চঞ্চলদের মতো অনেকেই আসে ওখানে। সেই জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য। সব চিন্তা ভাবনাকে ভুলতে চায় সে। মদের জ্বালায় জীবনের সেই হতাশা আর বিশ্বাস হারানোর যন্ত্রণাকে ভুলতে চেষ্টা করে, তবু ভোলা যায় না।

লিখতে হবে। আজ তার কাছে এইটাই পেশা হয়ে উঠেছে। এতদিন সে প্রকাশক-সম্পাদকদের খোঁজ করে ফিরেছিল প্রথমে। তার লেখা প্রকাশের জন্য, আজ সে নিজেই তাদের এড়িয়ে চলছে। সকলের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে আগাম। তবু লেখা দিতে পারে না।

তারা এইবার চঞ্চলের সন্ধান করছে।

তবু চঞ্চলের অভাব মেটে নি। টাকা! আরও টাকা চাই তার।

হাঁপিয়ে উঠেছে চঞ্চল।···মদের গ্লাশটা থেকে বুদবুদ উঠছে—সে ওঠারও শেষ নেই। ও গুলো সারা মনকে ঘেঁটে তার নীচে থেকে যেন সব পাঁকগুলো ওপরে তুলেছে। দিনের আলোটাকে সহ্য করতে পারছে না, উঠে দাঁড়াল। চোখে কালো চশমাটা পরে কোন রকমে বের হয়ে আসে।

কোথায় যাবে জানে না। এতবড় দুনিয়ার যেন তার পথ হারিয়ে গেছে, দিনের আলো নেই—চারিদিকে জমেছে ওর রাত্রির অন্ধকার।···প্রতিমা চুপ করে বসেছিল। আজ কোন কাজই করে নি সে। চঞ্চলের উপর অনেক আশা করেছিল সে। তারই উপর বিশ্বাস করে প্রতিমা তার জীবনের সবকিছুকে তুচ্ছ করে এসেছে কিন্তু অনেক বেদনায় আবিষ্কার করেছে যে মাটিতে সে ঘর বেঁধেছে সেটা মাটি নয় চোরাবালি। তাই নিমিষের মধ্যেই তা অতলে তলিয়ে গেছে।

নিজের উপরই আসে অপরিসীম ঘৃণা। দুপুর হয়ে গেছে, সারাদিন খায় নি প্রতিমা। এমনিতেই সে জেদী মেয়ে তার নিজেরও ব্যক্তিত্ব আছে। তাই এই অপমান আর অবহেলাটা বেশী করেই বাজে তার মনে।

চঞ্চলকে ভিতরে দেখে ওর দিকে চাইল। বেটোর—মদ্যপ একটা লোক বা
ফিরছে। চোখ দুটো লাল—টলছে ওর দেহ, সারা গা থেকে বিশ্রী গন্ধ বের হচ্ছে

প্রতিমা একবার চাইল মাত্র। ওর জন্য কোন মায়া মমতা নেই। দেখো দিদিকে অনেক কিছু চুপ করে সইতে, প্রতিমা সহ্য করবে না। চঞ্চল ওঘরে গি সোফায় বসল। আপন মনেই কি বিড় বিড় করছে বোধহয় গালাগালই দিচ্ছে দুনিয়ার সবাইকেও গালাগাল দেয় নিজেকে অবধি।

প্রতিমা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে—ওর সব ভাবনা দৃষ্টি যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে দুঃ ঘৃণায়।

চঞ্চলও দেখেছে ওকে, ওর চোখে সেই ঘৃণাটাও টের পায় সে। ওদেরই ঘৃ করে চঞ্চল। তার সারা শক্তি দিয়ে ওই অন্তরের কুশ্রী সত্য রূপটাকে ফুটিয়ে তুল সে। মানুষের মিথ্যা সংস্কার আর ওই নারীর মহীয়সীভাবের মোহটাকে আঘা করবে।

সমাজব্যবস্থা! রক্ষণশীল কিছু স্বার্থপর মানুষ তাকে সহ্য করবে না অশ্লীল বিকৃতরুচি বলে গালাগাল দেবে, কিন্তু তার কাছে জীবনের এই কদ রূপটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটা তার অপরাধ নয়—তার সচেতন মনের কা ওদের প্রতারণাটা ধরা পড়ে গেছে—দোষ তাদেরই।

লিখতে চেষ্টা করে চঞ্চল! তার মনের সেই জ্বালাটা প্রকাশ পথ পেয়েছে।

জীবনের এতটা পথে যারা এসেছিল তাদের আজ নোতুন চোখে দেখেছে চঞ্চ ব্যর্থ জীবনের মূক যন্ত্রণাকে আজ মুক্ত করে সে হাল্কা হতে চায়।

ভুল! এতদিন সে ভুলই করেছে।

সুস্থ স্বাভাবিক জীবনটা আজ তার সামনে থেকে হারিয়ে গেছে। মুছে গেছে

ক'দিন আর বের হয় নি চঞ্চল। ঘরের মধ্যেই রয়েছে। দিনরাত তার মনে অতলের সেই জ্বালাটাকে লেখার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছে। সেই জ্বালার তীব্রতা তা যেন ঘুণ পোকার মতো কুরে কুরে খেয়েছে, নিজেও জ্বলেছে সেই বেদনায়।

মনের সুপ্ত তন্ত্রীগুলো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। নিজের কাছে প্রশ্ন জেগে জীবনের ঢাকা পড়া এই পাপ হয়তো সত্যি—কিন্তু তাকে জাগিয়ে তুলে সে দানবটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেন নিজের মধ্যে চিতার আগুন জ্বলবে সে সাহিত্যের ধর্ম জীবনকে সুন্দর করা। মনুষ্যত্বকে মহত্ত্বের আসনে প্রতিষ্ঠা করা।

কিন্তু চঞ্চলের মনে হয় ওই নীতির মধ্যেও রয়েছে শিল্পীর আত্মবিস্মরণে প্রচেষ্টা। তাকে আজকের এই দিকজোড়া বিপর্যয়ের মাঝে সব কলঙ্কের মুখো মুখি হয়ে দাঁড়াতে হবে, সত্যটাকে প্রকাশ করা তার ধর্ম। মানুষ আজ মরে গে —পচে গেছে তার সর্বাঙ্গ। ও সেই গলিত মানবাত্মার সত্যিকার মূর্তিটাই মানুষে সামনে তুলে ধরবে, তাতে যত বড় আঘাতই আসে আসুক! তাতেও পিছ হবে না।

…এবাড়িতে আর একটি প্রাণী রয়ে গেছে, তার সংবাদ রাখে না চঞ্চল। তার কাজের কাছে সেই জগতে ওই প্রতিমার কোন পরিচয়ই নেই।

সারাদিনই কাজের পর মনে হয় ক্লান্ত দেহটা ভেঙ্গে পড়ছে যন্ত্রণায় আর জ্বালায়। কণ্ঠে তার তৃষ্ণা।

সেই জ্বালাটাকে ভুলতে চায় সে, র‍্যাকেই থাকে দু একটা বোতল, ওগুলো তার নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে। ইদানীং তার মাত্রা বেড়েও গেছে। তবু বুকের জ্বালা নেভে না। মানুষের সব মুখগুলো রাতের অন্ধকারে বিরাট ছায়ামূর্তির মতো বিভীষিকা নিয়ে এগিয়ে আসে তার দিকে।

তার কণ্ঠনালী যেন রুদ্ধ করে দেবে।

সব ভুলতে চায় চঞ্চল।

রাতের গভীরে জেগে আছে প্রতিমা। ওপাশে অর্দ্ধ অচেতন সেই মানুষটা। ও তার দিকে চাইতেই ভুলে গেছে। তার মনের অতলের গ্লানি তাকে ভালোবাসতে ভুলিয়ে দিয়ে কোন অমানুষে পরিণত করেছে।

লেখা পাতাগুলো টেবিলে রখো।……

প্রতিমার মনে আসে হু হু কান্না—তার সব চাওয়া এমনি নিষ্ঠুর ব্যর্থতায় পরিণত হবে ভাবেনি। ও ঠকে গেছে।

তাকে ঠকিয়েছে, তার সব লুণ্ঠন করে নিয়েছে ওই চঞ্চল। আজ পায়ের নীচে থেকে মাটিটুকু পর্যন্ত সরে গেছে।

স্বপ্নের অপমৃত্যু শেষ অবধি দিনের আলোর মুখ দেখেছে। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকমহলে আলোড়ন জাগে। স্পস্ট—দৃপ্ত তার প্রকাশভঙ্গী, ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য যেন প্রবাহের মতো পাঠককে টেনে নিয়ে যায়, প্রতিটি ছত্র তার জ্বালায় ভরা। সব যেন পানীয়ের মতো সেই ছত্রগুলো পঠকের মনে সাড়া জাগায়, মাদকতা আনে।

যে জীবনকে মানুষ সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখে, যে কুৎসিত সত্ত্বাটার প্রকাশ রাতের অন্ধকারে তাকেই দিনের আলোয় সমাজের, নারী পুরুষের সামনে জীবন্ত করে তুলেছে চঞ্চল।

একদল তার সত্যদর্শনে বর্ণনাশৈলীতে আর রচনার ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হয়েছে, অন্যদল ঘৃণায় শিউরে উঠেছে জীবনের কদর্য প্রকাশে। তাই নিয়ে গুঞ্জরণ ওঠে।

চ্যাড্রি মিসেস দে বন্ধুবান্ধবরা খুশীতে ভরে উঠেছে। সাহিত্যের নোতুন দিক তুলে ধরেছে চঞ্চল। তারা বলে এতদিন চঞ্চলের সাহিত্য ছিল গতানুগতিক জীবনের মধ্যেই বন্দী। সেই মানুষের সাবেকী মনোভাবকেই সে তার বিপুল প্রতিভা দিয়ে প্রকাশ করেছিল, এ যেন তরওয়াল দিয়ে দাড়ি কামানো।

এতদিনে চঞ্চল তার সত্যিকার প্রকাশ পথ পেয়েছে। ওরা সকলেই যেন ওই উপন্যাসের পাত্র পাত্রী, ও তাদেরই অন্ধকারের কাহিনী। তাদের সমাজের জয়গান।

তাই তারা চঞ্চলকে ঘটা করে সম্বর্দ্ধনা জানাবার আয়োজন করেছে। চঞ্চল

আজ খুশী হয়েছে. তার অন্ধকারের সেই জীবনটাকে সে তুলে ধরেছে, তার আশে-পাশের সমাজে দেখেছে তারই খ্যাতি। কলকাতার ঝকঝকে সমাজে দেখেছে তার বই-এর সমাদর। আগামী দিনের সমাজের নোতুন স্রষ্টার অধিকার রাখে তারা। নেলপালিশ লাগানো জাপানী খোঁপা ওয়ালা আলতো শীর্ণ মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগের উপরে দেখেছে তার সেই বই, তাই নিয়ে ট্রামে বাসে পার্কে আলোচনাও চলেছে। ওরা কথা বলে আস্তে, জোরে কথা বলতে বেদম হয়ে যায়—দেহের উর্ধ্বাঙ্গে সামান্যতম আবরণ—হাত দুটো পুরোই অনাবৃত, অবশ্য মাংস তাতে নেই। মাথার চুলও ফল্‌স। ঠোঁটের গালের বিবর্ণতা ঢাকতে রং-এর প্রাচুর্য!

সেই সমাজে দেখেছে তার সম্বন্ধে কথা।

স্প্লেনডিড্‌, আউটস্পোকেন বই!

কে বলে বুঝলি নেলী, এ্যাদ্দিন বাংলা বই লেখা হতো চাষাভূষো না হয় কেরাণীদের নিয়ে। প্যানপ্যানানি ভালো লাগে না। এবার স্বপ্নের অপমৃত্যু। পড়ে মনে হল চার্মিং বুক! একেবারে ইংরেজী বই-এর মতো ইনটারেষ্টিং।

…ওরাই সমবেত হয়েছে অভিনন্দন জানাতে। চঞ্চল তার পাঠকমনের সেই অবদমিত নীরব কামনাটাকে সোচ্চার করে তাদের মন জয় করেছে। টাকারও অভাব নেই এবার।

তবু কোথায় গুঞ্জরণ থেকে খড় ওঠে।

প্রতিমাও পড়েছে বইখানা। পড়েই শিউরে উঠেছে। যে মানুষটাকে এত কাছে থেকে দেখেছে, যাকে ভালোবেসেছিল তার অন্তরে এমনি পুঞ্জীভূত গরল ছিল তা আজ জেনে শিউরে উঠেছে। এতদিন প্রতিমা বোঝেনি কেন চঞ্চল তাকে এমনি করে অবহেলা করেছে, প্রতারণা করেছে তার সঙ্গে। দিদির কথা মনে পড়ে, দিদি লোকটিকে সারা মন দিয়ে ভালোবেসেছিল, কিন্তু চঞ্চল তাকেও নিদারুণ আঘাত দিয়েছে। চঞ্চল আঘাত দিয়েছে তার বাবা মা দাদাকেও। যেখানে যতটুকু ভালোবাসা সে পেয়েছে, সেইখানেই ততবড় আঘাত দিয়েছে সে। মানুষ তার সামনে শুধু কালো হয়েই ফুটে উঠেছে।

শুধু তাই নয়—নারী তার কাছে ভোগের বস্তু মাত্র। তাদের ভালোবাসা তার কাছে পায়ে দলে পিষে ফেলে দেবার বস্তু।

সত্যিকার কোন দাম নেই—অস্তিত্ব নেই ওসবের।

প্রতিমা তাকেই ভালোবেসেছিল—আজও তারই অন্ন মুখে তুলছে। যে নারীকে শুধু ভোগ্যা বলেই জানে—প্রকাশ করতে পারে প্রকাশ্যে তেমনি মানুষের ঘর করছে সে সীমন্তে সিন্দুর পরে স্ত্রী সাজার ভান করে।

আজ চমকে ওঠে প্রতিমা—জীবনে কোন দায় যে মানে না তাকে জড়িয়ে ধরে বাঁচা যায় না।…তিল তিল করে আজ সেই কঠিন সত্যটা তার সামনে ফুটে ওঠে।

হাহাকার করে ওঠে সারা মন।

—এসব লিখতে পারলে তুমি।

চঞ্চল সভায় বেরুবার আয়োজন করছে। কোঁচানো ধুতি আদ্দির পাঞ্জাবী পায়ে চকচকে পাম সু! প্রতিমাকে ঢুকতে দেখে ওর দিকে চাইল। মুখে চোখে ফুটে ওঠে বিরক্তির আভাষ।

প্রতিমা কথার জবাব দেয়।

—লিখেছি। সত্য বলেই লিখেছি।

—অ!

—শিউরে উঠলে যে।

—দেখছি, তোমার ভিতরে বাইরে এত কাদা কি করে জমলো? কোথাও কি এতটুকু মনুষ্যত্বকে দেখোনি? এতটুকু ভালোবাসার ছোঁয়াও পাওনি যে এইসব জঘন্য লিখেছো? মনের মধ্যে এতটুকু শুচিতা থাকলে মানুষ এসব লিখতে পারে না।

চঞ্চলের মুখে ও যেন চাবুক মারছে। নিজের জীবন দিয়ে প্রতিমা বুঝেছে ওই বেদনা, ওর দেওয়া সেই আঘাতটা। তাই আজ সে মুখর হয়ে ওঠে প্রতিবাদে। চঞ্চল সইতে পারে না। গর্জে ওঠে।

—ভালোবাসা! ওসব টাকা দিয়ে কেনা যায়! খ্যাতি পয়সা থাকলে মেয়েমানুষ অঢেল জোটে। সত্যিকার ওসব কিছুই নেই! মেয়েমানুষ পুরুষকে চায় তার প্রয়োজনে। তাকেই গলাভরা নাম দিয়েছে ভালোবাসা। মানুষ মানুষকে চায় তার স্বার্থে—তার নাম দিয়েছে আত্মীয়তা।

প্রতিমা চমকে ওঠে। কোন একটা অমানুষের সঙ্গে কথা বলছে সে। যে পদে পদে শুধু মানুষকে আঘাতই করতে জানে। প্রকৃতির সব নিয়মকে যে ঘৃণ্য বলে জানাতে চায়।

নিজেই জানে না ওই আঘাতে সেও নিজেই জ্বলছে, আজকের উদ্দামতা তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে, কিন্তু একদিন থাকতেই হবে তাকে। সেদিন দেখবে তার দিকে শুধু মরুভূমি, তৃষ্ণার পানীর সেখানে মিলবে না।

চঞ্চল বলে।

—ওসব থাক। তুমি যাবে না।

প্রতিমা জবাব দেয়।

—না। যে সমাজ মানুষকে তার সব দোষ গুণ নিয়ে ক্ষমার চোখে দেখে না, শুধু তার বিকৃত শবদেহ নিয়ে ঠুকরে খুবলে আনন্দ পায় সেখানে আমি যাবো না।

চঞ্চল হাসতে থাকে। নীচে হর্নের শব্দ শোনা যায়। সিঁড়ি দিয়ে কারা কলরব করে উঠে আসে। আধ বয়সী চ্যাড্ডি আজ সেজেছে কিশোরী মেয়ের মতো। ঠোঁটে গালে রং-এর আধিক্য; শাড়ীখানা গা থেকে খুলে পড়েছে। কৃত্রিম বুকের উপর

একটা আবরণ তাকে যৌবনবতী করে তুলেছে—পিছনে মিসেস দে। তার দুচোখে কি নেশা।

আরও কারো যেন এসেছে। জায়গাটা যেন বদগন্ধে আর কর্কশ কলরবে ভরে ওঠে। তাদের কাছে চঞ্চল আজ মধ্যমণি। ওরা চঞ্চলের মনের অতলে কোন নরকের সন্ধান পেয়ে—তাদেরই একজন বলে মেনে নিয়েছে।

—ইউ নটি বয়। এত দেরী হয়ে গেল তোমার ?

মিসেস দে চঞ্চলের মুখের কাছে মুখ এনে কি যেন একটা অশালীন মন্তব্য করে প্রতিমাকে দেখিয়ে। ওরা হাসছে। চ্যাড্রি বলে ওঠে।

—চঞ্চুকে ওসব বলো না মিলি, ও বড় সাই।

—সাই ! মিলি হাসছে খিলখিলিয়ে। কে বলে ওঠে।

—চঞ্চলবাবুর গুণের কথা জানো না মিস চ্যাড্রি !···কি লিখেছে।

রিয়েলি চার্মিং—এক্সাইটিং !

ওরা প্রতিমাকে যেন চেনে না। চঞ্চলকে নিয়ে চলে গেল তারা তাদের জগতে। প্রতিমা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ জগতের সে কেউই নয়। ওই মানুষটাকে এই জগৎকে সে ঘৃণা করে, নিবিড় ঘৃণা।

সমীরের সামনে আজ পথ নেই। সব কেমন আঁধারে ঢাকা। তিমিরের চাকরীর পর এবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। কলকাতায় কোন মেসে আছে। মাঝে মাঝে আসে তবে সংসারের সাশ্রয় তাতে কিছু হয় না। মাকে জানায় সে।

—এত খরচ সেখানে।

শুনেছে সমীর কথাটা ? এও শুনেছে, তিমির নাকি কোন মেয়েকে বিয়েও করবে। কোন কথাই বলে নি সমীর। ওরা যে যার পথ দেখে নিয়েছে।

বৃদ্ধ হরিপদবাবু বলেন।

—সবাই পথ দেখবে সমী, পথ পাবি না তুই আমরাই তোর ভবিষ্যৎকে পিষে মারলাম। তাই ভাবি বেঁচে আর লাভ কি ? ঢের তো হয়েছে।

সমীর জবাব দেয় নি। হরিপদবাবু বলেন।

—কর্তব্য ! নীতি, এসবের আজ ঠাঁই নেই সমী। কত ঠকবি তুই ?

সমীর ভুলু পারে নি সেই বোঝাটাকে নামিয়ে হাল্কা হতে। ঘর বাঁধার সব তার নেই। চারিপাশে দেখেছে কেবল যন্ত্রণা। সুষমার জীবনে দেখেছে সেই শূন্যতা, প্রতিমাও আজ কি পেয়েছে তা জানে সমীর। চারিদিকের এই হাহাকারের মাঝে সমীরের ঘর বাঁধার স্বপ্ন কোনদিকে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

করুণাকে দেখেছে, মাঝে মাঝে দেখা হয়।

সে যেন অন্য মানুষ। মুখে চোখে কি ক্লান্তি আর বেদনার কালো ছায়া। সেদিন করুণাকে বাড়ি আসতে দেখে অবাক হয় সমীর। করুণার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে সে। তাকে ঘিরে অনেক কাহিনীই জমে উঠেছে।

করুণা হাসছে—অবাক হয়েছো না ?

সমীর ওকে দেখছে। অনুসন্ধান করছে জীবনের এত কালিমা কে মুখে লেপে দিয়েছে। নিজে তো সে রকম নয়। পথ হারানো একটি নারী বলে ওঠে করুণা।

—বইখানা পড়ে দেখো!

এগিয়ে দেয় সমীরের বইটা। সুবপ্নের অপমৃত্যু! সমীর বইটার কথা শুনেছে, নানারকম কথা। করুণা বলে।

—এটা তোমাকে পড়তে দিতে এলাম। যে পাঁকের কথা ভাবো—সেটা যে কত গভীর তা বুঝবে এর থেকে। তুমিও জড়িয়ে আছো এরই মধ্যে। চলি!

করুণা কি যেন বলতে চায়। সমীর দেখেছে ওর চোখে মুখে অসহায় আর্তি! যে জীবনকে একদিন পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল করুণা কিসের আলো ভেবে আজ অনেক বেদনায় বুঝেছে সেটা আলো নয়, আলেয়া। শুধু চোখই ধাঁধায় আর পথ হারিয়ে যেতে বাধ্য করে। করুণা আজ পথ হারিয়ে—অনেক বেদনায় ঘুরে মরছে।

সমীর ওকে কি বলতে চায়। হয়তো মনে হয় যে পাঁকের অতলে ডুবছে তারা, তারই থেকে দুজনে একসঙ্গে বেঁচে উঠতে চায়। মনের সহযোগ এতটুকু ভালবাসা আর আশ্বাস হারিয়ে বাঁচার চেষ্টা করবে তবু। কিন্তু চলতে পারে না।

—চলে যাচ্ছো ?

করুণা হাসল, ম্লান একটু হাসি।

—হ্যাঁ।

করুণা তার জীবন থেকে বোধ হয় হারিয়ে গেছে। সমীরের অন্তরের সব সম্পদ শক্তিও যেন হারিয়ে গেছে তার সঙ্গে সঙ্গে।···

বইখানা হাতে নেয় সমীর। পড়তে হবে তাকে। চঞ্চলের সব গ্লানির সরিকান সেও। এই চঞ্চলকে সেই-ই একদিন বাঁচিয়ে ছিল। দেখতে চায় তার সব আঘাতের শেষ কোনখানে!

চঞ্চল অনেকদিন আর আসে নি এখানে। প্রতিমার খবরও জানে না সমীর। দু একজনের মুখে শুনেছে মাত্র। কল্যাণী একদিন বলেছিল ওকে।

—একবার খবর নে বাবা।

সমীরের প্রবৃত্তি হয় নি। তার নিজের একটা মতবাদ আছে। তার জন্য অনেক ত্যাগ করেছে। কিন্তু চঞ্চল—প্রতিমা কঠিন আঘাত তাকে দিয়েছে, সুষমার দিকে চেয়েও সেটা কতবড় তা অনুভব করেছে সমীর। আর সেটাকে দ্বিগুণ করে পেতে চায় না। বলে সমীর।

—ওটা পারবো না মা। তুমি আমায় মাপ করো। অনেক সয়েছি—ও নিয়ে আর কথা বলো না, ওসব ভুলতে চাই।

কল্যাণী চুপ করে যায়।

তবু মায়ের মন বাধা মানে না। কে জানে প্রতিমার কি সংবাদ। তিমিরং ক'দিন আসে নি। মনে হয় তার অদৃষ্টই এমনি। কি একটা অভিশাপে সে জর্জর।

সুষমার জীবনেও শান্তি আসে নি। অনেক আশা নিয়ে সে ঘর পেতে ছিল আজ সুষমার জীবনেও এসেছে পুঞ্জীভূত আঘাত আর অবহেলা। তবু বাঁচতে চেয়েছে সুষমা। এত আঘাত অবহেলাতেও সে মরে নি।

বেবীও বড় হয়েছে।···সুষমা তার বাড়িতেই গানের ক্লাশ বসিয়েছে, তাছাড় সহরে কয়েকটা টুইশানি করে, যা পায় তাতে মা মেয়ের চলে যায়। তবু শান্তিতে আছে, প্রতিমাকে নিয়ে চলে যাবার পর দু-একবার এসেছিল চঞ্চল! হঠাৎ আজ আসতে দেখে ওর দিকে চাইল। এ যেন উদ্ধত একটি মানুষ। কালো চশমার আড়ালে চোখের সেই চকচকে ভাবটা ঢেকে রাখে, সুষমার চোখকে তবু সে ফাঁকি দিতে পারে নি।

অত্যাধিক অত্যাচারে চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেছে, চোখের কোলে জমেছে কালির দাগ। যৌবন তার চলে গেছে অনেক আগেই, তবু সেজেগুজে জোর করে সেই চির যৌবনকে সে আটকে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু তার সেই প্রসাধনের আবরণ ভেদ করে বিগত যৌবনের চিহ্নটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সুষমা হারানো সেই মানুষটাকে দেখছে। ওর কাছে আজ তার সব প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

চঞ্চল বলে।

—টাকাকড়ি কিছু রেখে দাও।

সুষমা সঙ্গে ওর আর কোন সম্পর্ক নেই, শুধু ওইটুকু ছাড়া।

সুষমা জবাব দেয়।

—টাকার দরকার হবে না।

চঞ্চল একবার ওর দিকে চাইল। ও যেন সুষমার কাছ থেকে এই কথাটা শুনবে আশা করে নি। টাকার জন্যই ওদের সম্পর্ক এই তার কাছে ছিল পরম সত্য, সেই-খানেই আঘাত দিয়েছে সুষমা। তবু সুষমা আন্তরিকতা ভরা কণ্ঠে বলে। শরীরের দিকে নজর দিও। বয়স বাড়ছে এত অনিয়ম করো না।

চঞ্চলের কাছে এটাও বিচিত্র ঠেকে। সুষমার এই কথাগুলোর অন্য একটা সুর ওঠে। প্রচ্ছন্ন বেদনার সুর।

চঞ্চলের অসহ্য ঠেকে। কেমন সব গুলিয়ে যায় তার কাছে। মাঝে মাঝে মনে হয় যা ভেবেছে সে—তার চারপাশকে যে পাঁকে ভরা দেখেছে সেটা সবখানে সত্যি নয়।

তাহলে কি ভুল করেছে? মানুষ এখনও কোন কোন কোণে তার হৃদয়ের প্রীতি ভালোবাসা আর প্রেমকে গোপনে সঞ্জীবিত করে রেখেছে? না!

······এ দুর্বলতার।

চঞ্চল বের হয়ে আসে। সুষমা বলতে চেয়েছিল ও খেয়ে যাক। বেবীর সঙ্গে দেখা

হবে। কিন্তু চঞ্চল কোথাও বাঁধা পড়তে চায় না, তাই বোধহয় পালিয়েই গিয়েছিল সেদিন ভীত তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মতো।

সুষমার মনের সেই জ্বালাটা কমে গেছে, আজ সে বেদনা বোধ করে ওই মানুষটার জন্য। কি এক দুর্নিবার জ্বালায় ও নিজেকে জ্বালিয়ে তুলেছে। তাই নোতুন বই-খানাও আনিয়েছে সে লাইব্রেরী থেকে।······পড়তে থাকে।······তার ছত্রে ছত্রে সেই ব্যর্থতার বেদনাই মুখর হয়ে উঠেছে।

তার কাছে ওই বই-এর চরিত্র অনেকেই পরিচিত, ওই পরিবেশটাকে ও চিনেছে সে কিন্তু বিচিত্র ঠেকে তার কাছে, শুধু পাঁক আর পাঁক। তার নিজের চরিত্রেও সেই পাঁককে দেখেছে, একটি মানুষ শুধু ভালোবাসতে চেয়েছে, কিন্তু মনের সেই গ্লানি অভিমান তাকে সুস্থ ভাবে বাঁচতে দেয় নি, ভালোবেসে নিজেকে ভুলে যা পেয়েছে তাই নিয়ে সুখী হতে পারে নি। তাই সে খুঁজেছে নারী আর নারী।

······সেই জ্বালাকে ভুলতে চেয়েছে সম্ভোগের মধ্যে, মদের নেশায় ডুবে নিজেকে ভুলতে চেয়েছে।

কোথায় তার মনের অতলে একটা পাপ বোধ তার সব দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। এ গ্লানি তার সহজাত, মা! মাকেও মনে পড়ে না তার, কোন স্নেহময়ী মূর্তি রূপ—বাবাকে দেখে নি কোন শ্রদ্ধার চোখে। শিশু মনের কোণে জমে ওঠা সেই আঘাতের জ্বালাকে উদ্ধত যৌবন আর জ্বালিয়ে দিয়েছে।

সুষমার মনে হয় মানুষ বোধ হয় ভালবাসতে ভুলে গেছে তার দেহটাই তার কাছে সব। নীতিবোধও ভুলে গেছে তাই চরিত্র তার কিছু নেই। একটা খড় গোঁজা মানুষ কোনরকমে পথ চলছে।

আজ আর কেউ না বুঝুক সুষমার মনে হয়েছে কোথায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে আসছে চঞ্চলের মনের একটা দিক। দেহের যেমন ক্ষয় রোগ ঘটে মনেরও তেমনি ক্ষয় আছে। সেটাও একটা রোগ।

···আজ সুষমা সেই পরিবেশ থেকে সরে এসে নিজের পরিশ্রমে সমাজে বাস করে ওই রোগটাকেই স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। তাই শিউরে উঠেছে। প্রতিমার কথা মনে পড়ে, বেশ বুঝছে সুষমা এমনি একজনের কাছে থেকে কোন নারীই সুখী হতে পারে না, ও পারে না। তাই বেদনাবোধ করে সুষমা ওই প্রতিমার জন্য।

এত জ্বালার মধ্যেও কিছু মানুষ সব ভুলে আনন্দেই থাকে। তার এই যন্ত্রণার জগতের জীব। শ্রীদাম—তিনকড়ি ভালোই আছে।

নন্দসাহুর ঘাটের কাছে এখন ওদের স্থায়ী আড্ডা বসে। শহরের অন্ধকার জীবনের নায়কদল এখন পুরো যাত্রার রাজ্য চালাচ্ছে।

কদমের দোকানে ওরা চা খেতে বসে। কদমের ভালো লাগে না, কোনদিন ওরা যেন তাকে কোণঠাসা করে এনেছে। তিনকড়ি তবু মেয়েটাকে হাতে আনতে পারে নি ওর দেহের উপর তার একটা নেশা এসে গেছে। সেদিন শেষ চালটাই দিয়েছে

তিনকড়ি।—ওটা মিউনিসিপ্যালিটির জায়গা, পারঘাটের যাত্রীদের জন্য একটা শেড তুলতে দেবে, ওটা ছেড়ে দে কদম।

কদম জানতো এমনি একটা আঘাতই আসবে! মনে মনে সে তৈরীই হয়েছিল। তবু বলে।

—এতকাল খাজনা দিয়েছি, বসবাস করেছি এমনই ছেড়ে দোব? তিনকড়ি ওর দিকে চেয়ে থাকে। আবছা আলোয় ওকে দেখছে সে তৃষিত চাহনি মেলে। ওর কি এমন সম্পদ আছে যার জন্য এমনি করে সব ত্যাগ করে চলেছে কদম, জানে না সে। বাজারেও মেয়েদের দেখেছে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়েই তাদের দেহটা কেনা যায়। আর এই কদমকে দেখছে—সম্পূর্ণ আলাদা এক নারী।

তিনকড়ি বলে।

—শোনা কথায় না গেলে অন্য পথই দেখতে হবে। অবশ্য তোর উপরই সব নির্ভর করছে।

এক্ষুণি তুই ইচ্ছে করলে সহরের মধ্যেই বাড়ি ঘরের ব্যবস্থা করে দোব। গঙ্গার ধারে এমনি ঝুপড়িতে পড়ে থাকবি কেন?

কদমের মনে হয় কেটলির ফুটন্ত জলটাই ওর গায়ে ছিটিয়ে দেবে। মনের রাগ চেপে তবু হাসবার চেষ্টা করে কদম।

—তখন যে পাঁচ ভুতে লুটে খাবে গো! তবু শ্মশানের কাছে আছি কাক শকুনিতেই নজর দেয়, তাও সওয়া যায়। বাবুদের নজর যে খুব খারাপ গো!

তিনকড়ি কথাটা শুনে চুপ করে গেল। মেয়েটাকে সে কোনমতেই পথে আনতে পারে না। উঠে গেল ওদিকে।

শ্রীদাম হাসছে।

তিনকড়ি বলে—বল। মাগীটা বজ্জাত বুঝলি? মহা ঠ্যাঁটা! সতী! ছিনেলের শেষ। এইবার একদিন মোক্ষম ঘা দোব—বুঝবে তখন!

…ওরা রাতের অন্ধকারে ঘুরছে তৃষিত প্রাণীর মতো। এত মদ আর নারীমাংসে সে তৃষ্ণা মেটে নি। দিনের আলোয় সেই সমাজ-সেবীর মুখোস খুলে গেছে। ওরা এখন অন্য জীব।

তিনকড়ি গজগজ করে।

—মাগীটার পরামর্শদাতা ওই বুড়ো ভাম। বুঝলি ছিদে—

—বুড়ো ভাম! ছিদে ঠিক বুঝতে পারে না।

তিনকড়ি এসব খবর নিয়েছে। সহরে কিছু লোক তার বিরুদ্ধে মাথা তুলছে। এইবার ইলেকশনে তিনকড়ির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল ও পাড়ার সত্যবাবু, তার হয়ে ক্যানভ্যাস করেছে সমীর এমন কি সদানন্দবাবু নিজে। সহরের বিভিন্ন মহাল্লায় তারা তিনকড়ির নামে অনেককিছুই বলেছে। তিনকড়ির রাতের ব্যবসা মায় শ্রমিক-সমিতির নামে কি অপকর্ম করে সমীরও সেটা প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে বলেছে।

তিনকড়ি এসব করে। টানা মালের কারবারও করে; নন্দসাহুর গুদোমে পাকিস্থান থেকে আমদানী মালপত্তর রাখে সে, সুপারীর বস্তাগুলো তারই।···আরও অনেক মাল আসে যায়; কিছু লোককে সে পোষে এমনি করে, তাছাড়া সেই লোকগুলোর ভয়েই পাট-কলের অনেক আন্দোলন বানচাল হয়ে যায়। তার বিনিময়ে বেশ কিছু থোক টাকাও সে নেয়।

কিন্তু এসবের মাঝে অন্যায় সে কিছু দেখে নি। ওরা তার বিরুদ্ধে এই সব কথা বলেছিল, শেষকালে তিনকড়িই বেশ কিছু টাকা দিয়ে ওদের দলের কিছু ছেলেকে টেনে নেয়, এখান ওখানে চাকরীও করে দিয়েছে। তারা এখন তিনকড়িরই বাহন।

এইবার তিনকড়ি ওই সমীর সদানন্দবাবু সত্যবাবু আরও অনেককে দেখে নেবে। স্কুলকমিটির প্রেসিডেণ্ট হয়েছে এইবার।

তিনকড়ি তাই শ্রীদামের কথায় বলে।

—বুড়ো ভামকে চিনিস না! ওই যে জ্ঞানের সাগর সদানন্দ। বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছিস তো—উনি আবার জ্ঞানের সাগর। সবাইকে জ্ঞান দিচ্ছেন। এইবার আমিও ওকে জ্ঞান দোব।

মাগীটার সঙ্গে খুব ভাব!

ছিদে অবাক হয়—কি বলছিস?

হ্যাঁ! বুড়ো হলে কি হবে! এদিকে ঠিক আছে। চিরকুমার—ত্যাগী—ধ্যাৎ, অমন চিরকুমার আম্মোও। গেট আউট করে দোব ওই স্কুল থেকে, লীলাখেলা বন্ধ করে দোব।

তিনকড়ির ওই দোষ। পেটে মদ পড়লে মনের সব কথাগুলো বের হয়ে আসে কেঁজকুড়ির মতো। মনের গরলটা বুক ঠেলে ওঠে।

সমীর বইটি পড়েছে। চঞ্চলের নোতুন সেই বই।

সারাদিন ধরে ওটা পড়ে শেষ করেছে। সারা মনে নীরব একটা জ্বালা, চঞ্চলের অন্তরের সব গরল যেন ওই লেখার মধ্যে ছিটিয়ে আছে, এতদিন যাদের দেখেছে যাদের কাছে কোন উপকার পেয়েছে সে—তাদেরও বিশ্লেষণ করেছে তার ওই জঘন্য দৃষ্টি-কোন থেকে।

তার কাছে সমীর অপদার্থ একটা ক্লীব, সদানন্দবাবু একটা ভণ্ড জীব; ওই দামও তাই। সুষমা একটা দেহসর্বস্ব নারী; প্রতিমা যেন একটা মেতে ওঠা কুকুর —আর নিজেও সে মনুষ্যেতর কোন প্রাণী।

···এমনি করে গলে পচে মরতে কোন মানুষকে দেখে শিউরে উঠেছে সমীর। বিশ্বাস হারিয়ে—শ্রদ্ধা হারিয়ে—ভালোবাসা হারিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা কি অপরিসীম যন্ত্রণা সেটাও তার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

সদানন্দবাবুও বলেছিলেন তাকে এই বই-এর কথা। করুণা কেন সমীরকে এই বইটা দিয়ে গেল তা ঠিক বোঝে নি সমির। আজ মনে হয় করুণার জীবনের এমনি

অন্ধকার নেমেছে চারদিক থেকে। তবু কোথায় সে বাঁচার স্বপ্ন দেখে, নোতুন করে আবার মানুষের পরিচয়ে বাঁচবে সে।

তাই এই লেখার মধ্যে দেখেছে শুধু দেহবাদ—তার উর্ধ্বে—তার বাহিরে যে চিরন্তন মানুষ আজও বেঁচে আছে—সেই সত্যের চরম অবমাননা করেছে চঞ্চল।

করুণা তাই সহ্য করতে পারে নি। সে যে ওই দেহটাই সব নয়—এটাকে অস্বীকার করে সেই ব্যথাটাই জানাতে চেয়েছে করুণা আর কারোও কাছে নয়—সমীরের কাছেই তার কাছে করুনা নিজেকে এত নীচে নামাতে চায় না।

·· সমীর কি একটা নীরব উত্তেজনা নিয়ে বের হয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। করুণার বাড়িতে আসে বহুদিন পর। আজ তাকে যেন নোতুন করে চিনেছে সে।

করুণা এসময় বাড়িতে থাকে না। ও জানে না আজ সমীর আসবে, তাহলে থাকতো। কলকাতায় বের হয়ে গেছে। সমীরের বন্ধুবান্ধব বিশেষ নেই। আরও পাঁচজনের মতো সে কোথাও আড্ডা মারে না। তাই এগিয়ে চলে। তার মনের এই বেদনার উপলব্ধিটার কোথাও প্রকাশ চায় সে।

···সদানন্দবাবুর ঘরে আলোটা জ্বলছে।

বৃদ্ধ সন্ধ্যা পুজা সেরে কি কাগজপত্র নিয়ে বসেছেন। সমীরকে ঢুকতে দেখে ওর দিকে চাইলেন।

—এসো, সমীর!

সমীর বইখানা এগিয়ে দিয়ে বলে।

—পড়েছেন এটা! নোংরা আর পাঁকের অতলেই মানুষ তলিয়ে যাবে! এ বাইরে আর কি কিছু নেই?

সদানন্দবাবু পড়েছেন ওটা। তিনি এখনও সবকিছুই পড়েন। সমীরের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে তিনি ওর দিকে চাইলেন। স্তব্ধতা নেমেছে ঘরে। এদিক নির্জন। জানলার বাইরে দেখা যায় অন্ধকার আকাশটা, ওপাশের গাছগুলো কালো ছায়া অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

সদানন্দবাবুও ভেবেছেন কথাটা। তার অভিজ্ঞতা দিয়ে এটাকে বিচার করেছেন কোন জ্বালা নেই—শুধু তার মনে হয়েছে চারিদিকে যে অবক্ষয় আর উন্মাদনা দেখেছেন, সেটার স্থায়িত্ব নেই। ওটা সাময়িক একটা বিকৃতি আর হতাশা জ্বালা!

মানুষ এ নিয়ে বাঁচতে পারে না! এই রোগ তার একদিন ঘুচবেই। তা বলেন।

—জীবনে ওর কোথায় একটা দারুণ বঞ্চনা রয়ে গেছে সমীর, তাই এত ঘৃণা ওর মনে। জীবনে মহত্ত্বকে দেখবার চোখ তার নেই—ভালবাসাকে স্পর্শ করার চেতনা তার হারিয়ে গেছে। অর্থ মোহ আর স্তাবকতাই তাকে রঙ্গীন একটা জগতে

নয়ে গেছে। কঠিন আঘাতে যেদিন সেই মন ভেবে যাবে—সেদিন ওর চমক ভাঙবে। ততদিন ওকে ফেরানো যাবে না।

—তবে কি মানুষ মরে যাবে! সমাজের সর্বাঙ্গে এমনি গলা পচা কতকগুলো জীব ঘুরে বেড়াবে?

সদানন্দবাবু জানে না এর জবাব। তবু মনে হয় মানুষ বহু বেদনায় এই কঠিন সত্যটাকে একদিন চিনবেই। মনুষ্যত্বকে সেদিন আবার মর্যাদা দেবে। ওরা ভয় করে মানুষের কল্যাণ চেতনাকে তাই স্বার্থান্ধ কিছু মানুষ তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষের সেই নৈতিক চেতনার আলোটাকে বার বার নিভিয়ে দিতে চাইবে, চোর মন চায়—দিনের আলো নয়, রাতের অন্ধকার। ওরা তেমনি জোর গলায় প্রমাণ করতে চাইবে মানুষ কোন সুস্থ প্রাণী নয় জানোয়ার মাত্র। তার সৎ-বৃত্তিগুলোই তার মানসিক বিকার। আসলে সে কঠিন নির্মম ভোগী একটা জাত। এই নিয়েই তাদের প্রাধান্য।

রাত হয়ে আসে। সদানন্দবাবু বলেন।

—চল একটু ঘুরে আসি। ওনিয়ে ভেবো না সমীর। করার কিছু নেই—যে যার পথে চলে চলতে দাও।

—তাই বলে চুপ করে থাকবো?

—এতবড় পৃথিবীও সর্বংসহা। দিনের আলোয় সে খুশী হয়, রাতের অন্ধকারে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে না, তাকে ও সহ্য করে দিনের আলোর জন্য তপস্যা করে।

গঙ্গার প্রশস্ত বুকে রাত্রি নেমেছে—তারাজ্বলা রাত্রি। কদম চুপ করে বসে আছে। পারঘাটের ভিড় কমে এসেছে। হঠাৎ সদানন্দবাবু আর সমীরকে এসময় দেখে বলে কদম।

—এতরাত্রে?

সদানন্দবাবু হাসেন।

—এলাম মা। সারাদিন বদ্ধ ঘরে ভালো লাগে না। তোমার খবর কি?

—এইবার নোটিশ এসেছে বাবা!

—নোটিশ! অবাক হন সদানন্দবাবু—কিসের নোটিশ?

—এজায়গা থেকে উৎখাত করে দেবেন বলে গেলেন তিনুবাবু।

সদানন্দবাবু বলেন।

—তুই একটা দরখাস্ত সই করে দে। আমি দেখছি। আজই করে দিবি—এবার আর সদানন্দবাবু তিনকড়ির কাছে যাবেন না। নিজেই যাবেন চেয়ারম্যানের কাছে।

সদানন্দবাবু রেগে উঠেছেন, দিন দিন তিনকড়ি শ্রীদামের দলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তার কাছে আসছে। রাজনীতিতে জড়াতে তিনি চান নি। কিন্তু মানুষের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার করতে গেলেই সে রাজনীতির কথা আনে তারা।

সদানন্দবাবু সমীর আরও অনেকে চেয়েছিল তিনকড়িদের অত্যাচার থামাতে।

আজ একে উৎখাত করছে, কালো বাজার—অত্যাচার আর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিমূর্ত হয়ে উঠেছে আজকের দিনে ওরা। মুখে ওরাই দেশসেবার নীতি আওড়ায় অ জড়িত কণ্ঠে কথা বলে, কাদের সর্বনাশের কথা।

সদানন্দ বলেন।

—একটা দরখাস্ত খসড়া করে দাও সমীর, ও সই করে দিক। দেখি একব শেষ চেষ্টা করে।

রাতের অন্ধকারে চলেছে ওরা স্কুল বাড়ির দিকে। গ্রীষ্মের শেষ। আকা থমথম করছে কালো মেঘের ছায়া, সব তারাগুলোও ঢেকে গেছে কি গভীর হতাশায় বাতাসটুকুও যেন থেমে গেছে—স্তব্ধ হয়ে এসেছে। বোধহয় ঝড় উঠবে।

দূরে উঁচু রেললাইনের ধারে সিগন্যাল পোস্টের লাল আলোটা জ্বলছে। হঠ কাদের সামনে দেখে দাঁড়ালেন সদানন্দবাবু। কলোনীর দিক থেকে আস অন্ধকারে দুটি ছায়ামূর্তি'র মতো শ্রীদাম আর তিনকড়ি। ওদের দেখেই দাঁড়া তারা; তিনকড়ি পা টলছে—জড়িত কণ্ঠস্বরে বলে ওঠে কদমকে দেখে।

—এ্যাঁ, ঘোমটার ভিতর খ্যামটার নাচ চলেছে কদম। আবার সতীপ ফলানো হচ্ছে? তা বুড়োর সঙ্গে রাতবিরেতে পিরীত করছিস কর। আমর কি ফ্যালনা?

সদানন্দবাবু ইঙ্গিতটা শুনেছেন। চমকে ওঠেন তিনি। কদমের দু চোখ জ্ব ওঠে। ও জানে তিনকড়ি আজ কি বলতে চায়। ওদের নজরে পড়ার পর থেকে কদমের সব গেছে—তবু কদম নিজের ইজ্জৎ বিকিয়ে দেয় নি, আজ ওরা ওকে জড়ি শ্রদ্ধেয় ওই লোকটির নামেই চরম কলঙ্ক রটাবে। ওরা শক্তিমান—এর ফল দাঁড়াবে তা অনুমান করে কদম। আর্তকণ্ঠে বলে কদম।

—তিনুবাবু!

তিনকড়ি বুঝতে পেরেছে কোথায় ওর দুর্বলতা। ওকে এইবার হাতে পেয়ে সে। হাসছে তিনকড়ি।

—তাই বলি, এত ডাঁট তা নাগরটি কে? বলিহারী যাই কদম। বাঃ—

সমীর কথাগুলো শুনেছিল—রাগে জ্বলে ওঠে সে। এগিয়ে এসে দাড়াল। বলিষ্ঠ দীর্ঘ চেহারা, সারাদেহ কঠিন হয়ে উঠেছে ওই চরম জঘন্য কথাগুলে শুনে। গর্জে ওঠে সমীর।

—তোমার মুখ ভেঙ্গে দোব তিনু! আর একটিবার উচ্চারণ করে দেখ কি হয়!

সমীর এতদিন ধরে শুধু সহ্য করেছে, অনেক সয়েছে! তিল তিল করে জ ওঠা সেই গ্লানি আর প্রতিবাদের কাঠিন্যে ফেটে পড়ে। তিনু এমনি কঠিন বা পাবে ভাবে নি। হকচকিয়ে যায় সমীর গর্জাচ্ছে।

—নিজেরা তো জানোয়ারই হয়ে উঠেছো। তাই বলে ভেবেছো সবাই তোমাদের তো জানোরার?

সদানন্দবাবুই সমীরকে রুখে দাঁড়াতে দেখে এগিয়ে যান। ওকে থামাবার চেষ্টা রেন।

—যেতে দাও সমীর।

সমীরের সামনে থেকে সরে যেতে পেরে তিনকড়ি একটু নিশ্চিন্ত হয়। সমীরের ঙ্গে ওর অনেকদিন ধরেই মন কষাকষি চলেছে। ওদের কারখানার ব্যাপার নিয়ে তনকড়িই শ্রমিকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তাছাড়া চঞ্চলের বন্ধু তারা। মীরের মনে একটা ধারণা হয়ে গেছে চঞ্চলের এই সব নোংরামির জন্য ওরাও য়ী।

তিনকড়ির নেশাটা ছুটে গেছে। তার মনের অতলে শয়তানের মন জেগে ওঠে। কেবল ছোবলই দিতে পারে! বলে চলেছে।

—দেখলি ছিদে ছুঁড়ির ব্যাপারটা। আর বুড়োকেও দেখিয়ে দোব কত ধানে ত চাল। ইস্কুলের মতো পবিত্র জায়গায় কিনা এই সব নটীপনা।

শ্রীদাম গরজাচ্ছে—মারতে আসে! জানে সমীর কাদের গায়ে হাত তুলেছিল। াব একদিন খেয়ার টিকিট কাটিয়ে! গুপেকে লেলিয়ে দোব এইবার!

ওরা তা পারে। রাতের অন্ধকারে ওদেরই রাজ্য এখানে। এসব কাজ তাদের ক্ষে অতি সহজ।…মদের নেশাটা কেটে গেছে ওইসব গোলমালে। তাই ওরা াবার মদের সন্ধানেই চলেছে। রাতের পারঘাটে নন্দসাহুর কারবার ঠিকই চলেছে। ীকা থেকে বস্তাগুলো নামছে, লরীতে তুলে নিয়ে চালান দেবে কলকাতার দিকে, ছু মাল থাকবে তার গুদামে। চাল! বস্তা বস্তা চাল আসছে।

নন্দসাহু ওদের দুই মূর্তিকে দেখে একটু অখুশী হ'ল। টাকা দেয়—তাই ল কারবারের সব তাতেই তারা নাক গলাবে এটা সহ্য করতে পারে না। তবু কাশ্যে বলার কিছু নেই। ওদের দিকে চেয়ে থাকে। ছিদাম বলে—আছে কিছু াহুজীর।

ওদের ঠাণ্ডা করবার জন্য সাহুজীকে বোতলের ব্যবস্থা রাখতে হয়। দুটো াতল আসতেই দুজনে গিয়ে বটগাছের নীচে বসল। এদিকটা অন্ধকার। নন্দসাহু তের বেলায় ইচ্ছে করেই আলোটা নিভিয়ে রাখে।

কদম বুঝেছে ব্যাপারটা এইখানেই থামবে না। সদানন্দবাবু জানেন না ওই নকড়ি শ্রীদামের কলের ক্ষমতা। সব শুভবুদ্ধিকে ওরা হারিয়ে দেবে। সমীর দর মারতে গিয়েছিল, তিনকড়ি—সেটা চুপ করে সহ্য করবে না। কদম জানে দর দলবলের কথা; যে কোন মুহূর্তে সমীরকে তারা বিপদে ফেলবে, চাকরী য়েও টানাটানি হবে তার, এমনকি তার প্রাণও নিতে পারে তারা।

এসব সর্বনাশের মূলে কদম নিজেকে এভাবে জড়াতে আর চায় না! এখানে

বাস করার সাধ তার ফুরিয়ে গেছে। যে পরিবেশে এতদিন এখানে বাস করেছে
সেই সুন্দর আবহাওয়াটাকে এরা বিষাক্ত করে তুলেছে। কদমের নিঃশ্বাস নি
যেন কষ্ট হয়।

এখানে নয়—যেখানে হোক চলে যাবে। সেই বাউলের কথা মনে পড়ে। এত
পৃথিবীতে সে একা। তবু আনন্দের মাঝে কিরকম আনন্দময়ের সন্ধান করে চ
এই পৃথিবীর পথে পথে।

সেও একদিন বের হয়েছিল। লালমাটি-শালবন সীমার প্রান্তে অচেনা দি
সে তার রুদ্ধ মনকে মুক্ত করেছিল কোন আনন্দের জগতে।

…আজ সেই দিনগুলোই বার বার মনে পড়ে।

অন্ধকারে কোথায় আকাশকোলে বিজলীর চমক ওঠে। কদমের মনে হয় এখ
আর নয়—অন্য কোথাও চলে যাবে সে। ওই হিংস্র মানুষগুলোকে আজ স
অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে।

নিজের উপরই রাগ হয়। নিজের এই দেহটাকে অনেক যত্নে সে আগলে রেখেছি
কিন্তু কি এর দাম! শ্মশানের চিতায় দেখেছে কত দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গে
দেহের উর্ধ্বে আছে মন, সেখানে কালো দাগ তবু লাগে নি।

তাই অর্থহীন মনে হয় এটাকে…তার ঝুপড়ির দিকে ফিরছে। মাঝে ম
মেঘ ডাকছে, নীরব প্রকৃতির সব স্তব্ধতাকে কি প্রচণ্ড হুঙ্কারে শাসাচ্ছে
বিজলীর আভায় দেখে চাতালে বসে আছে দুটি প্রাণী।

তিনকড়ি ওকে দেখেছে। হাসছে, মদের নেশাটা আবার মিষ্টি আমেজ এ
মনে।

—কিরে ফিরলি—এ্যাঁ! তা বুড়ো কি বলে? আর ওই ছোঁড়াটা? ওর
হয়েছে। বলে দিস ঢাকি ঢুলি এক সঙ্গেই বিসর্জন করে দোব।

বুঝলি ছিদে—বলে দে গুপেকে।

কদম জানে ওদের সেই দলের কথা! কদম তার মন স্থির করে ফেলে
এগিয়ে আসে ওদের দিকে। দূরে শ্মশানে একটা নিভু নিভু আগুন দেখা যায়।
দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। নিজের দেহটার উপর আজ তার কোন মোহ নেই।

এগিয়ে আসে কদম। তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে।

—কি পেলে খুশী হবে তিনুবাবু? তোমার মা বোনের কথাও মনে পড়ে ন
তেমন কি কেউ ছিল না তোমার? বাবার জন্য এতটুকু শ্রদ্ধা নেই!

তিনকড়ি এসব কথা শোনে নি। মেয়েটা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিজলী
আলোয় ওকে দেখা যায়, চোখ দুটো জ্বলছে। ঝড়ো বাতাসে ওর গায়ের কা
উড়ছে, অনাবৃত দেহটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। উড়ছে ওর মাথার এলো চুল। ক
কঠিন একটি রহস্যময়ী নারী, তাকে কি সর্বনাশা অতলের দিকে আহ্বান কর
তীব্র ঘৃণা নিয়ে।

—এই দেহটা পেলে খুশী হবে ? ওই ভালো মানুষগুলোকে তুমি নিষ্কৃতি দেবে ? বলো তিনুবাবু : ওরা বাঁচুক—শান্তি পাক। বলো আমার এই দেহটাকে শ্যাল কুকুরের মতো তুমি ছিঁড়ে খেয়ে যদি খুশী হবে।

তিনকড়ির নেশা মাথায় উঠে গেছে। কোন মেয়েকে এত জ্বালা আর ঘৃণা ভরা চোখে তার দিকে চাইতে দেখে নি। ওর দিকে এগোনো যায় না, ওর মাঝে আছে ধ্বংস আর মৃত্যু !

তিনকড়ি চকিতের জন্য শিউরে উঠেছে। কদম নয়—অভিশপ্তা রুদ্রা কোন পৃথিবী যেন অসহ্য জ্বালায় ঝড়ের মত্ততা নিয়ে জেগে উঠেছে।

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ঝড় উঠেছে, ফুলে উঠেছে নদীর জল। মত্তগর্জনে অন্ধকার দিগন্ত মেতে উঠেছে ধ্বংসের নেশায়। তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ওই বিচিত্র সৃষ্টির রহস্যরূপিনী কোন নারী।

তিনকড়ির সাহস নেই—সে ভয় পেয়েছে। চাতাল থেকে উঠে পড়ে পিছিয়ে আসে। কোথায় বিরাট আর্তনাদ করে একটা প্রকাণ্ড ডাল ভেঙ্গে পড়ল। লাইন ফিউজ হয়ে গেছে। চারিদিকে নেমেছে অন্ধকার, নদীর বুকে মত্ত গর্জনের সঙ্গে বৃষ্টির ধারা নেমেছে।

ভীত ত্রস্ত দুটি মানুষ সরে গেল—ওরা দৌড়চ্ছে। সহরের দিকে পালাচ্ছে তিনকড়ি আর শ্রীদাম।

কদম তখনও দাঁড়িয়ে আছে। তার যেন চেতনা নেই। সারাদেহ মনে কি তীব্র জ্বালা। চোখের সামনে দেখে বিশাল প্রকাণ্ড সেই ডালটা ঝড়ের বেগে ভেঙ্গে পড়েছে তার সেই পুরোনো ঝুপড়ির উপর। ওটার জন্যই তার মায়া এমনি উম্মাদনা।

এক নিমেষে সেটা কোন নিষ্ঠুর বিধাতা চূর্ণ করে দিয়েছে। বৃষ্টির অঝোর ধারায় ভিজছে কদম, তার দেহমনের সব জ্বালা শান্ত হয়ে আসে, মনে হয় বৃষ্টির ধারায় স্নান করে পাপমুক্ত মোহমুক্ত হয়েছে সে।

…চঞ্চল ফিরছে কলকাতার দিকে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে তাই এত আলোর বাহার। চঞ্চল আজ দেখেছে সুষমাকে তার মেয়েকে। কই তারা তো তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তার দেওয়া টাকাও নেয় নি।

সুষমা কিছু চায় নি, বেবী অনেক বড় হয়েছে। কচি মুখখানায় কি লাবণ্য—ওকে দেখে মনে হয় তার হারানো যৌবনের কি মাধুর্য আজও অক্ষয় হয়ে রয়েছে কি স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আর প্রসন্নতা নিয়ে। এত কঠিন পৃথিবীতে তবু কোথায় আজও রয়ে গেছে প্রীতি ভালোবাসা।

সেটা অন্ধকার অতলে ধ্রুবতারার মতো জেগে থাকে, মেঘে ঢেকে যাক—তবু সে মেঘের আড়াল থেকে বের হয়ে আসে আবার। চঞ্চলের সে চোখ নেই।…তাই দুরন্ত জ্বালায় সে জ্বলছে।

কি পেয়েছে।…খ্যাতি প্রতিষ্ঠা—অর্থ। তা সে পেয়েছে। কিন্তু তার কি

দাম! কি সে চেয়েছিল! এই সব! কিন্তু মনে হয় ভুল করেই সে চেয়েছিল। এই সব! কিন্তু মনে হয় ভুল করেই সে চেয়েছিল। কি তার আসল চাওয়া তা জানে না। তাই খুঁজতে গিয়ে কেবল অসার পাওয়ার বোঝা ভারি করে সিন্দাবাদের মতো তারই চাপে নুইয়ে পড়েছে।

আজ সে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত! সুষমা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে জানিয়ে দিয়েছে সুষমা তার বাড়িও ছেড়ে দেবে। অন্যকোথায় ঘর পেয়েছে সেইখানেই চলে যাবে। নীরব অবহেলায় সুষমা আজ তার অবজ্ঞার দাম দিতে চায়।

অফুরাণ ভালোবাসাকে হঠাৎ আবিষ্কার করেছে সে, কিন্তু তার গ্রহণ করার কোন অধিকার নেই।

ট্রেনটা চলেছে। মাথার মধ্যে সেই অসহায় একাকীত্ব আজ তার সারা মন নিবিড় আতঙ্কে ভরে তুলেছে। কোথায় আকাশে জমছে মেঘস্তর। বিজলীর আলোয় দেখা যায় স্তরে স্তরে মেঘগুলো ওই আকাশের সব প্রসন্নতাকে তারার এতটুকু অস্তিত্বকে গ্রাস করতে চলেছে।

তুমি!

গাড়ীটা প্রায় ফাঁকা। প্রথম শ্রেণীর কামরায় তারা এতক্ষণ দুজন দুদিকে বসেছিল। কেউ কারো দিকে চায় নি। করুণাও নিজের চিন্তায় বিভোর চিল।

তার মনে হয় আবার সে ফিরে যাবে সেই পুরোনো জীবনে। সামান্য কিছু নিয়েই সে বাঁচবে। আজ সমীরের চোখে সে দেখেছে সে আশ্বাস।

করুণা জানতে চেয়েছিল তার দেহে ধুলো মাটি যা লেগেছে তা ক্ষণিকের ভুল। এ ছাড়া তার বাঁচার পথ ছিল না।

তার বুড়ো মা ভাইদের মানুষ করতে হয়েছে। বোনকেও বিয়ে দিয়েছে ভাল ঘরে। এখন তাই ও চাকরী পেয়েছে।

এতদিনে সে ভারমুক্ত আজ তায় নিজের কথা ভাববার সময় এসেছে। কোন সুস্থ পথ পায় নি করুণা, তাই শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে ওদের মানুষ করার জন্যই নিজে নেমে এসেছিল এই পাঁকে।

এইবার মুক্তি পাবে সে।

চঞ্চলের বইখানা পড়েছে। পড়ে শিউরে উঠেছে। সে ওই নোংরা অমানুষের জগতেই বাস করেছে এতদিন। তবু জীবন সম্বন্ধে এত কালো অন্ধকার তার মনে স্থায়ী বাসা বাঁধে নি। কিন্তু চঞ্চলের লেখা পড়ে মনে হয়েছে এ জগতে সব মানুষের মনে শুধু ওই জানোয়ারেরই অস্তিত্ব। সব আলো নিভে গেছে।

করুণা পাপপুরীতে কাটিয়েছে কত দিন, কত লোক এসেছে তার দেহটাকে উপভোগ করে তারা দিয়ে গেছে কিছু অর্থ, মাঝে মাঝে মন বিষিয়ে উঠেছে। তবু তার বিশ্বাস হারায় নি। বারবার শত দুঃখ অপমানের মধ্যেও জেনেছে—সে বেঁচে আছে আবার সুন্দর জীবনে ফিরে যাবে।

মানুষের শুভ বুদ্ধি আর কল্যাণ চেতনার উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। তাই সমীরকে আজ ভালোবাসে সে। একদিন ওই চঞ্চলকেও বেসেছিল সে, সেইটাই বোধহয় তার জীবনে সবচেয়ে দুঃখময় ঘটনা।

ওকে ভালোবাসতে গিয়েই সমীরকে দিয়েছিল নিদারুণ আঘাত, নিজেও তারই জন্য জ্বলেপুড়ে মরছে। চঞ্চলকে সহ্য করতে পারে নি। তার লেখার মধ্যে ওই মানুষটার যা পরিচয় পেয়েছে তাতে তাকে ঘৃণাই করে সে।

তারপরও দেখেছে সুষমাকে—চঞ্চল শুধু অপমানই করেছে সকলকে। ঠকিয়েছে। ওর কাছে সত্য বলে কিছু নেই, সুন্দর বলে কোন পদার্থই নেই। একমাত্র ভোগ আর অন্ধকারে হাউই-এর মতো জ্বলে ওঠা ছাড়া কোন কিছুই নেই।

·· চঞ্চলকে তাই এই ট্রেনের কামরার দেখে অবাক হয়েছে। করুণার জীবনে অনেক পুরুষই এসেছে। সে ওদের চেনে। চঞ্চলকে আজ দেখছে সে। চঞ্চলও ওকে দেখে খুশী হয়।

তার কাছে নারীদেহ সম্বন্ধে চিরকালের সেই নেশাটা মদের নেশার মতই তার দেহে মনে সাড়া তোলে। বাইরে মেঘ ঢাকা আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক তারই মাঝে ছুটে চলেছে ট্রেনটা।

—চঞ্চলই জিজ্ঞাসা করে।

—কেমন আছো ?

করুণা ওকে কাছে সরে আসতে দেখে। চঞ্চলের চোখে নীরব একটা নেশা।

জীবনে ও শুধু পেতেই চায়। কাঙ্গাল তার ব্যর্থ মন নিয়ে শুধু আনন্দ আর তৃপ্তির সন্ধানই করে। ভোগের বাসনা তার ফুরোয় নি। জীবনে ওইটুকু ছাড়া আর তার কিছু জানা নেই। তাই তার সৃষ্টির মধ্যেও সেই জ্বালা।

করুণা বলে।

—ফিরছেন ?

ঝড় উঠেছে। গাছগুলো মাথা নাড়ছে সবেগে, কি আন্দোলনে ওরা মুখর হয়ে উঠেছে। ধুলোয় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আলোটুকু ম্লান হয়ে আসে। কোন উন্মাদ যেন রুদ্ধ আক্রোশে তার নিজেরই মাথায় মুঠো মুঠো ধুলো ছিটিয়ে চলেছে আর আর্তনাদ করছে দুর্বার যন্ত্রণায়।

তারপরই বৃষ্টি নামে, আবার বৃষ্টি।

মাটির সব জ্বালা নিঃশেষ হয়ে ওঠে তৃপ্তির নিশ্বাস। মিষ্টি সোঁদা গন্ধ ওঠে। মনে হয় সব উন্মাদনার শেষে আসে যতি। সব যন্ত্রণা চোখের জলে ধুয়ে যাবার পর নামে প্রশান্তির আশ্বাস।

করুণা তার সারা মন দিয়ে ওই বৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকে।

কলকাতার রাস্তায় জল জমে গেছে। ট্রাম বাস বন্ধ। লোকজন এদিক ওদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টায়।

করুণা ভাবনায় পড়ে। চঞ্চল এদিক ওদিকে ছুটোছুটি করে একটা ট্যাক্সি ধরে ওকে ডাকছে।

—চলে এসো।

গাড়িটা পেয়ে গেছে বরাতজোরেই। তারই মধ্যে ভিজে গেছে চঞ্চল। রুমাল দিয়ে মাথাটা মুছতে মুছতে বলে চঞ্চল।

—তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাবো। বলো কোনদিকে যাবে?

করুণা একটু চমকে ওঠে। চঞ্চল হয়তো জানে না তার সব কথা। ওকে জানাতেও চায় না। করুণা বলে।

—বিডন ষ্ট্রীট চলো!

বৃষ্টি তখনও থামে নি। গাড়ির জানালাগুলো বন্ধ, কাঁচের উপর এসে পড়ছে জলকণা, ঘষা কাঁচের মতো ম্লান একটা আভাস জাগে তাতে। দুটি প্রাণী একটি ছোট সীমানার মধ্যে আবার যেন হারানো দিনে ফিরে যায়।

চঞ্চলের কাছে সুষমা প্রতিমা চ্যাড্রি মিস্ দে মিনা সেন আরও কতজন হারিয়ে গেছে। সেই যৌবনের কয়েকটা দিন মনে পড়ে। করুণাকে সে জয় করেছিল—সমীরকে কঠিন একটা সত্যকে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্যই। আজ সেই মনকে ফিরে পায় চঞ্চল। সুষমা তাকে আজ সরিয়ে দিয়েছে, প্রতিমাকে আজ অসহ্য মনে হয়। ওর লোভ আর চাওয়া অনেক বেশী। চ্যাড্রি একটা বীভৎস জীবমাত্র, ও মেয়েদের সকলেই তার চেনা। তাদের ঘৃণা করে চঞ্চল।

অনেকক্ষণ পর মনে হয় সারা শরীরের সেই জ্বালাটা বুক ঠেলে উঠছে।···সঙ্গের ব্যাগেই থাকে বোতলটা। ওটা এখন ওর নিত্যসঙ্গী! চঞ্চল ছোট বোতলটা বের করে তার থেকে গলায় ঢালতে থাকে তরল সোনালী মদটা।

করুণা ওই বস্তুটিকে চেনে। দেখেছে সুস্থ মানুষগুলো কেমন করে ধীরে ধীরে বদলে যায়। অন্তরের সেই চাপা পড়া জানোয়ারটা ঠেলে ওঠে।

করুণা জানতো না চঞ্চলের এই খবর। এখন ওটা সঙ্গে সঙ্গেই রাখতে চায়। দেখেছে চোখের কোলে কালির দাগ, হাত দুটো কাঁপছে। এ্যালকোহলিক্ হয়ে উঠেছে সে। এতদিন সে মদ খেতো, এইবার মদই ওকে খেতে সুরু করেছে।

করুণা বলে—বেশ উন্নতি করেছো দেখছি?

চঞ্চলের সেই ভদ্রতার মুখোসটা এইবার খুলে আসে। ওর দু চোখ জ্বলছে—ক্রমশঃ সেই কঠিন লোলুপ সত্ত্বাটা মাথা তুলেছে। করুণার দিকে চাইল সে। দু চোখে সেই ঘৃণ্য পাশব প্রবৃত্তি।

ওটাকে চেনে করুণা। অনেক দেখেছে। মানুষের ওই পরিচয়ে তার ঘৃণা এসে গেছে।

চঞ্চল ওর নিটোল দেহটাকে দেখছে।···কামনার সেই সরীসৃপটা অন্ধকার অতল থেকে ঠেলে উঠেছে। ওর হাতটা ধরে চঞ্চল।

—করুণা!

আজ সে পেতে চায় অনেক কিছু! একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ করুণার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। চমকে ওঠে সে। মানুষের মধ্যে এত পাপ আর লোভ দেখে সে ক্লান্ত। আজ বিতৃষ্ণা এসে গেছে তার।

—হাত ছাড়ো! করুণা কঠিন কণ্ঠে প্রতিবাদ করে।

হাসছে চঞ্চল। প্রবল লালসায় ওকে কাছে টানতে চায় সে। পকেট থেকে টাকাগুলো বের করে এগিয়ে দেয়।

—টাকা আমি দোব করুণা। এই নাও—

করুণাকে এতবড় অপমান কেউ করে নি। মেয়েদের সব কিছুর মূল্য ওর কাছে ওই টাকাতেই। তার বাইরে আর কিছুই দেখে নি সে।

করুণার অতলে যে একটা নারীমন আছে—সে ভালোবাসতে চায়, আজ নোতুন করে বাঁচতে চায়, সেটাকে সে কঠিন অপমানে জর্জরিত করে তার অস্তিত্বকে নিঃশেষে অস্বীকার করেছে। জ্বলে ওঠে করুণার নারীমন। চঞ্চল ওকে টাকাগুলো তুলে দিতে আসছে।

—নাও!...

মদ্যাপ একটি অমানুষ। করুণার সারা দেহ মন রাগে জ্বলে উঠেছে। সজোরে চঞ্চলের গালেই একটা চড় বসিয়ে দেয় করুণা। উত্তেজনা আর রাগে হাঁপাচ্ছে সে।

চঞ্চল চড় খেয়ে একটু থামল, পরমুহূর্তেই তার দু চোখ জ্বলে ওঠে। গর্জন করে সে।

—সতী! বাজারের মেয়ে ছেলের আবার সতীপনা—

—ড্রাইভার। গাড়ি থামাও।

করুণার ডাকে ড্রাইভার গাড়িখানা থামিয়েছে, অসহ্য রাগে করুণা দরজা খুলে নেমে পড়ে। ওর দেওয়া টাকাগুলো চঞ্চলের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে রাস্তা পার হয়ে বিপরীত দিকের ফুটপাথে গিয়ে উঠল ওই বৃষ্টির মধ্যেই।

রাগে অপমানে তার চোখ দিয়ে জল নেমেছে। এতবড় অপমানের মুখোমুখি হয় নি সে। আবিষ্কার করে করুণা আজ সে কাঁদছে।...আর বাসার দিকে যাবে না। কোন দিনই যাবে না।

তারও বাঁচার অধিকার আছে সব পেয়ে তারই জন্য চেষ্টা করবে সে সবকিছু ত্যাগ করে। তাই বোধহয় কাঁদছে একটি অসহায় নারী। ওরা তাকে চেনে না। বাসায় যাবে না আর করুণা—শেষ ট্রেনে বাড়িই ফিরে যাবে। সমীরের কথা মনে পড়ে। ভালোলাগে ভাবতে। মাথার যন্ত্রণাটা তার কমে আসছে।

চঞ্চল চমকে উঠেছে। নেশাটা মাথায় উঠেছে। গাড়ির ভিতরেই বোতলটা বের করে আরও খানিকটা গলায় ঢালে সেই মদ। প্রকম্প শিরাতন্ত্রীগুলো আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে। গরজাচ্ছে চঞ্চল।

—সতীপনা !…ধ্যাৎ !

বাড়ির দিকেই ফিরছে চঞ্চল।

ওরা সবাই তাকে আজ ফিরিয়ে দিয়েছে। সুষমা—করুণা—ওই চ্যাড্রিও ঘরে নেই।··সে কোথায় স্ফূর্তি করতে বের হয়েছে।

মনে হয় চঞ্চলের এতবড় দুনিয়ায় সে একা।…মনের সেই জ্বালাটা তাকে অস্থির করে তুলেছে।

প্রতিমার কথা মনে পড়ে। তার যৌবনবতী দেহটা তার স্পর্শে কেঁপে ওঠে।… মনের রোগ না থাক—তার তাতে কিছু আসে যায় না। অন্ধকারে ছায়ামূর্তিগুলো তার সামনে ঠেলে উঠেছে।…তার কণ্ঠনালী রোধ করে দেবে!

—এ্যাঁও।…

ড্রাইভার ওর দিকে চেয়ে থাকে। গাড়ির মধ্যেই বাবু মাতাল হয়ে উঠেছে।

—সাব।

এ্যাঁ! ওর ডাকে চঞ্চল চোখ মেলে চাইবার চেষ্টা করা। তার ফ্ল্যাটের কাছে এসে গেছে সে। ওই মেহগিনি গাছের নীচে নামবো!

চঞ্চলের দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। কোন রকমে টলতে টলতে বাড়িতে উঠছে রেলিংটা ধরে। মনে হয় ছিটকে পড়বে। একেবারে নীচে। প্রচণ্ড আঘাতে মাথাটা চেপ্টে যাবে। রক্তে ভিজে যাবে জায়গাটা। রক্ত!…লাল জমাট রক্ত।… হাসছে সে। বিড় বিড় করে—

চঞ্চলের খুব লাগবে। মরেই যাবে ব্যাটা·· ···

—হাসছে দৃশ্যটা কল্পনা করে। পা দুটো টেনে ওপরের সিঁড়িতে তুলছে চঞ্চল।···উঠতে খুব কষ্ট হয়! উপরে ওঠা বোধহয় খুব কঠিন।

প্রতিমা অনেকদিন থেকেই দেখেছে ব্যাপারটা। তার সামনে জীবনের হতাশা আর দুঃখটা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, মনে হয় অতীতের সব ঘটনাগুলোকে আজ বিশ্লেষণ করতে পারে কি স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ থেকে।

অনেক আশাই করেছিল সে। কি দুর্বার মোহে ওই মানুষটাকে ভালোবেসেছিল। এটা তার একটা চ্যালেঞ্জই।

দিদি ওকে অবহেলা করেছে। মা বাবা কেউ চায় নি প্রতিমা চঞ্চলকে নিয়ে ঘর বাঁধুক। দাদার চোখের সেই নীরব ঘৃণাটাও ভোলে নি প্রতিমা। সারা মন দিয়ে সে ভালোবেসেছিল। চেয়েছিল প্রতিমা চঞ্চলকে সে সুখী করবে। তাকে আরও বড় করে তুলবে। সেই খ্যাতির শরিকান হবে সেও। দুজনের নিঃশেষ ভালোবাসার একটি স্বপ্নজগৎ গড়ে তুলবে তারা।

সেই মোহের বশেই সব বাধা সব নিষেধ অগ্রাহ্য করে সে বের হয়ে এসেছিল। প্রতিমার নিজের সম্বন্ধে একটা মোহ ছিল। সব কিছুতেই সে তার প্রাধান্য

প্রতিষ্ঠা করতে পারে। রূপ আর মাধুর্য দিয়ে সে তার চাওয়া সবটুকুই পেয়েছে এতদিন। তার তেজদৃপ্ত ভঙ্গীর সামনে পুরুষ মাথা নোয়াবেই। এই ছিল তার বিশ্বাস, মন ছিল ওইটুকু পাবার জন্য উদগ্র।

কিন্তু এখানে এসে তিলে তিলে সে অনুভব করেছে হেরে যাবার বেদনা কত তীব্র; কত গভীর ভাবে তা অভিমানী মনকে কুরে কুরে খায়। তাকে শতছিদ্র করে তোলে রোগধরা হৃৎপিণ্ডের মতো!

চঞ্চল তাকে ক্রমশঃ অগ্রাহ্য করতে সুরু করেছে। সারাদিন প্রতিমা নিঃসঙ্গ। তার কাজের সময় ঘরে যাবারও উপায় নেই, অনেক বেদনায় আবিষ্কার করেছে প্রতিমা সেখানে সে অবাঞ্ছিত। কর্মসঙ্গীও নয়—নর্মসঙ্গী হবার যোগ্যতাও তার নেই।

চঞ্চলের আশপাশে ওই চ্যাটার্জি—মিস দে আরও অনেক মেয়েকে দেখেছে। ওরা তার থেকে বিচিত্র ধরণের। প্রজাপতির মতো রঙ্গীন পাখা মেলে উড়েতে পারে। মদের গন্ধ মুখে। মুখে হাসির ধারালো অস্ত্র; দেহের উদ্দাম যৌবনের নির্লজ্জ প্রকাশ পুরুষকে ব্যাকুল করে তোলে। জানোয়ারে পরিণত করে তুলেছে তারা ওই চঞ্চলকে।

চঞ্চলও ওদের নেশায় হারিয়ে গেছে।

প্রতিমা তাদের জগতের কেউ নয়।

চঞ্চল অবহেলা আর অপমানে তার মন বিষিয়ে দিয়েছে। এখানে দম বন্ধ হয়ে আসে প্রতিমার। তবু বাঁচতে চেয়েছে প্রতিমা। অনেক সয়েছে।

কিন্তু চঞ্চল বের হয়ে যায় যখন তখন। বৈকাল নামে, প্রতিমা তার পথ চেয়ে থাকে, কিন্তু চঞ্চল তখন কোথায় ওই সমাজে আড্ডায় ব্যস্ত।

রাত্রি নামে। তারা জ্বলে ওঠে আকাশকোলে ওরা যেন ব্যঙ্গের চাহনি মেলে চেয়ে থাকে প্রতিমার দিক। ও অনেক আশা করেছিল। সবাইকে বঞ্চিত করেছে, আঘাত দিয়েছে, এখন! ওরা হাসছে মিটিমিটি!

কোথায় শব্দ ওঠে। কে যেন অন্ধকারে গা মিশিয়ে এগিয়ে আসছে। ভয় লাগে প্রতিমার। এ যেন তার নিজেরই লোভী সেই মন কি আঘাতের বেদনায় শিউরে উঠেছে। কেউ নেই। একা অন্ধকারের অতলে নিষ্ঠুর আতঙ্কের সমেনে অসহায় একটি নারী দাঁড়িয়ে আছে।

বাড়ির কথা মনে পড়ে! বাবা—মায়ের কথা। কৈশোরের দিনগুলোর কথা। কত স্বপ্নরঙ্গীন উজ্জল সেই দিন; সব হারিয়ে গেছে তার। সেখানে ফেরারও পথ নেই।···ওদের সামনে সব হারিয়ে কালোমুখ নিয়ে হেরে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না সে!

···কার উন্মাদ স্পর্শ তাকে ব্যস্ত করে তোলে। জড়িয়ে ধরেছে তাকে অন্ধকারের অতল থেকে সেই দানবটা। সারা দেহে ওর মদের তীব্র গন্ধ। ওকে নিঃশেষ করে

দেবে। সব লুট করে নিয়েছে তার ওই দৈত্যটা। রাতদুপুরে মত্ত অবস্থায় ফিরে আসে চঞ্চল, এ যেন অন্য মানুষ। আলোটা জ্বালতে যাবে প্রতিমা।

জড়িত কণ্ঠে গর্জন করে ওঠে চঞ্চল বদ্ধ জানোয়ারের মতো!

আলো জেবলো না। অন্ধকারই থাকুক!

হাঁপাচ্ছে প্রতিমা। একটা দৈত্য তার দেহ মনকে যেন ছিঁড়ে খুবলে খাচ্ছে। তিলে তিলে সে এই অপমান আর অপমৃত্যুকে সয়েছে এতদিন।

…শুধুমাত্র ওই জৈবিক প্রয়োজনই তার কাছে! ওটা ফুরোলে তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় লোকটা মৃৎপাত্রের মতো।…অন্ধকারের পড়ে পড়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে। আলোটাকেও ভয় করে সে।

প্রতিমার কাছে ওর অস্তিত্ব ওই অন্ধকারের প্রাণীর ভোগ্য হিসাবে, দিনের আলোয় তাকে চেনে না চঞ্চল।

প্রতিমার কাছে এটা যেন দুঃসহ ঘৃণারই। আবিষ্কার করে প্রতিমা তার মনের অতলে এতদিনকার সেই পুঞ্জীভূত বিক্ষোভটা দুঃসহ ঘৃণায় ফেটে পড়ে।

অন্ধকারের ওই পথটাকে সেদিন প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে ফেলে দেয়। চঞ্চল চমকে উঠেছে। নেশার ঘোরে কাঁপছে। প্রতিমা আলোটা জেবলেছে, ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

চোখ দুটো চঞ্চলের চকচক করছে, সোজা হয়ে দাঁড়াবার সামর্থ নেই। ওর মনের অতলের সেই ক্ষুধাটা তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। সামনে তেজদৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিমা।

—আলো নেভাও! গর্জন করছে চঞ্চল।

—ওই আলোতে তার নিজের পাশব মূর্তিটার ছায়া পড়েছে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়। তার লেখা সেই চরিত্রগুলোই ভিড় করে, মনে সব অবদমিত বিকৃত কামনার উম্মাদনা নিয়ে। প্রতিমাকে দেখে ভয় পেয়েছে সে। যে নারীকে সে চায় সে ওমনি অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হবে না।

তাই অন্ধকারে তার জগতের সব সৌন্দর্য আর সত্যকে ডুবিয়ে দিতে চায়, আত্মগোপন করতে চায় দানবটা তার নিজের পাপের অতলে।

—আলো নেভাও!

প্রতিমা স্পষ্ট স্বরে প্রতিবাদ করে—না। ওই আলো জ্বলুক। নিজের মূর্তি-দেখাতেও ভয় পাও তুমি?

—সাট্ আপ্!·· দুনিয়ার সবাই সৎ আর যত পাপী আমিই!

—তাই! দুনিয়ার সব পাপের মাঝে তুমি নরকের কীটের মতো বেঁচে আছে? যা সত্য তাকে অস্বীকার কর, যা সুন্দর তাকে অপমান করো। আজ দেখছি দিদি তোমাকে চিনেছিল দাদাও তাই তোমাকে ঘৃণা করে। ছোঁবে না তুমি আমায়। আমিও তোমায় ঘৃণা করি। তুমি ঠগ্ জোচ্চোর! লম্পট!

চঞ্চলের সারা দেহের রক্ত মাথায় উঠে যায়। ওর মুখে যেন একটার পর একটা চাবুক মারছে ওই মেয়েটা। দুঃসহ বেদনায় আর্তনাদ করে দুর্বার হয়ে উঠছে চঞ্চল। আলোটা তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। সারা দেহের কোষে কোষে তীব্র উম্মাদনা আনে।

তার সৃষ্টির পথে আনন্দের পথে—প্রতিষ্ঠার পথে বারবার ওই মেয়েরাই বাধা হয়ে উঠেছে। চঞ্চল রেগে ওঠে। কেন ওরা আসে তবু বারবার তার জীবনে।

জন্মের প্রথম লগ্ন থেকেই ওই মেয়েরাই তার ভাগ্যকে কেবল ঠোক্কর দিয়ে যন্ত্রণার পথে ঠেলে দিয়েছে। ওকে তারাই শাসন করেছে উন্মাদ করে তুলেছে। ওদের তবু জীবন থেকে সরিয়ে দিতে পারে নি।

আজ সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিমাই তাকে এমনি করে জর্জরিত করে তুলেছে। চীৎকার করে ওঠে চঞ্চল। হাতের কাছে ফুলদানি নিয়েই সজোরে ওর দিকে ছুঁড়ে দেয়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেটা গিয়ে লাগলো ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নটায়—কাঁচটা সশব্দে অর্ধেকটা ভেঙ্গে পড়ে।

নিশ্চিন্ত হয় চঞ্চল, উপরের দিকেই ভেঙ্গে গেছে আয়নাটা, আর মুখখানাকে দেখতে পায় না।...ভয় নেই আর! সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ওই প্রতিমার গালে মুখে সজোরে আঘাত করতে থাকে!

মেতে উঠেছে মত্ত দানবটা।

প্রতিমা চমকে উঠেছিল ওই আঘাতে—তার সব আশা স্বপ্ন কামনাকে ও ব্যর্থ করে দিয়েছে, মনের সব সুন্দরের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে অনেক আগেই। বেঁচে ছিল শুধু দেহটাই। প্রতিমা সরে না—ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। নিদারুণ পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করছে সে। বলে চলেছে। —মনটাকে অনেকদিন আগেই মেরেছো, দেহটাকেও এইবার শেষ করে দাও! আমি বেঁচে যাই!...দোহাই তোমার—আমাকে শেষ করে দাও...মুক্তি দাও।

প্রতিমা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জানোয়ারটা নেশার ঘোরে দাপা-দাপি করে ব্যর্থ আক্রোশে ওপাশের সোফায় পড়ে গেছে দু একবার অস্ফুট আর্তনাদ করে ওর অর্ধ অচেতন দেহটা।

প্রতিমা মুক্তি চেয়েছিল, এই জীবনের উপর এসেছে তার দুঃসহ গ্লানি আর বেদনা। কোথায় কোন আশ্রয় তার নেই। সব পরিচয় পিছনে ফেলে একটি মানুষকে নিঃশেষে ভালোবেসে সে তার ঘর বেঁধেছিল; কিন্তু আজ সব হারিয়ে গেছে তার।

মুক্তিই চায় সে। সারা মুখে নাকে রক্তের রেখা, মাথার চুলগুলো আলুথালু। তার সাজানো ঘরে আজ কাঁচের টুকরো আর রক্তের দাগ, ফুলগুলোকে পায়ে মাড়িয়ে দিয়েছে ওই উন্মাদ দানবটা। স্রষ্টা! যুগ যন্ত্রণার পথিকৃৎ!

নিজের জীবনটাকে আজ তুচ্ছ বলেই বোধ হয়। বাঁচতে চেয়ে ছিল সে!

হাসি আসে প্রতিমার। তার জন্য কাঙ্গালের মতো সে দিদিকে আঘাত দিয়েছে, আঘাত দিয়েছে বাবা মা—দাদাকে। এরই জন্য! ভালোবাসা—ঘর বাঁধা এত বন্ধ পরিহাস সয়ে বাঁচা যায় না।

টেবিলের উপরই ঘুমের ওষুধের শিশিটা রয়েছে। মাঝে মাঝে চঞ্চল দু একটা ট্যাবলেট ব্যবহার করে। রাতের অন্ধকারে দেখেছে ওকে পায়চারী করতে।···ঘুম থাকে না ওই মানুষটার চোখে।

ঘুম!·· প্রতিমা জানলার বাইরে চেয়ে থাকে। স্তব্ধ পৃথিবী। তারাগুলো হাসছে পরিহাসের হাসি।·· এই তার সারা জীবনের স্বপ্ন! তছনছ করা জীবন; অর্থহীন অপমান—দ্বিধাহীন অত্যাচার সত্যহীন সব স্বীকৃতি আজ তীব্র গরল জ্বালায় সব চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে। তার অপমৃত্যু ঘটেছে অনেকদিন আগে।

মা-বাবা-দাদা-দিদি সদানন্দবাবুর কথা মনে পড়ে।

ওরা তাকে বাঁচাতে চেয়েছিল। ওই আলোভরা পাখী ডাকা জগৎ দিনান্তের শেষ রোদে বিবর্ণ উলসে ওঠা সবুজ সেই মাঠ গ্রামসীমা আজ হারানো প্রতিমাকে ডাক দেয়।

সব আশা হতাশার উর্ধ্বে আলোভরা মুক্ত আকাশ সীমায় সাদা মেঘের ভেলায় পাল তুলে চলেছে কোন অচেনা জগতের সন্ধানে—দিনান্তের আঁধার আলোয় তারা উদ্ভাসিত—সুন্দর। প্রতিমার চোখে ঘুম নামে। শান্ত হয়ে আসে সব জ্বালা।

হাল্কা হয়ে গেছে তার সারা মন, আর কিছুই সে চায় না। সে শুধু ফুরিয়ে যেতে চায়, হারিয়ে যেতে চায় মুক্তির আনন্দঘন সেই দূর আকাশ পারে—এই বদ্ধ জটিল পৃথিবীর থেকে অনেক দূরে।

রাতের অন্ধকারে তারাগুলোও হারিয়ে গেছে।

প্রতিমার দেহটা ওপাশে সেই ধ্বংসস্তূপের উপরই পড়ে আছে, আজ সে শান্ত স্তব্ধ তৃপ্ত!

কল্যাণী সকালেই খবরটা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। হরিপদবাবু চুপ করে বসে আছেন—নির্বাক শূন্য বেদনাহত চাহনি মেলে। তার সামনে সব আলো যে মুছে গেছে।

সমীর কলকাতায় চলে গেছে।

সুষমাও ছুটে এসেছে এ বাড়িতে।···কয়েকজন কৌতূহলী মানুষও ভিড় করেছে সকালের কাগজেই বের হয় সংবাদটা।

প্রতিমার সেই ঘুম আর ভাঙ্গে নি। সে অনেক বেদনা আর হতাশায় এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে। এ যুগের সব যন্ত্রণার মাঝে সে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গেছে। সুষমা চুপ করে চঞ্চলের দেওয়া সহ্যের শক্তি—তার সন্তানকে ভালোবেসে সে ওই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে। বাঁচার জন্য সংগ্রাম করেছে। সে হার মানে নি, হার মেনেছে প্রতিমা।

করুণাও এসেছে সংবাদ শুনে। সেই ঝড়ের রাতে সেও দেখেছিল চঞ্চলকে। াপমানই করেছিল।···প্রতিমার এই মৃত্যুতে সেও শিউরে উঠেছে। বাঁচতে চায় ানুষ—এই তার ধর্ম।

কিন্তু সে সবকিছু ছেড়ে এজগত থেকে চলে যেতে চায় অনেক বেদনায় বহু াপমান আর হতাশার গ্লানিতে। করুণার জীবনে তেমনি বহু বেদনা রয়ে গেছে। াজ সেও বাঁচতে চায় একজনকে কেন্দ্র করে। সমীর তাকে যদি ভুল বোঝে?

···তার সামনে তাই আজ নীরব প্রশ্ন! সেও তাই প্রতিমার এই পরাজয়ে ভীত য়ে উঠেছে।···আজ ওর মৃত্যুতে মনে হয় করুণার এ যেন তাদের সকলেরই াংশিক মৃত্যু!

মাসীমা!

··কল্যাণী জলভরা দু চোখে করুণার দিকে চাইল। আর্তকণ্ঠে বলে কল্যাণী।

—এ কালের সবই বিচিত্র মা। মেয়েটাও তাই হারিয়ে গেল বাছা! আমরা বাই কেবল হেরেই চলেছি! সব হারিয়ে যাবে—

·· ওরা নিদারুণ একটা দিকজোড়া বিভীষিকার সামনে এসে যেন অসহায় াতঙ্কভরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। সদানন্দবাবুও এসেছেন।

—সমীর আছে?

সুষমাই জবাব দেয়—না, সে কলকাতায় গেছে।

সদানন্দবাবু ওদের শোকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পান না। বৃদ্ধ রিপদবাবুও কোটরাগত দু চোখ বয়ে জল নামে বৃদ্ধ বলেন।

—আর কতদিন এসব দেখবো সদানন্দবাবু? কত সইবো?

সদানন্দবাবু জানতেন এমনি একটা কিছু সর্বনাশই ঘটবে চঞ্চলের জীবনে। ৃতির এই নিয়ম। তার রীতি নীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করা যায় না। াান স্রোতে বয়ে যেতে পারে মানুষ যতক্ষণ তার শক্তি-সামর্থ থাকে, একদিন ৃতির সামনে সে হার মানে। সমাজের মধ্যে—সাধারণ মানুষের মনে মনে যে ্যাণ চেতনা—সত্যবোধ—সুন্দরের সম্বন্ধে ধারণা রয়ে গেছে, তাকে আঘাত দিয়ে ণক আনন্দ চকিত চমকের চোখ ধাঁধানো হাততালি কিছু মেলে, কিন্তু একদিন : অন্তর্নিহিত কল্যাণবোধ তার সেই হাততালিকে সমবেত ধিক্কারে আর গ্লানিতে ‍র্ করে তোলে। তুচ্ছ হয়ে যায় তার এতদিনের কুড়ানো সব ভুয়ো দর্শন আর ‍িতির মালা। সেদিন যে পাঁকের মধ্যে সে আনন্দ খুঁজেছে সেই পাঁকের অতল ধকার আর পুতিগন্ধ তার সমগ্র আকাশ বাতাস বিষিয়ে তোলে। দম বন্ধ হয়ে সে তার। নিভে আসে চোখের সামনের সব আলো।

···সব সুন্দরকে হত্যা করার দুর্বার আনন্দ—অসহায় অর্তনাদে পরিণত হয়। থেকে নিষ্কৃতির পথ আবার তাকে নোতুন করে খুঁজতে হয়! আবার সে বাঁচতে ার সেই সত্য সন্ধান করে।

বি.—১৭

…এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চঞ্চলের জীবনে।

সদানন্দবাবুও তাই এত বেদনার মাঝেও আজ মনে মনে খুশী হয়েছেন। চঞ্চ হয়তো এইবার থামবে। প্রতিমা জীবন দিয়ে তার সব বিকৃতিকে প্রকট ক দিয়েছে। হয়তো বাঁচিয়ে গেছে চঞ্চলকে।

সদানন্দবাবু হরিপদবাবুর কথায় বলেন।

—সব সইতে হবে হরিবাবু, মানুষ অনেক ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখের মধ্য দি জীবনকে নিয়ে যায়, সুন্দরতর করে তোলে। সেইখানেই তার মনুষ্যত্ব! ঈশ্বরে এই নির্দেশ। তাই এত দুঃখ বেদনা। একে এড়াবার পথ জানা নেই—তা সইতেই হবে।

—শুনেছি চঞ্চলও হাসপাতালে!

সদানন্দবাবু বলেন—সমীর আসুক। তখন যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

সুষমাও নীরবে চেয়ে থাকে ওদের দিকে। তার মনের কোণে আজ এক মানুষের জন্য ব্যথা জমে উঠেছে। প্রতিমা গেছে সত্যি—কিন্তু সে ওই চঞ্চলকে চে নি, ভালোবাসতে পারে নি। শুধু মোহের বশেই সে এগিয়েছিল। ভালোবাস গভীরে যে বেদনা নিহিত আছে সেটাকে সে সইতে পারে নি, তাই ঠুনে ভালোবাসার মোহ ফুরিয়ে যেতেই অসহ্য যন্ত্রণায় সে নিজেকে হত্যা করেছে।

…চঞ্চলকে ফেরাতে পারে নি। সুষমা সেদিন মানুষটাকে দেখেছিল, ওর চো দেখেছিল নীরব অসহায় আর্ত দুঃসহ যন্ত্রণার বোঝা। যার জবালায় সে নি ভিতরে ভিতরে পুড়েছে আর নিজেকে ক্ষয় করে চলেছে কোন পথ না পেয়ে।

সুষমা বলে।

—ওবেলায় দাদা না ফিরলে আমিই যাবো বাবা!

হরিপদবাবুর সব চিন্তা যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তবু সায় দেন তিনি।

—তাই যাবি মা। যা ভালো বুঝিস কর।

…চঞ্চল স্বপ্ন দেখছিল। কোন অদেখা রাজ্যে হারিয়ে গেছে সে। সেখা শুধু কালো ছায়ামূর্তিগুলো মাথা তুলেছে তার চেতনার রাজ্যে। মানুষ নে সবাই সেখানে ছায়া; স্বচ্ছ ছায়া। তাদের দেহের হৃৎপিণ্ডের রক্তধারাও শুকি গেছে।…শূন্য কায়ার দল শুধু চোখের কোলে হিংসা আর পাশবিকতার জবা নিয়ে ওরা ভিড় করেছে। আলোটুকুকে তাদের ভয়—চীৎকার করে তারা।

সব পাপের গ্লানি জমে জমে অন্ধকার নেমেছে ওদের রাজ্যে। হাসির শব্দ ওঠে চঞ্চলের মনে হয় ওই কায়াহীনের দলে সামিল হয়ে গেছে সেও। সব পথ ওে হারিয়ে গেছে।

…সকালের আলো চোখে পড়েছে। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা—উঠতে গিয়ে পারে না, টলে পড়ছে।' ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরছে।…কাল রাত্রে সে আঘাত করেছি প্রতিমাকে; চুরমার করে দিয়েছিল আয়নায় দেখা সেই দানবটাকে! মনে প

জের সেই ছায়ামূর্তিটা হাসছে! পায়ে যন্ত্রণা বোধ করে—ঘরময় ছিটিয়ে পড়ে
াছে কাঁচের টুকরো। ওপাশে পড়ে আছে প্রতিমার দেহটা।…

চঞ্চল তাকে মেরেছিল,…কাঁদে নি প্রতিমা। আর্তকণ্ঠে সে চীৎকার করেছিল।

—মেরে ফেলো আমাকে! মুক্তি দাও।

চমকে উঠেছিল চঞ্চল!—কোন মেয়েই এমনি করে তাকে সোচ্চার ঘৃণায় বিষিয়ে
ন নি। করুণা তাকে অপমান করেছে—প্রত্যাখ্যান করেছে তার অতীতের স্ত্রী
ুষমা। বন্ধুরা তাকে নিয়ে আড়ালে ব্যঙ্গ করেছে, তার কুৎসায় তারা আনন্দ
পয়েছে।

সব মিথ্যা! মিথ্যার জগতে বাস করে চঞ্চলের কাছে সব মিথ্যা হয়ে উঠেছিল।
ারই মাঝে প্রতিমা জানিয়েছিল সোচ্চার প্রতিবাদ।

ভালো লাগে চঞ্চলের।

সকালের মিষ্টি আলোয় তার গ্লানি ভরা মন ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে গ্লানিমুক্ত হতে
য়!…এ সবকিছুই অশোভন অশালীন, ভাঙ্গা আয়নায় নিজের হেঁট হয়ে থাকা
ূর্তিটাকে দেখে দুটো চড় কসতে ইচ্ছে করে।…ব্যাটা জানোয়ার—বর্বর—
তর।

এই অন্ধকার অতল থেকে সে মুক্তি পেতে চায়, লাথি মেরে ফেলে দেবে ওই
াতলগুলোকে।

—প্রতিমা! প্রতিমা—

ওকে ডাকছে সঙ্গোপানে—প্রকম্প গাঢ় আন্তরিকতার সুরে।

কোন সাড়া নেই।…ওর ঘুমন্ত মুখে রক্তের জমাট দাগ—ঠোঁটে নাকে রক্তের
ুক্নো ধারা!…তারই অপকীর্তি!……

—প্রতিমা!

ওর হাতখাণা তুলে ধরে। স্পন্দনহীন ভারি হিমশীতল একটা হাত। কোন
াণের সাড়া নেই, পাশেই পড়ে আছে ঘুমের পিলের শূন্য সেই শিশিটা!

চমকে ওঠে চঞ্চল—বিকৃত ভীত চকিতকণ্ঠে সে ডাকছে।

ভারি হাতখানা ছিটকে পড়ে! প্রতিমা!…প্রতিমা!…চঞ্চল উঠে দাঁড়াবার
চষ্টা করে। পারে না—সারা দেহটা ভারশূন্য হয়ে গেছে। চোখের সামনে
ামে জমাট অন্ধকার!…চঞ্চলের জ্ঞানহীন দেহটা ছিটকে পড়ে ওই ধ্বংসস্তূপের
পরই।

সিঁড়িতে কাদের হাসির শব্দ ওঠে—সেই বিশ্রী মেয়েটা হাসছে। চ্যাম্প্রি—!
াকে ডাকছে। চঞ্চল চীৎকার করে ওকে গালাগাল দেওয়ার চেষ্টা করে, পারে না।
ার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেছে। চোখ দুটোর সামনে অন্ধকার নামছে!…আর কিছু
নে নেই।

জ্ঞান ফেরে, বাতাস তীব্র একটা গন্ধ।

নাকের সামনে কাঁচের একটা ফানেল মতো, নিঃশ্বাস নিতে কস্ট হয়। চোখের সামনে অন্ধকার—ফিকে ফিকে অন্ধকার। অস্ফুটকণ্ঠে ডাকছে চঞ্চল, কোথায় যেন হারিয়ে গেছে তার সবকিছু।···সুন্দর দীর্ঘায়ত, আয়ত দুটো চোখ, হাসির মিষ্টি সুর মনে পড়ে!

—প্রতিমা!

···দুটো চোখ তার দিকে চেয়ে থাকে ব্যাকুল চাহনি মেলে। তার নিঃশ্বাসের উষ্ণতা স্পর্শ করে চঞ্চলকে। দেখতে পায় সে দুটো ডাগর অশ্রুভরা চোখ? আবছা—সেই দৃষ্টি!

—হাত দুটো তুলে স্পর্শ করে তাকে চঞ্চল। প্রতিমা নয়! অন্য কোন জন! মনে পড়ে প্রতিমা হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে এই পৃথিবী থেকে।

সে নিজেই তার মনের সব সুন্দরকে হত্যা করেছে।···

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে চঞ্চল!···ওর হাতে যেন রক্তের দাগ!

—কে!···আমি দেখতে পাচ্ছি না, শুধু অন্ধকার—

কাদের ব্যস্ত ত্রস্ত পায়ের শব্দ শোনা যায়। ডাক্তাররা ছুটে আসেন। কি দেখছেন তারা! চঞ্চল ব্যাকুল কণ্ঠে কি বলছে। যে আলোকে সে সরিয়ে দিয়ে অন্ধকারের অতলে ডুবতে চেয়েছিল, আজ সেই আলোটুকুর জন্য ব্যাকুল আর্তনাদ করে, মুক্ত বাতাসটুকুর জন্য তার অদম্য ব্যাকুলতা।

সুষমার দু চোখে জল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সমীর!

ডাক্তার বলেন।

—ওটা এক্সেসিভ্ নার্ভাস্ স্ট্রেনের জন্যও হয়ে থ্যাকে। মনে হয় ভয়ের কারণ নেই। তবে সারতে সময় নেবে। এখন কোন রকম উত্তেজনা যেন না আসে!—আপনাকেও রেডি থাকতে হবে এখন।

সুষমা চুপ করে ওদের কথাগুলো শুনছে।

·· সেই চেষ্টাই করে চলেছে সুষমা।···

চঞ্চল ফিরে এসেছে আবার সেই ছোট্ট শহরের শান্ত জীবনে। তার উপর দিয়ে কটা মাস যেন ঝড় বয়ে গেছে! আজ শীর্ণ ক্লান্ত—পরাজিত একটি মানুষ ধীরে ধীরে নোতুন করে নিজেকে চিনছে।

মনে হয় এই চেনার দরকার ছিল।

কদিন এসেছে হাসপাতাল থেকে।···আজ সে অন্যমানুষ। বাইরের সেই জীবনের প্রবল স্রোতটা স্তব্ধ হয়ে গেছে। দু একদিন বন্ধুরা সংবাদ নিয়েছে মাত্র, চ্যাড্রি ফোন করেছিল। সুষমা দু একটা কথা বলেই সাঙ্গ করেছে সেই পালা। আজ বাইরের সেই উন্মাদনাময় জীবনটাকে আতঙ্কের বলেই মনে করে চঞ্চল। যে একাগ্রতা—নির্জনতা আর গভীর চিন্তার প্রয়োজন সৃষ্টির জন্য—সেটা তার ছিল

া। শুধু ধারাল কলম দিয়ে সে কদর্যতাকেই প্রকট করে তুলেছে নরকের নিজস্ব ংবাদদাতার মতো।

…সকালের আলোয় পূর্বদিক ভরে ওঠে। পাখীগুলো কলরব করছে। মিষ্টি াতাসটুকু গুলমোহর ফুলের সুবাসে আমন্থর।

—বাপি! চা—

বেবীর ছোট হাত দুটো ওর কাছে টেনে নেয় চঞ্চল। ওকে দেখতে ঠিক পাচ্ছে া। তবুও ওর স্পর্শটুকু তার মনের অতলের সেই জ্বালাকে প্রশমিত করে লেছে। ওর কণ্ঠে পাখীর কাকলীর সুর। সকালের প্রফুল্লতা। মনের অতলে াথায় সুর ওঠে।

চঞ্চল দু চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা করছে ওই নোতুন দিনকে।

…কদমের কাছে আজ মুক্তির আশ্বাস। ঘাটের ধারের সেই ঝুপড়িটা ভেঙ্গে ছে, খসে গেছে তার বাঁধন। তিনকড়ির শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ করে দিয়েছে সে। াজ আবার সে ফিরে চলেছে অজয়ের ধারেব সেই ছোট সবুজ লাল ধুলোমাটির দশে, মুক্ত অবাধ আলোর রাজ্যে।

কোন ক্ষোভ নেই। তিনকড়ি বলে।

—চলেই যাবি শেষতক কদম।

কদম হাসে—কেন? দুঃখ হচ্ছে নাকি? তিনুবাবু তোমার অনেক টাকা— বু বলবো ওর দাম কানাকড়িও নয়, নাহলে একটা তুচ্ছ মেয়েকেও কিনতে পারলে া তা দিয়ে? এ্যা! লয়?

তিনকড়ি চুপ করে ওই হাসিটা হজম করলো। অবাক হয়েছে সে—সত্যিই ন হয় কিছু আছে মানুষের মনে, যাকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না। চঞ্চলের খবরও নেছে কদম!

খুশীই হয়েছে।…এমনিই বোধহয় দুনিয়ার নিয়ম। একদিক ভাঙ্গে অন্যদিকে াতুন করে গড়বার উদ্দেশ্যেই। কোন মৃত্যু কোন ত্যাগই অনর্থক নয়। সেও ার সর্বস্ব ত্যাগ করেছে কিন্তু বদলে পেয়েছে আরও অনেক তৃপ্তি—অনেক বড় ানন্দ আর মুক্তি!

যাবার আগে দেখা করে যাবে সে সকলের সঙ্গে। ওরা সুখী হোক। চঞ্চল ার পথ খুঁজে পাক। প্রণাম করে যাবে বৃদ্ধ সদানন্দবাবুকেও। মানুষের াঁদাকে ওরা তবু স্বীকৃতি দিয়ে চলেছে এই সর্বনাশা রাজ্যের এত হারানোর ঝেও।

তাই বোধহয় করুণাও আজ সব হারিয়ে বাঁচতে চায় নোতুন করে। দেখেছে ীবনের সেই উন্মাদনার অতলে মানুষের চিরকাঙ্গাল মন বেশী নয়—সামান্য তটুকু শান্তি—আর নির্ভর খোঁজে। সেইটুকুতেই তার সবচেয়ে বড় তৃপ্তি—সেই

পাওয়াই তার সবচেয়ে বড় পাওয়া। সেটুকু না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে প্রতিমা, ব্যর্থ বেদনায় জ্বলে মরেছে চঞ্চল।

আজ সমীর করুণার চোখেও দেখেছে সেই নীরব কান্না—যে কান্না কেঁদেছিল প্রতিমা। সকালের আলোটুকু হলুদ হয়ে উঠেছে। আজ ছুটির দিন। সমীর বের হয় নি। শান্ত অলস সকালটুকু তার মনে উদাস একটা শূন্যতা এনেছে। নিজের জীবনে আজ কোথায় সব ঝড় আর শূন্যতা এসে জমেছে।

প্রতিমা নেই। তাকেও স্বীকার করে নি সমীর।

বুকভরা বেদনা আর জ্বালা নিয়ে সে ফিরে গেছে। করুণার পায়ের শব্দে ওর দিকে চাইল সমীর। সারা বাড়িটা স্তব্ধ নির্জনতার মাঝে প্রাণের সাড়া এনেছে করুণা।

—কি ভাবছো ?

দুজনেই জানে ভাবনার সীমা তাদের নেই। করুণা বলে ওঠে।

—পথ আমাদের হারিয়ে গেছে। আগেকার সেই দিনগুলোই ছিল ভালো'; সমীরেরও মন টানে সেই দিনগুলোর দিকে। আজ মনে হয় রৌদ্রদগ্ধ কোন পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ওরা শ্যামসবুজ নীচেকার উপত্যকার দিকে চেয়ে থাকে। তার বনভূমি—রুপালী নদীর রেখা পার হয়ে, পিছনে ফেলে এসেছে তারা শূন্যতার দেশে, যার সামনে বিরাট একটা ধ্বস।

—করুণা! কোন পথই আজ নেই।

—তবু পথ চলতে হবে। বাঁচতে হবে! আমরা চাই।

সমীরের হাতখানা ওর হাতে। ওরা যেন প্রতিমার সেই ব্যর্থতার বেদনাকে প্রত্যয় করেছে। সেই নিঃশেষ অপমৃত্যুকে বাধা দিতে চায় আজকের নোতুন মানুষ। করুণা আর্তকণ্ঠে বলে।

অনেক কাদা আমার গায়ে তবু বিশ্বাস করো তাকে মন থেকে কোনদিনই চায় নি। আমি চেয়েছিলাম—এতটুকু পেয়ে সার্থক হয়ে বাঁচতে! কিন্তু সমীর জানে আজ বিশ্বাস করে এ তারই অক্ষমতা। চঞ্চল প্রতিমাকে বাঁচাতে পারে নি, তার জন্য আজও সে তার প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে।

সমীর, আজ বাঁচতে চায়, সব অন্যায়কে ঘৃণা করে নয়—তাকে অন্তরের প্রীতি দিয়ে স্বীকার করে নেবে এ যুগের মানুষের সব পরাজয়কে। তারই মাঝে তারা ভালোবাসার আগুনে মনকে পাপমুক্ত করে বঁচবে—ঘর বাঁধবে।

আজ করুণাকে ফেরাতে সে পারে না।

করুণা! সব জেনেই আমরা এগোবো আজ। তুমি—আমি—সবাই। করুণার দু চোখে আজ জল।

সকালের মিষ্টি আলোয় আজকের মানুষ সব বেদনাকে অন্তরের নিঃশেষ সহনীয়তা আর প্রীতি দিয়ে আরক্তিম করে তুলেছে। বর্ণময় করে তুলেছে—বরণীয় করেছে।

চঞ্চলের সব মতবাদই মিথ্যা হয়ে গেছে। আজ তাই থমকে দাঁড়িয়েছে সে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এতদিন জেহাদ ঘোষণা করেছিল, প্রতিবাদ তুলেছিল মানুষের সব নীতি বিশ্বাস আর নির্ভরের বিরুদ্ধে।

কিন্তু চমকে উঠেছে আজ।

চোখ দুটোর সামনে নীলাভ অন্ধকার। আলো নয় অন্ধকারময় জগতের অতল থেকে আজ হাতড়ে হাতড়ে সে পুরানো স্মৃতির সম্পদ সঞ্চয় করে।

কোন জ্বালা নেই। সে খুঁজেছিল আনন্দ—তৃপ্তি—শান্তি। লোভীমন তার পাবার নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছিল। আজ সমীরকে বিশ্লেষণ করতে পারে, নিবিড় ভালোবাসার ভরা একটি মন, সুষমা চেয়েছিল তাকে সুখী করতে, তার সর্বস্ব ত্যাগ করে সে এসেছিল তারই কাছে, কদমকে মনে পড়ে। একটি রহস্যময়ী নারী যে তাকে এই ভিড় কোলাহলের বাইরে অসীম মুক্তির আনন্দময় পাখীডাকা জগতের ডাক শুনিয়েছিল। আলোভরা সেই উদার পৃথিবীর রক্তিম ধূলিকণায় রয়েছে ত্যাগ আর সহিষ্ণুতার পরিচয়। সে কিছুই ত্যাগ করতে চায় নি, কাউকে সহ্য করতে পারে নি, কারোও কথা ভাবে নি। তাই ভালোবাসতে গেলে কিছু পেতে গেলে তারও প্রস্তুতির প্রয়োজন। তা ছিল না চঞ্চলের। তাই একে একে বহুজনই এসেছে, করুণাকে সে ইচ্ছা করে অপমান করেছে, তার মোহের সুযোগ নিয়ে তাকে অন্ধকার জগতের একপাল বুভুক্ষু জানোয়ারের সামনে ফেলে দিয়েছে রোম্যান এরিনার সিংহের সামনে বন্দী ক্রীতদাসীর মতো।

অপমান করেছে অগ্রাহ্য করেছে সদানন্দবাবুর মতো মানুষকে। তাকেও চেনে নি। মনে হয় ভণ্ড রক্ষণশীল নীতিসর্বস্ব একটি মানুষ। তার অন্তরের সেই অফুরাণ ভালবাসাটাকে সে বিশ্বাস করে নি সেদিন, যেখানে এতটুকু আলো দেখেছে, কল্যাণ চেতনা দেখেছে তাকেই নির্মম ভাবে ব্যঙ্গ করে এ যুগের গ্লানিকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে সত্যের আসনে।

তাই নিজে সেদিন বঞ্চিতই হয়েছে, আশপাশের সেই ভালোটুকুকে আজ অন্ধকারের অতলে সন্ধান করছে, কোন অবলম্বন নেই তবে কি নিয়ে বাঁচে মানুস? সেও এতদিন কি এক শূন্যতার রাজ্যে প্রেতের মতো বাস করেছে!

--কি এত ভাবছো?

সুষমা এগিয়ে আসে। আজ তার নিঃশেষ সেবায় চমকে উঠেছে চঞ্চল। কোনদিনই ও তো তার কাছে কিছু চায় নি। তবু তাকে আঘাতের পর আঘাতই দিয়েছে চঞ্চল, ব্যাকুল হয়ে ওঠে সে। তারও এই সবের প্রতিদান দেবার আছে, নোতুন করে সে আবার বাঁচতে চায়, মানুষকে চিনতে চায়।

—সুষমা!

ওর হাতগুলো আজ সুষমাকে সন্ধান করে।··

—এইতো কাছেই রয়েছি!···

চঞ্চল ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ?

—আজ আবার সব ফিরে পেতে চাই সুষমা, নোতুন করে বাঁচতে চাই ! আলো নয় অন্ধকারকেই দেখেছিলাম সত্য বলে—শুধু ভুলই সুষমা। মানুষকে তার সব সংস্কারকে আঘাত করেছি, তার শুভবুদ্ধিকে ব্যঙ্গ করেছি ; এ তারই প্রতিফল !

—নোতুন গোঁসাই !

আর্তনাদ করে ওঠে কদম। সামনে চঞ্চলের একটা ধ্বংসস্তূপ !

দুচোখের সামনে তার জমাট অন্ধকার। ওর ডাক শুনেছে চঞ্চল।

হাত দুটো তুলে শূন্যে কি যেন হাতড়াচ্ছে।

চঞ্চলের মনে পড়ে কদমের কথা।

তার সেই মুক্ত বাউল মনের অফুরাণ ভালোবাসাকে সে চেনে নি। তার মনের সব নীচতা দিয়ে তাকে দুঃসহ আপমানই করেছিল। কদম আজ এসেছে তাকে দেখতে।

ওর হাত দুটো কদমের মুখটাকে ছুঁয়েছে। কাঁদছে কদম। চঞ্চলের এমনি সর্বনাশের কথা সে কোনদিনই ভাবে নি, অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে কদম।

—একি হ'ল নোতুন গোঁসাই !

এত দুঃখেও আজ অবাক হয় চঞ্চল।

—তুমি কাঁদছো কদম ! আমার দুর্ভাগ্যে তুমি কাঁদছো ?

মানুষের জন্য মানুষ কাঁদে। শত আঘাতে আর অপমানেও মানুষ তবু শত্রুকেও ক্ষমা করে—ভালোবাসে, তার জন্য বেদনা বোধ করে।

...এই ভালোবাসার চিহ্নটুকুকেও সে স্বীকৃতি দেয় নি। আজ কদমের চোখের জলে নিজের দুঃখ আর পরাজয়টা বড় বেশী করে অনুভব করে চঞ্চল।

কদম বলে।

—এ হতে পারে না গোঁসাই। তুমি আবার ভালো হয়ে হয়ে উঠবে। আমি বলছি তুমি ভালো হবে।

চঞ্চলের মনের অতল অন্ধকারে যেন আশার সুর জাগে। ওদের মনের এই ব্যাকুলতাটুকুই আজ তার কাছে সান্ত্বনা আনে।

—ভালো হয়ে উঠবো।

কদমের সামনে আজ অন্য জগতের ডাক।

এখান থেকে চলে যাচ্ছে সে। তবু দেখে গেল একটি জীবনসত্যের পুনরাবৃত্তি।

চঞ্চল ফিরেছে। মনে হয় সবকিছুরই সোম আছে, সব গানের আছে লয় এবং তাল। সোমে তাকে ফিরতেই হবে, তাই বোধ হয় কদম ফিরে চলেছে সেই পল্লীর সবুজ মুক্তির আশ্রয়ে, তার মন টানে সেইখানেই।

চঞ্চল আর্তকণ্ঠে বলে।

—শুনলাম চলে যাচ্ছো এখান থেকে ?

—হ্যাঁ! তবু দেখে গেলাম তুমি ফিরেছো নোতুন গোঁসাই!

আর্তনাদ করে ওঠে চঞ্চল।

·—আজ যে আমার সব হারিয়ে গেল কদম। অন্ধকারেই ডুবে গেলাম। হাসে কদম।

—সব ফিরে পেয়েছো বলো। এতদিন তো অন্ধকারেই ছিলে গো। তুমি আমি সবাই। আলোকে চিনেছে অনেক দুখে, অনেক কিছু ত্যাগের পর। তাই ফিরে চলেছি নোতুন গোঁসাই সেই অজয়ের ধারে শালবন সীমার পারে গেরুয়া মাটির তীর্থে, যেখানে মানুষ একদিন সহজ হবার সাধনা করেছে জীবন নদীর উজানে। চঞ্চলের চোখের সামনে সেই ছবিটা ফুটে ওঠে : সেই শান্ত সুন্দর পাখীডাকা সবুজ একতারার সুরে সুরে কোন পরম আনন্দ লোকের স্মরণি!···চঞ্চল সেদিন সেই সুন্দর পরিবেশকেও বিষিয়ে তুলেছিল ইার জঘন্য কামনার জ্বালায়, অপমান করতে চেয়েছিল ওই কদমকেও যে ·অন্তরের তৃপ্তি আর শান্তির জন্যই সবকিছু ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেল।

চঞ্চল মানুষের অন্তরের এই দিকটাকেও দেখে নি, আজ তার চোখে এই সহজ সুন্দর রূপটি উজ্বল রূপে ফুটে উঠেছে পরম আনন্দে। এই জীবনসত্যের অপরূপ প্রকাশকে সোচ্চার ঘোষণা করাই সাহিত্যের ধর্ম শিল্পীর কর্তব্য ; সে ক্ষমতা তার আজ যেন হারিয়ে গেছে। যেদিন এই আনন্দময় মহৎ রূপকে সে অনুভব করেছে সেদিন সে স্তব্ধ।

আর্তকণ্ঠে বলে চঞ্চল।

—বুঝলে কদম আমার অবস্থা সেই রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপার মতো। বগলে লোহার শিকল নিয়ে পথে পথে সে পরশ পাথরের সন্ধান করেছে, মুখে দাঁড়ি জটাপাকানো চুল ধুলো ময়লায় বিকৃত চেহারা, পাথর যা পায় তুলে ঠেকায় অরে ছুড়ে ফেলে দেয়, এমনি করেই দিন মাস বছরের পর বছর সে পথে পথে পাথর তোলে।

শিকলে ঠেকায় আর ফেলে দেয়। হঠাৎ একদিন কে বলে ওঠে পাগল তোর লোহার শিকল যে সোনা হয়ে গেছে। হাহাকার করে ওঠে পাগল। কোনদিন হঠাৎ সে পরশপাথরই পেয়েছিল কিন্তু আনমনে তাকে আবার পথের ধুলোতেই ফেলে দিয়েছে। ধরে রাখতে পারে নি।

আধখানা জীবন খুঁজে পরশপাথর পেয়েছিল সে, বাকী আধখানা জীবন সেই হারানো পাথরের সন্ধান করতে বৃথাই চলে গেল। সে শূন্যই রইল।

আমর দশাও তাই কদম। ভেবেছিলাম শান্তি তৃপ্তি সুখ বোধ হয় ওই ভোগের মধ্যে ; অন্ধকারেই মানুষ সত্য ; যেদিন দেখলাম আলোর ইশারা—সেদিন আমি ফুরিয়ে গেছি। সব আমার স্তব্ধ হয়ে গেল ও সব হারিয়ে গেল ; সব সুন্দরকে আমি হত্যা করেছি:

আজ কান্নায় ভরে ওঠে অসহায় চঞ্চলের সারা মন।······

অনেক পায়ের শব্দ ওঠে, চঞ্চলের সেই একক সেচ্ছা নির্বাসনের জগৎ আজ মানুষের ভিড়ে ভরে গেছে। সমীর আর করুণা এসেছে।

কদম বলে ওঠে।

—যাক, যাবার আগে কিন্তু ভালো লাগলো নোতুন গোঁসাই! কি গো দিদিমনি

চমকে ওঠে কদম! খুশীভরা কণ্ঠে বলে চলেছে সে।

—বাঃ! এ যে নোতুন সাজ গো করুণাদি!···এই তো ভালো, তবু বাঁচতে গেলে মানুষ অনেক ভুলের পর পথ পায়।

সমীর আজ করুণাকে ফেরাতে পারে নি। ওরা ঘর পাতালে সুষমা বলে ওঠে —করুণা তোমায় প্রণাম করেছে।

চঞ্চল যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে।

—আমাকে প্রণাম! ···না-না—আমি কারোও প্রণামের যোগ্য নই করুণা। আমি নিজেকে মানুষ বলেও পরিচয় দিতে ভুলেছিলাম! ঘৃণাই করেছি সকলের। সমীর···তবু তোমরা এত মহৎ। ভেবেছিলাম আর কিছু অবশেষ নেই। এ যুগের আঘাত যন্ত্রনা হতাশার মাঝেও মানুষ বেঁচে আছে তার গৌরবের আসনে, তার ভালোবাসা দয়া বিবেক নীতি আজও তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কোন মতবাদই তাকে হত্যা করতে পারবে না। এই কথাটাই মনে মনে বিশ্বাস করি।

সমীর ওকে দেখছে আজ ওর কণ্ঠে অনুশোচনার জ্বালা। সমীর ওকে আজ নোতুন করে দেখছে, ও যেন সেই অতীতে গঙ্গার বুক থেকে মৃত্যুর মুখ থেকে তুলে এনেছে তাকে আবার।

চঞ্চল!···এখন উত্তেজিত হয়োনা তুমি! ডাক্তার বলেছেন ওসব ঠিক হয়ে যাবে।

—মানুষ মরে নি—তাই আমার মতো পাষণ্ড নির্মম একটা জীবকে তোমার ভালোবাসা—তার জন্য ব্যাকুল হও।

—তুমি আবার সুস্থ হয়ে উঠবে চঞ্চল!

ওরা সদানন্দবাবুকে ঢুকতে দেখে খুশী। ক'দিন ধরে তিনিও সমানে ছুটোছুটি করছেন। বৃদ্ধের সারামনে সেই কামনা—চঞ্চল সুস্থ হয়ে উঠুক।

কলকাতায় কয়েকজন স্পেশ্যালিষ্টকেও এনেছিলেন তিনিই।

আজও ফিরছেন।

সেখান থেকেই কি সব ওষুধপত্র নিয়ে।

—মাষ্টার মশাই!

হাসছেন সদানন্দবাবু—জীবনে এমনি করেই মানুষের সব ভুল ভাঙ্গে চঞ্চল এমনি আঘাতেরও দরকার। ঈশ্বর মঙ্গলময়। ডাঃ সেন বললেন—ওসব ঠিক হয়ে যাবে।

সমীর করুণা তাঁকে প্রণাম করছে। অবাক হন তিনি।

এ যেন ওদের অন্য রূপ। দুজনকে আজ সুখী হতে দেখে বৃদ্ধ সদানন্দবাবুও খুশী হন।

—বেশ করেছো সমীর। তোমাকে ভাবতাম ভীরু—কিন্তু দেখলাম অন্তরের জোর তোমার আছে। মনে হয় কি জানো—আজকের চারদিকে আমাদের যন্ত্রনা বেড়েছে, মাথা তুলেছে পশুশক্তি। আশপাশে—চারিদিকে তারই প্রবল প্রতিষ্ঠায় সব লুটে নিয়েছে, আমরা যেন হেরে গেছি। সে ভুল আমার ভেঙ্গেছে। ইতিহাসে কি বলে জানো? রোমক সাম্রাজ্যের সব পরাক্রমের পরাজয় ঘটেছিল যীশুখ্রীষ্টের আত্মিক জয়ের মধ্যেই। ওই অন্যায়কে হার মানতেই হবে যদি মানুষ নিজের অন্তরের সেই কল্যাণ চেতনাকে জাগিয়ে তোলে তখুনিই।

…মনুষ্যত্বে জয়ই—অন্যায়ের পরাজয়।

এযুগের যন্ত্রণার মাঝেও—অন্ধকারেও তাই আশা হারাই নি সমীর। চঞ্চল আজ সারা মন দিয়ে ওই কথাটা বিশ্বাস করে। মনুষ্যত্বের মর্যাদা—তার প্রতিষ্ঠাই সব অন্যায়ের কণ্ঠরোধ করতে পারে। এতদিন সে এটা মানে নি—ঈশ্বরকে মঙ্গলময়কেও বিশ্বাস করে নি। তাকে তার সাহিত্যে সৃষ্টিতে এক কুৎসিত মনুষ্যেতর জীবের বংশধর বলে অভিহিত করে সেদিন নিজের অন্তরের শয়তানকে আত্মগৌরবে বিভূষিত করেছে।

আজ!…তার সামনে দেখেছে এদের অন্তরের প্রীতি-বিশ্বাস আর ভালোবাসার গভীরতা।…এর তুলনায় মনে হয় আগেকার দেখা মানুষগুলো—সেই মত্ত বিলাসের জগৎ যেন কাঁচে গড়া কোন জগৎ, মাটির মানুষের 'অন্তরের স্পর্শ' তাতে নেই, আজ সেইটুকুর স্পর্শে সে ধন্য হয়েছে।

নোতুন করে সেই কথাই জানাতে চায়!…

সদানন্দবাবু বলেন।

—তোমাকে আবার লিখতে হবে চঞ্চল।

চঞ্চল যেন স্বপ্ন দেখছে। অন্ধকারের কালোয় নয় আলোর স্পর্শে তার মন ভরে উঠেছে, সারা দেহে কি রোমাঞ্চ জাগে। ওই শ্যামসবুজ দিগন্তরেখা গৈরিক ধূলি ঢাকা পৃথিবীর বুকে—তার মানুষের মনের সেই ভালোবাসায় তার লেখা প্রাণময় হয়ে উঠবে। সদানন্দবাবুর দর্শন মিথ্যা নয়; সমীর করুণার জীবনের সহিষ্ণুতা—ভালোবাসা, সুষমার প্রেম—তার মেয়ে বেবীর চোখে জীবনের স্পন্দনে ফুটে উঠেছে প্রকৃতির সেই অফুরাণ ধারা; আজ জগৎকে মনে করে হতাশার নয়—প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আনন্দময়, সব প্যাঙ্কিল ক্লেদের উর্ধ্বে তার জগৎ—সব হতাশার অন্ধকারে নক্ষত্রের মতো প্রোজ্জল।

রাত হয়ে গেছে।

কদম চলে গেছে তার সেই গেরুয়া মাটির কোন গ্রামে, এখানের জীবন থেকে সরে গেল, ওর যাওয়াটা চঞ্চলের মনে হারানো সুরের মতো বিষাদ

করুণ পরিবেশ রচনা করেছে। সমীর—করুণা সুখী হয়েছে। ওরা হার মানে নি।

সব পেয়েছে সুষমা ; আজ সেও ভালোবাসায় ওকে অভিষিক্ত করেছে। জীবনের সব অন্ধকারের অতলে আলোর সন্ধান করে চলছে চঞ্চল। প্রতিমার কথা মনে পড়ে।

তার সব আলো নিভিয়ে দিয়েছে চঞ্চল!...কারো কাছে তার পাবার কি কোন দাবী নেই। তবু এরা আজ তাকে আপন করে নিয়েছে।

—সুষমা !

ওর স্পর্শে সারা দেহে মনে আজ সুরু ওঠে।

—এত অন্ধকার কেন চারিদিকে ?

সুষমা ওর দিকে চাইল। চঞ্চলের মনে সেই চিরন্তন তৃষ্ণার নীরব হাহাকার। সদানন্দবাবুর কথা মনে পড়ে। উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন।

—পুনশ্চাষু চক্ষুঃ।

হে প্রাণের দেবতা আমাকে আবার চক্ষু দিও, যাতে আমি উচ্চরন্ত সূর্যের চিরন্তন আলোকে প্রত্যয় করতে পারি। যে আলো মানুষের জীবনের মনের অন্ধকার দূর করে—তমসার থেকে আলোক তীর্থের দিকে নি যায়।

...সুষমা আমার সব হারিয়ে যাবে ? এ ভাবে বাঁচতে আমি চাই নি, এমনি অন্ধকারের জীব হয়ে ? আমি নোতুন করে তোমাকে—আমাদের চারিদিকের মানুষকে দেখতে চাই—ভালোবাসতে চাই সুষমা।

ওই আর্তকণ্ঠস্বর আজ বেদনায় ব্যাকুল, সুষমারও ওকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই।

অন্ধকার আকাশে তবু প্রাণের দীপ্তি নিয়ে নক্ষত্রগুলো জ্বলছে—কোথায় পাখী ডাকে—বাতাসে ওঠে বাতাবি ফুলের মদির সুবাস। অন্ধকারে প্রাণের স্পন্দন নিয়ে রূপবতী ধরিত্রী আজও রহস্যময়ী। তারই মাঝে অস্ফুট কণ্ঠে একটি অসহায় মানুষের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়। —সব নিয়ে আমি নোতুন করে আবার বাঁচতে চাই সুষম। জীবনকে তার পূর্ণতায় মাঝে দেখতে চাই। অন্ধকার আজ অসহ্য হয়ে উঠেছে। সুষমা ওকে কাছে টেনে নিয়েছে, নিজের দেহ মনের নিবিড় উষ্ণতা দিয়ে ওর শূন্য অন্তরকে আজ ভরে দিতে চায়।

কি আবেশে দু চোখ বুজে আসে চঞ্চলের, এমনি নিদারুণ বেদনায় নিঃশেষ ভালবাসায় নিজেকে ফিরে পায় সে। রাত্রির অতল অন্ধকারে দুচোখ মেলে কি সন্ধান করছে ওই দূর আকাশ কোলে, সব কালো। হঠাৎ চমকে ওঠে চঞ্চল!

—সুষমা!

কাঁপছে চঞ্চলের সারা দেহ কি নিবিড় উত্তেজনায়। সুষমা বিস্মিত হয়। চঞ্চল যেন ছিটকে পড়ে যাবে। ওকে কাছে টেনে নেয় সুষমা। চঞ্চলের দুচোখের সামনে

কালো আকাশ কোলে উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো—ওগুলো ঝকমকে আলোয় ভরে দিয়েছে তার দৃষ্টিপথ।

সুষমা।

আনন্দঘন কণ্ঠে চীৎকার করছে একটি নোতুন মানুষ। জীবনের সব বেদনার মাঝে তার আনন্দময় চীৎকার ওঠে!

—আমি দেখতে পেয়েছি সুষমা। ওই অন্ধকার আকাশে এত আলো···তোমার দু চোখের তারায় সেই আলো—হ্যাঁ।

আমি বাঁচবো; আবার সেই আলোর মাঝে—তোমাকে আমাকে সবাইকে নোতুন করে চিনব, সেই আনন্দের পরম সত্যকে আবার সোচ্চারে ঘোষণা করবো।

—সত্যি! দেখতে পেয়েছো তুমি?···

—হ্যাঁ! ওই যে কালপুরুষ—পুষ্যা—স্বাতী—ধ্রুবতারা—ওদের সবাইকে আমি চিনি।

আজ চণ্ডলের কণ্ঠে অব্যক্ত আনন্দের সুর। অন্ধকারের অতলে সে পেয়েছে আলোর সন্ধান—জীবনের ধ্রুবতারা নীল আলোর হারানো স্পর্শ আবার ফিরে পেয়েছে।

—: সমাপ্ত :—